দ্রোহী বর্ণমালা

জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ১ম বার্ষিকী
সাহিত্য সংকলন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

দ্রোহী বর্ণমালা

জুলাই-আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ১ম বার্ষিকী
সাহিত্য সংকলন

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
প্রফেসর সালেহ্ হাসান নকীব
মাননীয় উপাচার্য

পৃষ্ঠপোষক
প্রফেসর মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন
মাননীয় উপ-উপাচার্য (প্রশাসন)

প্রফেসর মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান
মাননীয় উপ-উপাচার্য (শিক্ষা)

সম্পাদক
প্রফেসর মো. আখতার হোসেন মজুমদার
প্রশাসক, জনসংযোগ দপ্তর

বিশেষ সহযোগিতা
ড. নাজিব ওয়াদুদ
ড. ফজলুল হক তুহিন

প্রকাশক
প্রফেসর ইফতিখারুল আলম মাসউদ
রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)

প্রকাশকাল
৫ আগস্ট ২০২৫

শুভেচ্ছা মূল্য: ১০০ টাকা

মুদ্রক
দি সিটি অফসেট প্রিন্টার্স
তালাইমারি, রাজশাহী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান বার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি*

১. প্রফেসর সালেহ্ হাসান নকীব, উপাচার্য	সভাপতি
২. প্রফেসর মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন)	সদস্য
৩. প্রফেসর মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা)	সদস্য
৪. প্রফেসর ইফতিখারুল আলম মাসউদ, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)	সদস্য
৫. প্রফেসর মো. মাহবুবর রহমান, প্রক্টর	সদস্য
৬. ড. মো. আমিরুল ইসলাম, ছাত্র-উপদেষ্টা	সদস্য
৭. প্রফেসর মো. ছাইফুল ইসলাম, পরিচালক, আইসিটি সেন্টার	সদস্য
৮. প্রফেসর মোহাম্মদ জামিরুল ইসলাম, প্রাধ্যক্ষ, বিজয়-২৪ হল	সদস্য
৯. প্রফেসর মোহাম্মদ হারুনর রশিদ, প্রাধ্যক্ষ, সৈয়দ আমীর আলী হল	সদস্য
১০. প্রফেসর মো. আখতার হোসেন মজুমদার, প্রশাসক, জনসংযোগ দপ্তর	সদস্য-সচিব

* জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা	৬
জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান: পূর্বাপর ভাবনা	৭
জুলাই বিপ্লব: শিক্ষার্থীদের লড়াই, শিক্ষকদের ভূমিকা	১০
আত্মকথন : জুলাই বিপ্লবে সাহিত্যিক প্রেরণা	১৪
জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের প্রেরণাদায়ক সংগীত	২৩
জুলাই গণপরিসর ও সাম্প্রতিক শিল্পভাষ্য	২৬
জুলাই বিপ্লবে গ্রাফিতি: প্রতিবাদ দেশপ্রেম সম্প্রীতি সাম্যের বার্তা	৩১
জুলাই বিপ্লব	৩৪
উত্তাল ২৯ জুলাই	৩৯
জুলাই-২৪ বিপ্লব: ফ্যাসিবাদের মুখোমুখি এক অভ্যুত্থানের দিনলিপি	৪৩
জুলাই বিপ্লবের স্মৃতি	৫৪
তিন শহিদের কথা	৬০
রুদ্ধ শহরের মুক্তির লড়াই	৬৫
জুলাই বিপ্লবের স্মৃতিময় দিনগুলো	৬৯
১৬ জুলাই ও সরকার পতনের আন্দোলন	৭৩
জুলাইয়ে বিকল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদের ভূমিকা	৭৯
অন্যরকম জুলাই	৮১
শহিদ	৮৪
গণভবনে আমাদের স্বাধীনতা	৯২
বিপ্লবের বিলাপ	৯৫
রক্তের তেজ	৯৯
জুলাইয়ের প্রতিধ্বনি	১০৪
ফিরলাম একাত্তরে	১০৫
আবু সাঈদের বুক	১০৬
এই পথ	১০৭
জুলাই	১০৮
ইনকিলাব জিন্দাবাদ	১০৯
জুলাইয়ের সূর্য	১১১
কালো মেঘে ঢাকা বাংলাদেশের আকাশ	১১২
জুলাইয়ের অঙ্গীকার	১১৩

জেগে ওঠো বাংলা	১১৪
অবিস্মৃত আখ্যান	১১৫
জুলাই নয় চেতনা	১১৭
তিপ্পান্ন বছর পেরিয়ে	১১৮
ইনকিলাব	১১৯
ইতি জুলাই আখ্যান	১২১
স্ফুলিঙ্গ	১২৩
দিনলিপি: জুলাই '২৪	১৪০
Red Shadows of July	১৪৫
প্রতিবিম্ব-ই-অধিকার	১৫৩

সম্পাদকের কথা

৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখে জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রবন্ধ, গল্প, ছড়া, কবিতা ও উন্মুক্ত নাট্যরচনা আহ্বান করে। প্রাপ্ত রচনাসমূহসহ আরো কয়েকটি রচনা নিয়ে এই সংকলনটি প্রকাশিত হলো।

সংকলনে প্রকাশিত রচনায় ব্যক্ত মতামত বা ভাষা একান্তভাবে লেখকের নিজস্ব। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সম্পাদকের কোনো দায় নেই। সংকলনে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তা অনিচ্ছাকৃত, সেজন্য আমরা দুঃখিত। এই সংকলনের জন্য যাঁরা লেখা দিয়েছেন ও এটি প্রণয়নে কাজ করেছেন তাঁদের সবাইকে জানাই ধন্যবাদ।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকীতে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

প্রফেসর মো. আখতার হোসেন মজুমদার
প্রশাসক, জনসংযোগ দপ্তর

জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান: পূর্বাপর ভাবনা

প্রফেসর সালেহ্ হাসান নকীব

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে ঘটে যাওয়া গণঅভ্যুত্থান, আমাদের ইতিহাসের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ ঘটনা। প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনার পেছনে দীর্ঘ ইতিহাস থাকে। জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের ক্ষেত্রেও তাই। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আওয়ামী সরকারের অপশাসন এই গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি তৈরি করেছে। ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় একটি নিয়ন্ত্রণকামী এবং ভয়ঙ্কর নির্যাতক সরকারের বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে দেশের মানুষ জেগে উঠেছে। সরকারবিরোধী রাজনৈতিক শক্তিগুলো তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছে। চূড়ান্ত সাফল্য আসেনি। এই সাফল্যের জন্য দীর্ঘ দেড় যুগ অপেক্ষা করতে হয়েছে।

স্বৈরশাসন দীর্ঘায়িত হয় অনেকগুলো কারণে। এর ভেতর আছে বিরোধী দলগুলোর রাজনৈতিক ব্যর্থতা, দমন-নিপীড়নে স্বৈরশাসকের রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রত্যেকটি অঙ্গের নিষ্ঠুর ব্যবহার, সাধারণ মানুষের ভয় ও নিষ্ক্রিয়তা এবং নাগরিক অধিকার সম্পর্কে অসচেতনতা। এই কারণগুলোর সবকটিই আমাদের দেশে বিদ্যমান ছিল। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি মানুষের এক ধরনের আস্থাহীনতার কারণে সরকারবিরোধী আন্দোলন খুব বেশি দূর এগোতে পারেনি। দলগুলোর নেতা-কর্মীদের সাথে সাধারণ মানুষ সম্পৃক্ত হয়নি। বরং আমরা দেখেছি, বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে রেখে দানা বেঁধে ওঠা নাগরিক আন্দোলন অধিক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। উদাহরণ হিসাবে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের কথা বলা যায়। চূড়ান্ত সাফল্য ধরা না দিলেও আন্দোলন সংগ্রাম কখনো বৃথা যায় না। বড় কিছুর জন্য প্রেক্ষাপট তৈরি হয়।

বিগত প্রায় ষোলো বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে নাগরিক আন্দোলনগুলোর একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই। এর একটিও শুরুতে, অন্তত বাহ্যত, সরকারবিরোধী মুভমেন্ট ছিল না। এর গতি প্রকৃতি ছিল কৌশলগত। এর পেছনে কারণ আছে। অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং বিবেকহীন একটি সরকারের সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ খুব কঠিন। ভয় নিয়ে আসল কথাটা বলা কঠিন। প্রত্যেকটি আন্দোলন মানুষের মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এবং বেদনা তীব্র থেকে তীব্রতর করেছে। এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষার একটা চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখেছি ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার অথবা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন হিসাবে জুলাই-আগস্টের ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করতে চাইলে অনেক বড় ভুল হবে। লড়াইটা ছিল অনেক বড় পরিসরে। এই লড়াই ছিল অপশাসনের বিরুদ্ধে, অধিকারের পক্ষে, ইনসাফের

পক্ষে। প্রশ্ন জাগে, অনেকবার, অনেক বছর, হোঁচট খাওয়ার পর, জুলাই-আগস্টে অপশাসনের অবসান কী করে সম্ভব হলো? এর উত্তর দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যর উপর নির্ভর করছে। প্রথমটি হচ্ছে এদেশের ছাত্র সমাজের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভয় সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠে সর্বস্তরের মানুষের একদফাকে সামনে রেখে রাজপথে নেমে আসা। এই একতাবদ্ধ তীব্র জনজোয়ারের সামনে স্বৈরাচার তার সকল শক্তির অমানবিক প্রয়োগের পরও পেরে ওঠেনি। মানুষ যখন আস্থা রাখে, যখন ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলে রুখে দাঁড়ায়, তখন অপশক্তি আর টিকে থাকতে পারে না। এটাই ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টের সবচেয়ে বড় শিক্ষা। ভবিষ্যতে যারাই দেশ পরিচালনা করুক না কেন, এই শিক্ষাটি তাদের মাথায় থাকলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। দমন নির্যাতন করে আর কেউ বেশিদিন এই দেশ চালাতে পারবে না।

জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থান এখন ইতিহাসের অংশ। এটা একাধারে গণঅভ্যুত্থান, অন্যদিকে এক অসমাপ্ত বিপ্লব। সবকিছু ইতিবাচক ধারায় পালটে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এই আন্দোলন ধারণ করেছে। প্রায় এক বছর অতিক্রান্তকালে প্রশ্ন জাগে- কতটুকু পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি? সামনে কী আছে? প্রথম বর্ষপূর্তি একটা হিসাব-নিকাশের সময়ও বটে। সব থেকে বড় যে অর্জন তা হচ্ছে স্বৈরশাসনের অবসান। হাজার মানুষের প্রাণের বিনিময়ে জাতির উপর চেপে বসা, পরাক্রমশালী, বিনা ভোটের অপশাসকের বিদায়। আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে মানুষের মনোজগতে- মানুষ, বিশেষ করে তরুণ সমাজ, এখন সাহসী। তারা তাদের মনের কথাটা প্রকাশ করতে এখন আর দ্বিধা করে না। অন্যদিকে ২৪-এর জুলাই-আগস্ট যে ইতিবাচক প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছিল, তা অনেকটাই পূর্ণ হয়নি। যে অভূতপূর্ব ঐক্য আমারা ২৪-এর উত্তাল দিনগুলোতে দেখেছি তার রেশ আজ ম্রিয়মাণ। নতুন সময়, নতুন প্রেক্ষাপটকে ধারণ করতে প্রয়োজন ছিল নতুন চিন্তা, সেই চিন্তার বিকাশ আমরা সেভাবে দেখতে পাচ্ছি না। অথচ এটাই ছিল সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। আসলে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় নতুন সময় ও নতুন প্রেক্ষাপটকে কাজে লাগাতে প্রয়োজন উন্নত শিক্ষা, দৃঢ় সঙ্কল্প ও প্রজ্ঞা। এই জায়গাগুলোতে আমরা অনেক পিছিয়ে, এই দৈন্য আমাদের সামনে চলার পথে দারুণ বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে অবস্থান। সেই উত্তাল দিনগুলোতে আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের প্রকাশ্য বড় ভূমিকা দেখিনি। বরং দেখেছি ডান-বাম-মধ্যপন্থি দলগুলোর এক অভূতপূর্ব সম্মিলন। অথচ হাজারো শহিদের রক্তের দাগ না শুকাতেই পুরাতন নিয়মে প্রতিদিন আমরা অনৈক্যের ধারা শক্তিশালী হতে দেখছি। এটা এক ট্র্যাজেডি। স্বৈরাচারবিরোধী কোনো আন্দোলন অরাজনৈতিক হতে পারে না। ২০২৪-এর আন্দোলন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলন,

তবে তা দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণতা অতিক্রম করতে পেরেছিল। আর পেরেছিল বলেই মানুষ মুক্তি পেয়েছে, এটা যেন আমরা ভুলে না যাই।

দেশটাকে একটা গণতান্ত্রিক এবং ইনসাফপূর্ণ ধারায় পরিচালনার এক সুবর্ণ সুযোগ হাজারো শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি। এই রক্তের ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে। আজ জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তির প্রাক্কালে আমি শুধু একটি অনুরোধই করতে চাই। স্মরণ করুন সেই উত্তাল দিনগুলো, আমাদের চারিপাশে সহযোদ্ধা কারা ছিলেন? সেই দিনগুলোতে কোন চেতনায় আমরা একত্রিত হয়েছিলাম? কোনো রাজনৈতিক দল যা পারেনি, শুধু ছাত্র সমাজ একা যা কখনো পারত না, তা সম্ভব হয়েছিল ছাত্র-জনতার এক অপূর্ব ঐক্যের ভেতর দিয়ে। দেশ গড়ার যে অসাধারণ এক সুযোগ আমরা পেয়েছি, তা যেন ক্ষুদ্র ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থে আমরা নষ্ট না করি। বৃহত্তর ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। নতুন সময়কে নতুন চিন্তা দিয়ে সাজাতে হবে। এটা সত্যিই রিসেট বাটনে চাপ দেওয়ার একটা সময়। পুরাতন রীতি, পুরাতন ধারা, জনতার অবদান ও ঐক্যকে অস্বীকার করে ক্রেডিট নেওয়ার নির্লজ্জ প্রবণতা ছাড়তে হবে। পুরাতন চর্চা, পুরাতনকেই ফিরিয়ে আনতে পারে। আমরা আর সেটা হতে দিতে চাই না।

২০২৪-এর জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের স্পিরিট চিরজীবী হোক– বর্ষপূর্তিকে সামনে রেখে এই হোক আমাদের প্রত্যাশা।

প্রফেসর সালেহ্ হাসান নকীব, উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই বিপ্লবঃ শিক্ষার্থীদের লড়াই, শিক্ষকদের ভূমিকা

প্রফেসর মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান

শান্তিপূর্ণভাবে কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলনে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিরীহ শিক্ষার্থীরা চরম সহিংসতার শিকার হন। সরকার-সমর্থিত ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা শিক্ষার্থীদের ওপর যেভাবে আক্রমণ চালান, তা ছিল ভয়াবহ এবং অমানবিক। শত শত শিক্ষার্থী আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এই সময় আক্রান্ত ছাত্ররা তাদের অভিভাবক ও দেশের সাধারণ জনগণের প্রতি পাশে দাঁড়ানোর আকুতি জানান। কিন্তু সেই আহ্বানে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। আন্দোলনকারীদের উপর একের পর এক নির্মম হামলা চালানো হয়। তবে এ সময়ে একটি আশার আলো দেখা যায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আন্দোলনটি দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। স্কুল, কলেজ ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষার্থীর সংহতিতে এটি এক গণআন্দোলনে রূপ নেয়।

যখন আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে, তখন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি সরকারদলীয় সশস্ত্র ও হেলমেটধারী বাহিনীকেও যুক্ত হতে দেখা যায়। সহিংসতা চরমে ওঠে, প্রাণ হারান বহু শিক্ষার্থী। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিবাদরত ছাত্ররা দমন-পীড়নের শিকার হন। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গিয়ে অনেক স্থানে প্রাণহানি ঘটে, দেখা দেয় নাশকতা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার কারফিউ জারি করে এবং সেনাবাহিনী নামায়। এই সময়ে কয়েকশ মানুষ প্রাণ হারান, যাদের অধিকাংশই ছাত্র। গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত অনেকের পরিচয় অজ্ঞাতই থেকে যায়। পঁচে যাওয়া দেহ হাসপাতালের মর্গ থেকে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম দাফন করে। নিহতদের মধ্যে রিকশাচালক, পথচারী, এমনকি মায়ের কোলের শিশু পর্যন্ত ছিল। এমন বিভীষিকাময় মৃত্যু স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আর দেখা যায়নি।

বিশ্বের বিবেকবান মানুষ এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলো এই বর্বরতার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। অথচ এই ভয়াবহতায় যারা আহত হয়েছেন, সেইসব শিক্ষার্থীদের দেখতে যাননি সে সময়কার কোনো মন্ত্রী, শিক্ষা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কেউ, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কিংবা প্রক্টরিয়াল টিমও নয়। আহত পুলিশ সদস্যদের দেখতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাসপাতালে ছুটে গেছেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যস্ত হয়ে পড়েন বিদেশি কূটনীতিকদের ধ্বংসযজ্ঞ দেখাতে। পতিত প্রধানমন্ত্রী ছুটে যান মেট্রো স্টেশনে, বিটিভি ভবনের ক্ষয়ক্ষতি দেখতে। সরকার যেন মানুষের জীবন নয়, কেবল কাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি

নিয়েই উদ্‌বেগ কোথায় কয়টি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হলো, কত কোটি টাকার ক্ষতি হলো, সে হিসাবেই তাদের ব্যস্ততা। তাদের উদ্‌বিগ্ন ইট পাথর কংক্রিট আর বায়বীয় উন্নয়ন নিয়ে, ছাত্র-জনতার প্রাণহানি নিয়ে তারা মোটেও বিচলিত ছিলেন না।

বিশেষ করে যখন দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জীবনপণ আন্দোলনে নামেন, তখন তাদের পাশে থাকার কথা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষকদের। কিন্তু বাস্তবতা হলো- আহত কিংবা নিহত শিক্ষার্থীদের খোঁজখবর নিতে কেউই এগিয়ে আসেননি। যেন তারা রাষ্ট্র বা শিক্ষাঙ্গনের কেউ নন একটি অনাহুত গোষ্ঠী মাত্র। এই বিমুখতা শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে গভীর হতাশা ও ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে। রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদের ফেসবুক পোস্ট তার অন্তর্দহকে স্পষ্ট করে তোলে 'স্যার, এই মুহূর্তে আপনাকে খুব দরকার!'—আর সেই পোস্টের পরদিনই তিনি রাজপথে শহিদ হন। এমনকি আন্দোলনের শুরুতে যখন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলে তখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উপস্থিতি দেখা যায়নি। শিক্ষার্থীরা হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিলেও সেখানে শিক্ষকদের দেখা যায়নি। ফলে ঢাকা এবং রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রশাসনের দায়িত্বশীল শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে পড়েন। বিভিন্ন উপাচার্য এবং প্রক্টরের পদত্যাগের দাবি ওঠে আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে।

সরকার একদিকে শিক্ষার্থীদের সংলাপের ডাক দিলেও, অন্যদিকে রাতে তুলে নিয়ে নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিক্ষার্থীরাও হামলার শিকার হন। মেয়েদের ওপর পর্যন্ত ন্যক্কারজনক হামলা হয়। আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী শিক্ষার্থীদের নামে একের পর এক মামলা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় আইনের তোয়াক্কা না করে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে, মামলার বাদী হন ছাত্রলীগ নেতারা।

এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনের সমন্বয়কারী এবং শিক্ষার্থীরা পড়েন চরম নিরাপত্তাহীনতায়। ছাত্র সমন্বয়কারীদের ওপর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নির্যাতন, গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক তুলে নেওয়া এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাদের নামে মামলা দেওয়ায় তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে মনোবল হারাতে শুরু করেন। একদিকে গ্রেফতার আতঙ্ক, অন্যদিকে ক্যাম্পাসে ফিরে ছাত্রলীগের দ্বারা নিপীড়নের আশঙ্কা ছিল প্রবল। শিক্ষার্থীরা আশাবাদী ছিলেন, অন্তত তাদের শিক্ষকরা যাদের তারা অভিভাবক বলে জানেন এই দুঃসময়ে তাদের পাশে থাকবেন। কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সবক্ষেত্রেই তারা পেয়েছেন নিরবতা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরোধিতা। এই বাস্তবতা শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের এক গভীর দূরত্ব তৈরি করেছে– যা শিক্ষার পরিবেশ ও আদর্শকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে।

শিক্ষাঙ্গনের সহিংসতা, মামলার ভয়, প্রশাসনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ ও অভিভাবকহীনতার বেদনাবিধুর অভিজ্ঞতা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মনে প্রশ্ন তুলেছে– আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা কি তবে সত্যিই অভিভাবকহীন ছিলেন? কেননা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে শিক্ষার্থীরা কেবল পাঠদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন না। তাঁরা তাঁদের আশ্রয়, সাহস ও মূল্যবোধের উৎস হিসেবে ভাবেন। কিন্তু যখন শিক্ষার্থীরা আহত, লাঞ্ছিত কিংবা নিগৃহীত হন, তখন শিক্ষকরা নীরব থাকলে সেই অভিভাবকত্বর জায়গা একেবারে ধ্বসে পড়ে। এতে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কেবল পেশাগত নয়, নৈতিকভাবেও দুর্বল হয়ে পড়ে যেখানে মানবিকতা, সহানুভূতি কিংবা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের জায়গাগুলো শূন্য হয়ে পড়ছে।

এখন যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ– আগস্ট পরবর্তী ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কোন পথে? দেশের ইতিহাসে আগস্ট পরবর্তী সময়টি শুধু রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই নয়, শিক্ষাঙ্গনের ভেতরেও এক গভীর পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। বিশেষ করে সাম্প্রতিক ছাত্রআন্দোলন ও তার পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার আলোকে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক এক নতুন সংকটময় মোড় নিয়েছে। শিক্ষার্থীরা যেখানে অভিভাবকসুলভ সহযোগিতা আশা করেছিলেন, সেখানে তাঁরা পেয়েছেন এক নিস্পৃহ নীরবতা, কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক একসময় ছিল ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের মজবুত বন্ধন। আজ সেই সম্পর্ক কিছুটা ক্ষয়ে গেছে। এই বাস্তবতায় যে সত্যটি স্পষ্ট হয়েছে তা হলো শিক্ষাঙ্গনকে বাঁচাতে হলে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে হলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের যে ফাটল তৈরি হয়েছে তা সারাতে হবে। ক্ষয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনর্গঠন করতে হবে। অন্যথা, এই সম্পর্কের ফাটল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নৈতিক ও মানসিক ভিত্তিকে দুর্বল করে তুলবে।

এই সংকট নিরসনে উভয় পক্ষেরই দায়িত্ব রয়েছে, তবে নেতৃত্ব দিতে হবে শিক্ষকদেরই। তাঁরা যদি রাজনৈতিক দলমতের ঊর্ধ্বে থেকে এবং দলীয় প্রভাবমুক্ত থেকে নিঃস্বার্থভাবে শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ান, কণ্ঠে ন্যায়বোধের দৃঢ়তা থাকে, তবে আজ হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস পুনরুদ্ধার সম্ভব। দরকার শুধু সাহসিকতা, আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধ। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনেরও অবশ্যই রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পুলিশি হস্তক্ষেপ বা রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের প্রভাব যেন শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। আর সবচেয়ে জরুরি যেকোনো দমন-পীড়নের ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দায়িত্ব নিতে হবে এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যায় বা সহিংসতার ঘটনার পর প্রশাসনের দায় এড়িয়ে যাওয়া আস্থাহীনতার বড় কারণ। ভবিষ্যতে তা রোধ করতে জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থা জরুরি।

পরিশেষে শিক্ষকরা যদি পুনরায় 'অভিভাবক' হয়ে উঠতে পারেন, শিক্ষার্থীরাও তাদের অভিভাবকদের জ্ঞানের আলোর ছায়াতলে ফিরে আসবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়ে। এই ঘুরে দাঁড়ানোই হবে একটি সুস্থ, মানবিক এবং মুক্তচিন্তার শিক্ষাঙ্গনের শুরু। জুলাই বিপ্লব সেই সুযোগটিই আবার আমাদের সামনে নতুনভাবে উন্মোচন করেছে।

প্রফেসর মোহা. ফরিদ উদ্দীন খান, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আত্মকথন : জুলাই বিপ্লবে সাহিত্যিক প্রেরণা

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

বর্ষপূর্তি করল লাল জুলাই। হাজারো ছাত্রজনতার প্রাণের বিনিময়ে একটি রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অর্জিত আমাদের নতুন বাংলাদেশ। বিপ্লবী সরকার গঠন করতে না পারলেও জুলাই এখন গণঅভ্যুত্থানের নাম। ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে সেই গণঅভ্যুত্থানের স্বপ্নও। অথচ নতুন স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষার্থী ও গণমানুষের সাথে শ্রমিকরাও অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। গণঅভ্যুত্থানে বলিষ্ঠ ও সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছে শহরের শ্রমজীবী-মেহনতি সাধারণ মানুষ। এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের অভিভাবক, আর নানা শ্রেণি-পেশার বিক্ষুব্ধ লাখ লাখ মানুষ। এই অর্জনে ছাত্রজনতার প্রাণহানির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষদেরও গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। যত মানুষ শহিদ হয়েছেন, তার মধ্যে শিক্ষার্থীদের বাইরে শহরাঞ্চলের খেটে খাওয়া শ্রমিক শ্রেণির মানুষের সংখ্যাই বেশি। শত বঞ্চনা, বেকারত্ব, না খাওয়া আর মানবেতর জীবনের গ্লানি তাদের গণপ্রতিরোধ ও গণঅভ্যুত্থানের কাফেলায় শামিল করেছে। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, রংপুর খুলনা, বরিশালসহ সারাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে খেটে খাওয়া মানুষের ঢল নেমেছিল প্রতিটি মিছিলে। সাধারণ পরিবারের মহিলারা পানি এবং খাবার নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে। আন্দোলনকারীদের সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়েছে। এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকলেই অনুপ্রাণিত হয়েছিল একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার চেতনায়। এই চেতনাকে শাণিত করেছে নিত্য নতুন স্লোগান, কবিতার পঙ্‌ক্তি এবং সঙ্গীতের সুর মূর্ছনা। একজন ক্ষুদ্র শব্দশ্রমিক হিসেবে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে যথাযথ ভূমিকা পালনের চেষ্টা করেছি আমি নিজেও।

কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের অনুপ্রেরণা। বৃটিশবিরোধী আন্দোলনকে তুঙ্গে তুলেছেন তিনি কবিতার প্রতিবাদী ভাষায়। তিনি 'ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদচিহ্ন' পঙ্‌ক্তিতে ভগবান বলতে ব্রিটিশরাজকেই ইঙ্গিত করেন। 'শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল/ শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল'- এখানে তোদের বলতে ইংরেজদের বুঝানো হয়েছে। ২০২৪-এর জুলাই বিপ্লব গোটা বাঙালি জাতিকে নাড়া দিয়ে গেছে গভীরভাবে। একাত্তরে অর্জিত স্বাধীনতা হারিয়ে যেতে বসেছিল জাতির ঘাড়ে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা বিগত স্বৈরাচারী সরকারের হাতে। গুম, খুন, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৈরাজ্যের নরকপুরীতে পরিণত হয়েছিল স্বদেশ। জুলাই বিপ্লবের রক্তাক্ত সংগ্রামে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাগুলো নতুন মাত্রায় উচ্চারিত হয়ে সংগ্রামী ছাত্রজনতাকে ফুঁসিয়ে তুলেছে। এখানেই নজরুলের কবিতার শক্তি ও সার্থকতা।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন 'রাজবন্দির জবানবন্দি'। দ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের সিংহাসন নড়বড়ে করে শান্ত হয়ে গেলেন রণ সঙ্গীতের এই বুলবুলি। হয়ে গেলেন আমৃত্যু নির্বাক। চব্বিশের জুলাই মাসে তারুণ্যের দলে বিষের বাঁশি হাতে জেগে উঠলেন নজরুল। প্রকম্পিত বাংলার রাজধানী ঢাকা। আন্দোলনের তীব্রতা ছড়িয়ে পড়েছে শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। তাঁর বিদ্রোহী তোলে আবার নতুন ঝংকার- 'মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত/ আমি সেদিন হব শান্ত/ যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না/ অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।' মুক্তির নেশায় মাথায় পতাকা বেঁধে বিপ্লবীদের কণ্ঠে বাজিয়ে দিলেন- 'কারার ঐ লৌহকপাট/ ভেঙে ফেল কর রে লোপাট' 'লাথি মার ভাঙরে তালা/ যতসব বন্দিশালা আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি।'

অনিবার্য জুলাইয়ে আমাদের তরুণেরা-যুবকেরা তাদের তারুণ্য এবং সাহস দিয়ে সেটাই যেন প্রমাণ করে গেল। যদিও এর শুরু অনেক আগে এবং তা নিয়মমাফিক ধীরে ধীরে এগুচ্ছিল কিন্তু সরকারের দমননীতি হঠাৎ করেই তাতে ঘি ঢেলে দিলো। রংপুরের আবু সাঈদ হত্যায় বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ক্রোধে ফেটে পড়ল। তারা দলমত নির্বিশেষে নেমে এল রাজপথে। সঙ্গে যুক্ত হলেন জনগণ। তাদের দমাতে তৎপর হয়ে উঠল ফ্যাসিস্টদের লাঠিয়ালরা। প্রতিরোধে জেগে উঠেছিলাম কবি-সাহিত্যিকরাও। কাজী নজরুল ইসলামের পাশাপাশি কবি ফররুখ আহমদ এবং আল মাহমুদের কবিতাও গর্জে উঠেছিল জুলাইয়ের রক্তাক্ত সংগ্রামের ফুয়েল হিসেবে। সেইসাথে সমকালীন কবিরাও চমকে তুলেছিলেন জুলাই আন্দোলনের বিপ্লবীদের। অসংখ্য কবির কবিতা গর্জে উঠেছিল এই সংগ্রামের অনুপ্রেরণা হিসেবে।

জুলাই আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই সরাসরি জড়িত ছিলাম আমি নিজে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের ছায়া দিয়ে আশেপাশেই ছিলাম কোটা-বিরোধী আন্দোলনের সময়। শহিদ আবু সাঈদ জুলাই মুক্তি আন্দোলনে ফুঁসে উঠা এক অগ্নিগিরি। ছোট ভগ্নিপতি সৈয়দ মোস্তফা জামান শহিদ হঠাৎ করেই স্ট্রোক করে প্যারালাইজ হন। তাকে দেখতে আমি গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তাঁকে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলো। রংপুরে আবু সাঈদের শাহাদতের পরে আমার পক্ষে আর বগুড়ায় থাকা সম্ভব হলো না। ঐ দিনই আমি চলে এলাম রাজশাহীতে। ১৬ জুলাই চলন্ত গাড়িতে বসেই লিখে ফেললাম 'লাল জুলাইয়ের কবিতা' শিরোনামে একটি বারুদমাখা ছড়া-

ফুলগুলো সব লাল হলো আজ, রক্ত দিয়ে আঁকছে সবাই বৃত্ত
মানুষ খেকো ডাইনি তবু, রক্ত নেশায় করছে মাতাল নৃত্য

অরুণ বরণ তরুণ সমাজ জেগেছে
সব মানুষের রক্তে আগুন লেগেছে
'জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্রসমাজ জেগেছে
লেগেছে রে লেগেছে, রক্তে আগুন লেগেছে '
'বুকের ভেতর দারুণ ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর'

ঝড়ের বেগে উড়বে আসন, মানবে না কেউ দখল শাসন
ভাঙবে রে তো গদির ঘর, বুক পেতেছি গুলি কর

শহিদ সাঈদ ডাক দিয়েছে, অধিকারের লড়াই আজ
হাজার মায়ের দামাল ছেলে, রক্তমাখা বীরের সাজ
'বুকের ভেতর দারুণ ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর'

নতুন দিনের বিজয় মিছিল আসবেই,
কষ্ট ভুলে দেশের মানুষ হাসবেই।

২০২৪ সালের ১৮ জুলাই দুপুর ১২টার সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ এবং দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলমান হামলা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নিপীড়ন-বিরোধী ছাত্র-শিক্ষক ঐক্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর ব্যানারে শহিদ বুদ্ধিজীবী চত্বরে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. সালেহ্ হাসান নকীবের নেতৃত্বে আমার সেই কর্মসূচিকে সফল করে তুলেছিলাম। সে সময় একটি প্রতিবাদী ক্রিকোণ কবিতা লিখেছিলাম। কবিতার ভাষা ছিল এ রকম- 'কয়লা থেকে ময়লা কালো সরবে না/ বিপ্লবীরাও রাস্তা থেকে ইঞ্চি-বিঘত নড়বে না/ তারকাটাতে যতই মারো ভয়-ভীতি কেউ করবে না।'

'ছত্রিশ জুলাই' শব্দটিকে আমি ভীষণভাবে পছন্দ করি। আমাদের সন্তানেরা যখন জুলাই মাসকে সম্প্রসারিত করতে লাগল তখনই আমার মতো অনেকের ভেতরেই একটা জেদ এবং বিজয়ের স্বপ্নময় সম্ভাবনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। সেই সংগ্রাম মুখর দিনগুলোতে কিছু পঙ্‌ক্তি লিখেছিলাম এভাবে-

'কবিদের চোখে মুখে সাহসের চিন
বিশ্বাসে বিশ্বাসে তুলে আনো সুখ
তাকবির ধ্বনি শুনে ভয়ে কাঁপে কাফেরের বুক।'

স্বরবৃত্ত ছন্দে লিখেছিলাম-
'শোক সারানোর পায় না উপায়

কষ্টে কাঁদে বুক
ভাঙা ডানায় উড়ছে পাখি
পায় না খুঁজে সুখ।'

আন্দোলন ঠেকাতে যখন মরিয়া হয়ে ওঠে দানবীয় ফ্যাসিস্ট, লেঠেল বাহিনী, হেলমেট বাহিনী, তার সাথে যুক্ত হয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর রাষ্ট্রীয় নারকীয় তাণ্ডব, তখনও চুপ করে বসে থাকেনি কলম- 'বাগানের গাছগাছালির চোখে মুখে ভয়ার্ত শঙ্কা/আহত ফুলেরাও তাকায় বেদনার্ত চোখে/ কোলাহলের ভেতরে পাখিদের আর্তচিৎকার/ আকাশেও বিজলির গর্জন, গুড়ুম গুড়ুম/ তবুও সদর্পে চালায় দানবীয় তাণ্ডব, উল্লাসী নৃত্য, কুয়াশায় ঢেকে দেয় চোখের মণি।/ আমরা এখনও সূর্য খুঁজি, চাই আলোকিত ভোরের খবর।'

অন্য গীতিকবিতায় লিখেছিলাম- 'ভয়ের আঁধারে মাখি সাহসের নূর
বৃষ্টিতে ভিজে নেই হৃদয় জমিন
তাকোয়ার স্বরলিপি হৃদয়ে মেখে
শষ্যের মাঠে হবো সাচ্চা মোমিন'।

এককজন শহিদের খবরে ভেঙে পড়িনি। আকাশের মালিকের কাছে প্রার্থনা করেছি। শহিদ পরিবারের জন্য সান্তনার বাণী খুঁজেছি। তাইতো তাদের উদ্দেশে দুটো লাইন-
'মুক্ত আকাশ মুক্ত স্বদেশ, রক্তমাখা রাস্তায়
মায়ের চোখে অশ্রু নাচে, শান্তি সুখের আস্থায়'।

জুলাইয়ের আন্দোলনে স্লোগানে মুখরিত করে রেখেছিলাম রাজপথ। মাঝে মাঝে কিছু স্লোগান বানিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতাম। রাজকার বলে শিক্ষার্থীদের গালি দেবার সময় কয়েকটি স্লোগান বানিয়ে দিয়েছিলাম- 'টঙ্গিপাড়ার ঢঙ্গি, তুই রাজাকার জঙ্গি।' 'টঙ্গিপাড়ার ঢঙ্গি, ডাইনি খুনি জঙ্গি।' 'এই রক্ত শ্রমিকের, এই রক্ত মরে না'। 'এই রক্ত তারুণ্যে, এই রক্ত মরে না'। আন্দোলনের তীব্রতায় রাজপথে কাটিয়ে গেল পুরো সময়। একপর্যায়ে পঁয়ত্রিশ জুলাইয়ে আমি এই কবিতাটি লিখেছিলাম। রক্তের দাগে আঁকছি স্বদেশ/ মাহফুজুর রহমান আখন্দ-

কবিতার মাঝে স্বপ্ন খুঁজেছি, শান্তি খুঁজেছি তোমার চোখে
রক্তের দাগে আঁকছি স্বদেশ, পরাভব নেই পাথর শোকে

ছিন্ন মাংসে শকুনের থাবা, ভয়-ডর তবু করেছি বিদায়
একটি জীবন থাক বা না থাক, তাতেও আমার কি আসে যায়
বাউড়ি বাতাসে উড়াবো কষ্ট, হাজার বছর অন্তর্লোকে

শক্ত বাহুতে বেঁধেছি পতাকা, গুণছি এখনো বিজয়ের দিন
মায়ের বক্ষে গোলাপ ফুটবো, মুছে ফেলবোই কষ্টের চিন
ফেরদাউসে হাসবে রাইহান, শান্তি আসবে ধরার বুকে।

অবশেষে বিজয় এল ছত্রিশে জুলাইয়ে। ঐদিনও সকাল থেকেই ছিলাম আন্দোলনের সম্মুখভাগে। রুয়েট গেট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন গেট। কাজলা থেকে ভদ্রা মোড়। কাজলা থেকে সাহেব বাজার আলুপট্টি মোড়। শহিদ সাকিব আনজুম এবং আলী রায়হানসহ অসংখ্য ভাইয়ের রক্তে প্লাবিত হয়েছিল কালো রাজপথ। ঠিক তার কিছুক্ষণ পরেই বিজয়ের খবর এল। রক্তাক্ত রাজপথেই শুরু হলো বিজয়ের উল্লাস। তখন লিখেছিলাম-

'রক্তকণায় জ্বলছে আগুন ভোরের সূর্য লাল
তরুণ-যুবার ত্যাগের বিজয় স্মরবে মহাকাল।'

বিজয়ের কয়েকদিন পরে লিখলাম একটি গদ্যকবিতা। একটি কবিতার লেখাচিত্রে এঁকে দিলাম পুরো আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। কবিতাটি ব্যাপকভাবে আবৃত্তিকারদের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকল। শিল্পময় নতুন স্বপ্ন/মাহফুজুর রহমান আখন্দ-

কালো মেঘ জমতে জমতে অমাবশ্যা নেমে এলো বাংলাদেশে
ঠোঁটের উপর সাঁটিয়ে দিয়েছে রুদ্ধশ্বাসের তালা
চোখের মণিতে বসিয়ে দিয়েছে তথাকথিত পিতৃচেতনার ঘোলাটে লেন্স
গুমোট অন্ধকারে নির্মিত কাঁচের দেয়াল
ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল জুড়ে গুয়ান্তোনামো, জল্লাদের আস্তানা
হতাশার গরম নিঃশ্বাস, হয়তো আলো আসবে না আর কখনো।

কালের সাক্ষী হয়ে সাকিনা নাজিল হলো আসমান থেকে
অন্ধকারের ভিত ভেঙে ক্রমশ কবিতাময় হয়ে উঠলো বাংলাদেশ
ফ্যাসিবাদের মাথাল ফেলে খরা-বৃষ্টিতে লাফিয়ে পড়লো তারুণ্য, গাজী সালাহদিন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ছাপিয়ে তারুণ্যের ঝড় নিমিষেই পৌঁছে গেলো সবখানে
স্কুলের মায়াবী হাসি, কলেজের টগবগে তরুণ, মাদরাসার সফেদ আত্মা
সবখানে তারুণ্যের গেলাফ, স্বপ্নবোনার চাষবাস
মুখরিত স্লোগান 'লাল সবুজের বাংলায়, ফ্যাসিবাদের ঠাঁই নাই'

গণমানুষের ঘাড়ে তখনও চেপে বসে আছে ফ্যাসিবাদের জগদ্দল পাথর
ক্লান্তি জিরানোর কল্পনায় কাঁধ বদল করলেও গুম খুন কিংবা চৌদ্দ শিকের আবাস
অস্থিরতার কারবালা যেনো গ্রামের প্রতিটি প্রান্তর, প্রতিটি নগর শহর

সাহসের পাহাড় বুকে দারুবৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে গেলো আবু সাঈদ
প্রকম্পিত হলো বাংলাদেশ, বুকের রক্তে সিক্ত হলো হৃদয়-মৃত্তিকা
জেগে উঠলো জনপদ, মানুষ দাঁড়িয়ে গেলো বৃক্ষময় পাহাড়ের মতো
চোখে মুখে অন্ধকার ঢাকার পত্রপ্রলেপ
মানবিকতার জৌলুশে কৈ মাছের মতো উজানে বিলিয়েছে স্বপ্ন
সম্ভাবনার দুয়ার খুলতে খুলতে বুলেটে ফুঁড়েছে বুক
রক্তাক্ত পিচঢালা রাজপথ, সবুজের প্রান্তর, তবুও বিরামহীন সামনে চলা।

মুগ্ধতার কোন সীমারেখা নেই, অসীম আকাশে নীলিমার সাথে মিশে গেছে
আবু রাইহানরা মিশে গেছে সূর্যরশ্মিতে, চাঁদের কোমলতায়, নক্ষত্রের বাগিচায়
আরশের পবিত্র ছায়ায় বসে গেছে জান্নাতি মেহমান
হার-জিতের কল্পিত খেলায় গুডবাই, বিদায় ডাইনি
বিজয়ের পথে স্বপ্ন কুড়ানো, মানবমুক্তির মিছিল স্লোগানে শিল্পময় নতুন স্বপ্ন
বিজয়ের মুচকি হাসিতে উদ্ভাসিত আমার লাল-সবুজের রক্তাক্ত বাংলাদেশ।

নুতন বাংলাদেশের দায়িত্ব নিলেন নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস। স্বপ্নময় পরিকল্পনা আঁকলেন বাংলাদেশ নিয়ে। মুক্ত বাতাসে আমরাও তাঁকে সার্পোট করে এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর। আমাদের শিক্ষার্থীরা ভঙ্গুর বাংলাদেশ নির্মাণে প্রশাসনের পাশে দাঁড়াল। ট্রাফিক ও বন্যাপরিস্থিতি মোকাবিলাসহ হাজারো সমস্যায় স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে প্রমাণ করল তারুণ্যের দেশপ্রেমের নজরানা। তখনই লিখলাম-
'বিপ্লবী সাথিরা জেগে আছি রাস্তায় রাত দিন
স্বাপ্নিক নাবিকেরা স্বদেশের নির্মাণে হাত দিন।'

দেশ এগিয়ে যাচ্ছে শৃঙ্খলার দিকে। তখনই ফ্যাসিবাদের প্রেতাত্মারা দেশের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। আনসার, রিকশাওয়ালা, অধিকার বঞ্চিত জনতা সেজে নানা উপায়ে হাজারো দাবি দাওয়া নিয়ে মাঠে নামতে লাগল। মূলত রাষ্ট্রযন্ত্র অকার্যকর করার একটা ষড়যন্ত্র। পতিত ফ্যাসিস্ট সরকারের অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এক সাংঘাতিক অপতৎপরতা। তখন আমি লিখলাম 'উঁকি মারে কে রে' নামের একটি ব্যঙ্গ ছড়া। ছড়াটি সারাদেশে ছড়িয়ে গেল। অনুপ্রাণিত হলো আশাবাদী মানুষেরা। ছড়াটির কথাগুলো ছিল-
ফ্যাসিবাদের কবর থেকে, উঁকি মারে কে রে
কত্তো বড়ো বুকের পাটা, দে বুঝিয়ে দে রে
স্বৈরাচারের নাতি
সাজায় নতুন নাটক ফাটক, সার্কাসের ঐ হাতি
দেশের মানুষ আবার জাগো, হাতে তোলো লাঠি
বাত্তি জ্বালাও খুঁইজ্যা দেখো, কে নাড়ে কলকাঠি।

এক বছর অতিক্রম হতে চলেছে আমাদের জুলাই বিপ্লবের। জুলাইয়ের রঙিন স্বপ্নগুলো ক্রমশ খেয়ে ফেলছে আধিপত্যবাদী মনোভাপন্ন কিছু রাজনৈতিক নেতা। চান্দাবাজি আর ধান্দাবাজিতে আবারো ফ্যাসিস্টদের অনুসরণ করছে। আধিপত্য বিস্তৃত করতে নিজেদের দলীয় লোকদেরকেও হত্যা করতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না। তাইতো আমার গীতিকবিতা-

মায়ের বুকে কান্না বিলাপ জুলাই হলো লাল
রক্তধারার এই ইতিহাস বইবে মহাকাল
ইতিহাসের পরম্পরায় বাংলাদেশের এই জমিনে
লাল সবরে আনবো কিনে নতুন অন্ত্যমিল

পাহাড় বলে উঁচু মাথায় শক্ত পায়ে খাঁড়াও
সাগর বলে সাহস নিয়ে বুকে ছাতি বাড়াও
আকাশ বলে চোখের তারায় ধারণ করো নীল
তোমার বুকে উড়বে বিজয় হাজারো গাঙচিল

ডাইনি বুলেট দস্যু দানবসমাজ থেকে তাড়াও
স্বপ্নবোনা জুলাই সেনা কোমল দুহাত বাড়াও

চান্দাবাজি ধান্ধাবাজি দখলদারিও শেষ
সাহস নিয়ে আনবো দেশে সুখের পরিবেশ
আল কুরানের সুখি সমাজ স্বপ্ন কাজে আঁকো
দেখবে নেমে আসবে ধরায় উমর দরাজ দীল

সম্প্রতি একজন ব্যবসায়ীকে পাথর দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো। আইয়ামে জাহেলিয়াতকে হার মানিয়ে এ যেন জুলাইয়ের স্বপ্নকেই হত্যার শামিল। তাইতো আমি লিখলাম-

মানুষে মানুষ মারে পশু পায় লজ্জা, অমানুষ দানবেরা দেয় হাততালি
তবু তারা ক্ষমতার দেখে ফুলসজ্জা, সত্যের বাহকেরা খেয়ে যায় গালি!
বাংলার মানুষেরা ভাবো এশবার, হায়েনার চেয়ে যারা হিংস্র দানব
আর কতো কষ্টের নদী হবে পার, মানবিক কালচারে তারা কি মানব!
চলো আজ খুঁজে নেই ভালো রাহবার, মানুষের কাছাকাছি যেতে চায় যারা
যারা টানে আল্লার দিকে ফিরবার, অধিকার ফিরে পাবে যারা সবহারা
সুখি-দুখি একসাথে রবে পাশাপাশি, মানুষে মানুষে হবে ভালোবাসা বাসি।

এখন সময় নতুন করে প্রতিজ্ঞা করার। জুলাইকে কোনোভাবেই ধ্বংস করার সুযোগ দেওয়া যাবে না। জুলাই ধ্বংস হলে নিঃশেষ হয়ে যাবে সকল বিপ্লবী। নতুন করে ফ্যাসিবাদের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলবে। সেই আগুনে পুড়বে স্বদেশ। জ্বলবে

মানুষ। সকল বিপ্লবী ঝুলে পড়তে পারে জুডিশিয়াল কিলিংয়ে। সেই আগুনের লেলিহান শিখা নিভানো আর কোনাভাবেই সম্ভব হবে না। তাইতো এই গীতি কবিতায় সেই প্রতিজ্ঞা সম্পসারিত করেছি- 'মরার মতোই মরবো'

যমুনারে যমুনা
তোর কাছে আর মনের ব্যথা কমুনা
তোর বুকে আজ কান্না বিলাপ শুনি
আমরা তবু চোখের কোণায় নতুন স্বপ্ন বুনি
স্বপ্নে মাখি সবুজ সবুজ ঘাস
হলদে ফিকে হচ্ছে তবু
বুকের ভেতর কষ্ট বারো মাস
দখলদারি খুন-খারাবি সিন্ডিকেটের দায়ে
স্বপ্নগুলো বন্দী খাঁচায় মারছে পিশে পায়ে
হায়না শকুন পাগলা কুকুর করছে দখল পথ
বুকের ভেতর গুমড়ে কাঁদে স্বাধীন মতামত
পাথর ঘষে আগুন জ্বালাও মরার মতোই মরবো
জাগো বাহে কোনঠে সবাইকণ্ঠে মিছিল ধরবো।

পরিশেষে বলতেই হয়, বিপ্লবীদের শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তের ফোয়ার সৃষ্টি করেশিল্প-সাহিত্য। আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বর্তমানে সময়ের প্রয়োজনে আবির্ভূত হওয়া কবিতা, গান জুলাই বিপ্লবকে সফল করা এবং বিপ্লবকে স্থায়ীত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। এখনও স্মরণ রেখে উচ্চারণ করা প্রয়োজন- 'হৃদয়ে হৃদয় ভাঙে নূপুরের তালে ভাঙে সাহসের পা/ সময়ে সময় কাটে বাতাসের তোড়ে ভাঙে সবুজের গাঁ/ মাঠের ফসল হাসে গোধূলি আলোতে হাসে নেংটি ইঁদুর/ পাঁজরের হাড় ভাঙে বন্ধুর কালো হাত মুছে ফেলে সিঁথির সিঁদুর।'আর তাই লাল জুলাইয়ের গান কবিতায় লিখলাম- 'থাকবে জুলাই রাখবো জুলাই, মারতে দেবো না/ অধিকারের চলবে লড়াই, ভেঙে দেবো দম্ভ বড়াই, ন্যায় বিচারের স্বপ্নসকাল কাড়তে দেবো না। থাকবে জুলাই, রাখবো জুলাই রাখবো/ স্বজন হারা কষ্টগুলো শান্তি দিয়ে ঢাকবো।/ চাদা চেয়ে চোখ রাঙালে চলবে লড়াই, শান্তি সুখের ঘুম ভাঙালে চলবে লড়াই, ঘুসের দাবি কানাকড়ি ধরতে দেবো না/ আমার বোনের করলে ক্ষতি চলবে লড়াই, আমার ভাইয়ের স্বপ্ন খেলে চলবে লড়াই, আব্বা মায়ের চোখের পানি ঝরতে দেবো না/ খুনি যদি আবার ফেরে চলবে লড়াই, পেশীর গরম কেউ দেখালে চলবে লড়াই, খুন খারাবি মাস্তানি আর করতে

দেবো না।'' বিপ্লবী মানুষেরা রাজপথে জেগে আছি, নির্ভয়ে জেগে রবো কালো রাত-দিনে, সুখের স্বদেশ হলে আমাদেরও মনে রেখো, রক্তের বিনিময়ে রেখেছি গো স্বাধীনতা কিনে।' সর্বোপরি একটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে আমার 'লাল জুলাইয়ের প্রেম' শিরোনামে। প্রতিটি কবিতা তিন লাইনের। সকল কবিতার অদ্যাক্ষর ক বি তা। প্রথম লাইনের শুরু বর্ণ ক, দ্বিতীয় লাইনের বি এবং তৃতীয় লাইনে তা। এই তিন লাইনের শুরু বর্ণ মিলিয়ে ক বি তা। বিপ্লবীদের সাথে স্মরণীয় হয়ে থাক আমাদের সকল সৃষ্টিশীলতা, স্মরণীয় হয়ে থাক প্রতিটি পঙ্‌ক্তিবারুদ। স্মরণীয় হয়ে থাকুক প্রত্যেক বিপ্লবী মানুষের আত্মত্যাগের কাহিনি।

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ, কবি ও গবেষক; প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; সাধারণ সম্পাদক, কবিতা বাংলাদেশ

জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের প্রেরণাদায়ক সংগীত

ড. জি এম শফিউর রহমান

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে কবিদের ভূমিকা নেহায়েত কম নয়। ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করেন উর্দু কবি হাসরাত মোহানী ১৯২১ সালে। পরবর্তীকালে ১৯২২ সালের ১৩ অক্টোবর বাঙালি কবি কাজী নজরুল ইসলাম ধূমকেতু পত্রিকার মাধ্যমে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন।

নজরুলসহ কবি, গীতি কবিদের গান ১৯৭১ সালে দেশের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণা যুগিয়েছে। মুক্তিকামী মানুষের স্বাধীনতার আন্দোলনে, স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিপ্লবে, অভ্যুত্থানে কবিদের গান যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে তা ২০২৪-এর জুলাই-আগস্ট বিপ্লবে আবারো প্রমাণিত হয়েছে।

গীতিকবি মোহিনী চৌধুরী লেখা এমন সুরকার চন্দ্র দে (মহান শিল্পী মান্না দে-এর কাকা)'র গান 'মুক্তির মন্দির সোপানও তলে, কত প্রাণ হলো বলিদান....', ২৪'র বিপ্লবে বিপ্লবীদের মুখে মুখে ছিল। কবি নজরুল ইসলাম'র 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার হে, লংঘিতে হবে রাত্রি নিশিথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার হে', 'কারার ঐ লৌহ কপাট' এবং 'শিকল পড়া ছল মোদের শিকল পরা ছল, শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল' গানগুলো আন্দোলিত করেছে আন্দোলনকারীদের।

১৬ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ভিসির বাসভবনের সামনে বিপ্লবীরা সমবেত কণ্ঠে গান গেয়ে প্রতিবাদ জানায় দুনিয়া কাঁপানো বিপ্লবী গান– 'আমরা করব জয়, আমরা করব জয় একদিন'। ঝিমিয়ে পড়া আন্দোলনকারীদের আবারো চাঙ্গা করে এই গানটি।

'আওয়াজ উডা' গানটি ১৮ জুলাই প্রকাশিত হবার পর পরই দেশব্যাপী ব্যাপক ভাইরাল হয়। হান্নানের লেখা ও গাওয়া গানটি যেন বিপ্লবীদের সময়ের কথা ও কণ্ঠস্বর হিসাবে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। হান্নান স্বৈরাচারের পুলিশবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হন এবং স্বৈরাচারের পতনের পর মুক্তি পান। ৩০ জুলাই নেট দুনিয়ায় আপলোড করা 'চব্বিশের গেরিলা' গানটিতে প্রশ্ন রাখা হয় 'আমরাই যখন রাজাকার, তাইলে ক তুই রাজা কার'? দ্রুত সারা ফেলে কোটা সংস্কার আন্দোলনে শহিদদের নিয়ে শিল্পী সায়ানের লেখা ও নিজ কণ্ঠে গাওয়া গান বিপ্লবীদের প্রেরণা জুগিয়েছে। শহিদ আবু সাঈদ ও ফাইয়াজকে নিয়ে তার গান শুনে অনেকেই আন্দোলনে যোগদান করেছেন। তরুণ শিল্পী সেজান'র গাওয়া 'কথা ক' গানটি আন্দোলনকে বেগবান করেছে।

গীতিকার ইথুন বাবু'র লেখা মৌসুমী চৌধুরী'র গাওয়া 'দেশটা তোমার বাপের নাকি' গানটি আন্দোলনের অনেক আগ থেকেই বহুল প্রচারিত হয়ে আসছিল, যা আন্দোলনের সময় মানুষকে সাহসী করে তুলেছিল।

আন্দোলনকারীদের কণ্ঠে গীত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানটি আবেগাপ্লুত করেছে সবাইকে। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানটি জাতি ধর্ম-বয়স-নির্বিশেষে সবাইকে আপ্লুত করেছে।

শাহান কবন্ধ-এর লেখা শূন্য ব্যান্ডের গান 'শোনো মহাজন, আমি নয়তো একজন, শোন মহাজন, আমরা অনেকজন' গানটি এই বিপ্লবে বহুল উচ্চারিত গান, যা প্রাণ যুগিয়েছে বিপ্লবীদের আন্দোলনে। ২০১৪ সালে প্রকাশিত শূন্য ব্যান্ডের চতুর্থ অ্যালবাম "ভাগো"র এই গানটি এই স্বৈরাচার বিরোধী।

গীতিকার, শিল্পী হায়দার হোসেন'র 'চিৎকার করে কাঁদিতে চাহিয়াও করিতে পারিনি চিৎকার' গানটিও আন্দোলনে অনুপ্রেরণার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল।

জুলাই বিপ্লবের সময় গীত অনেক গানের সঙ্গে আন্দোলনকে উজ্জীবিত করেছে 'বাংলা মা', 'বায়ান্ন', 'দেশ সংস্কার', 'স্বাধীনতার গন্ধ', 'ছাত্র', 'স্লোগান', 'অধিকার', 'দেশ কার', 'আবু সাঈদ', 'রক্ত', 'দেশ কারও বাপের না', 'জবাব দে', 'জয় বাংলা', 'কত খাবি', 'শকুনের চোখ' গানগুলো। সুতরাং বুঝা যায় যে, যুগে যুগে বিপ্লবে, আন্দোলন-সংগ্রামে গানের ভূমিকা অপরিসীম। তাই গানগুলো হয় বিপ্লবের সঙ্গী, আমাদের ইতিহাস।

'কন্যারে' শিরোনামে গান গেয়ে জনপ্রিয়তা পাওয়া শান সায়েক ছাত্র আন্দোলনের শহিদ মুগ্ধ, আবু সাঈদসহ অন্যান্যদের নিয়ে গান তৈরি করেছেন। আলোচিত 'তোমাদের ভুলব না' শিরোনামের গানটি লিখেছেন ও সুর করেছেন মিফতাহ করিম। শানের সঙ্গে আরো যারা গেয়েছেন তারা হলেন লতা আচার্য্য ও মুত্তাক হাসিব।

ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটাতে ২০২৪ সালে জুলাই মাসে শুরু হওয়া ছাত্র-জনতার আন্দোলনে যেসব গান আন্দোলনকারীদের প্রেরণা জুগিয়েছিল, উদ্বুদ্ধ করেছিল এদেশের সব শ্রেণির মানুষকে, সেসব গান এবার এক মলাটে ভিতরে নিয়ে এসেছেন অর্থাৎ বই আকারে নিয়ে এসেছেন আলোকচিত্রী ও অ্যাক্টিভিস্ট মনজুর হোসেন।

তাঁর উদ্যোগে 'জুলাইয়ের গান' শিরোনামে বই প্রকাশ হচ্ছে। ২৪-এর ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের ১৫ জুলাই থেকে আগস্ট পর্যন্ত যেসব গান প্রকাশিত এবং গীত ৬৩টি গান সংকলিত হয়েছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে বাংলাদেশের র‍্যাপ গায়কদের অবদান ছিল শ্রদ্ধা করার মতো আর সেই সময়কে, সেই গায়ক প্রজন্মকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে দলিল হিসেবে বাঁচিয়ে রাখতেই এই বই প্রকাশের উদ্যোগ।

বিপ্লব পরবর্তী বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং বিভিন্ন শহরে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় কিছু কাওয়ালী গান। তার মধ্য 'কুন ফায়া কুন, কুন ফায়া কুন' এবং 'মওলা ইয়া সাল্লি ওয়া সাল্লিম দা ইমান আবাদান' মানুষের মুখে মুখে গীত হতে দেখা যায় সর্বত্র।

আবারও ফিরে আসি সেই হাসরাত মোহানীর কাছে। যার দেওয়া ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের স্লোগান 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ২৪'র বিপ্লব পরবর্তী বাংলাদেশে বিপ্লবীদের নিজস্ব স্লোগানে পরিণত হয়েছে।

ড. জি এম শফিউর রহমান, প্রফেসর, ম্যাটেরিয়ালস্ সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই গণপরিসর ও সাম্প্রতিক শিল্পভাষ্য

ড. ফজলুল হক তুহিন

সমকালীন ইতিহাসের সাথে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির যোগসূত্র নিবিড়। বিপুল প্রভাব বিস্তারি কোনো ঘটনা জীবন ও সমাজের সাথে সাথে শিল্পকলার সব প্রান্তকে প্রভাবিত করে ভেতরে-বাহিরে। বিপ্লব বা অভ্যুত্থানের পূর্বাপর ঘটনাপ্রবাহ শিল্প-সাহিত্যের ভাষাকে নতুন ব্যঞ্জনা ও মাত্রায় উন্নীত করে। অনেক আগে থেকেই লেখক-শিল্পী আসন্ন অভ্যুত্থানের ভাব ও ভাষার পাটাতন নির্মাণে তৎপর থাকেন। ইউরোপের রেনেসাঁ, ফরাসি, বলশেভিক ও ইরানি বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত ও ভাষা তৈরির কাজ আগে থেকেই সৃষ্টিশীল ও মননশীল সাহিত্যিক-শিল্পীর হাতে সম্পন্ন হয়। একইভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে সিপাহি বিপ্লব ও স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ব থেকেই ঔপনিবেশিকবিরোধী শিল্প-সাহিত্য সৃজনের কাজ শুরু হয়ে যায়। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে জুলাই গণজাগরণ, গণহত্যা ও গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইতিহাসের অদ্বিতীয় যে বাঁকবদল সম্পন্ন হয় তার সার্বত্রিক প্রভাব অসামান্য। আর জুলাই বিপ্লবে নতুন স্বাধীনতার স্বাদ পায় আমজনতা। এই জাগরণ ও গণ-অভ্যুত্থানের শিল্পভাষ্য রচিত হচ্ছে জুলাই পরবর্তী সাম্প্রতিক বাংলাদেশের কবিতা, গান, স্লোগান, গ্রাফিতি, প্রবন্ধ ও কথাসাহিত্যে। চব্বিশ পূর্ববর্তী অধীনতামূলক প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়ে সমকালীন বাংলা সাহিত্য হয়ে উঠছে স্বাধীন, গণমুখী ও দেশজ। এই অভ্যুত্থানকে সংহত করতে ও আগামীর বাংলাদেশ নির্মাণে সংবিধান, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির পুরাতন কাঠামো ভেঙে জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনায় উজ্জীবিত নতুন ভিত্তি নির্মাণ একান্ত প্রয়োজন।

আলজেরিয়ার মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম নায়ক ফ্রাঞ্জ ফানো 'জগতের লাঞ্ছিত' (The Wretched of the Earth) গ্রন্থে বলেন: "একটি জাতি শুধু তার সংস্কৃতির ফসল, তার অবিরাম রূপবদল এবং গভীরত্বের বহিঃপ্রকাশ নয়; জাতি তার অপরিহার্যতাও বটে। জাতীয় অস্তিত্বের যুদ্ধই সংস্কৃতিকে গতিশীল করে এবং সৃজনশীলতার দ্বার খুলে কাঠামোকে নিশ্চিত করবে। সংস্কৃতি সৃষ্টির জন্য জাতি অপরিহার্য বস্তু একত্রে জড়ো করে; সেই বস্তুসামগ্রীই তাকে বিশ্বস্ততা, আয়ু, জীবন এবং সৃজনক্ষমতা প্রদান করতে পারে। একইভাবে সংস্কৃতির জাতীয় চরিত্রই তাকে অন্যের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলবে; অন্য সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করবে এবং অধিকার করবে। ... জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে জাতির জন্ম, যা জনগণের সত্যিকার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ, রাষ্ট্র পরিবর্তনের সময় সে যদি সংস্কৃতির বিশেষভাবে ঋদ্ধ-ফর্মে তার বহিঃপ্রকাশ না ঘটায়, তার নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। ... জাতীয় সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ এবং প্রাণপ্রাচুর্য সমভাবে

মুক্তিসংগ্রাম সৃষ্টিকারী মূল্যবোধেরই অভিন্ন অংশ।" [ফ্রাঞ্জ ফানো, *জগতের লাঞ্ছিত*, আমিনুল ইসলাম ভুইয়া অনূদিত, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০২২,পৃ. ১৭৭-১৭৮] সুতরাং চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে নির্ধারণ হয়ে গেছে বর্তমান নতুন এক বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অভিযাত্রা।

কবিতা সমকালীন গণমানুষের স্পন্দকে ধারণ করলেই হয়ে ওঠে সম্মিলিত কণ্ঠস্বর; শিল্পকলায় কবিতা তখন ব্যক্তিগত সীমা ছাড়িয়ে সামষ্টিক ব্যঞ্জনায় সরব ও জনমনস্পর্শী ভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়; ঘর-প্রাঙ্গণ হয়ে রাজপথে বুলেটের প্রতিরোধে অদৃশ্য প্রেরণা ও সাহসের আগ্নেয়াস্ত্র হয়ে কথা বলে। জাতীয় জীবনের বিশেষ ক্ষণে, ঐতিহাসিক পথচলায়, রক্তাক্ত আন্দোলনে কবিতা অনেক সময় বারুদের ভাষায় গতির লক্ষ্যভেদী হাতিয়ার হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর শৃঙ্খল ভেঙে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা একাই রক্ত বলকানো সামষ্টিক চেতনায় আত্ম-উদ্বোধন, জাগরণ, দ্রোহ ও প্রতিরোধের রণঝংকার তোলেন শিল্পকলার নয়াভাষায়। পরবর্তী মুক্তিসংগ্রামের প্রতিটি অধ্যায়ে নজরুলের কবিতা প্রেরণার বাতিঘররূপে আলো ছড়িয়েছে। বাংলাদেশে চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানেও তাঁর কবিতা-আগুনের ফুলকি বিপ্লবীদের রণক্ষেত্রে শক্তি যোগায়। নজরুলের বিপ্লবী চেতনায় উজ্জীবিত কবিদের কলম সাম্প্রতিক লাল জুলাইয়ের দ্রোহী মিছিলে শামিল হয়। গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাপ্রবাহ ও ভাষা ধারণ করে নতুন স্বরে কথা বলেন এই সময়ের কবিবৃন্দ। কয়েকটি কবিতার দৃষ্টান্ত:

শোকগাথা থেকে গেছে অদৃশ্য আড়ালে
ঝরে গেছে কত প্রাণ স্বপ্ন আর সম্ভাবনা
প্রতিবাদে পাখিরা গায়নি গান বন্ধ্যা নদীস্রোত
হঠাৎ বিপ্লবে ঝড়ে আলুথালু জেগেছে বসুধা
'গুম' শব্দ অবশেষে আকাঙ্ক্ষিত মুক্তিও পেয়েছে।
[হাসান হাফিজ]

রাষ্ট্র উদ্ধারে আজ আসমুদ্র স্বদেশ ব্যাকুল ,
ফ্যাসিবাদমুক্ত দেশে ফুটবেই পলাশ-শিমুল।
এ ভূমির সবাই আজ তোর মতো সাঈদ সাঈদ,
সম্মিলিত স্বপ্ন চায় রাহুমুক্ত পবিত্র ঈদ।

ফিরে আয় হে সন্তান, ফিরে আয় শূন্য এ বুকে
অমানুষ উৎখাত করে মরি ফের সগৌরব সুখে।
[আবদুল হাই শিকদার]

যে ভোলে ভুলুক-
আমি আমার রক্তের কালিতে
সূর্যের করপুটে লিখে দিলাম একটি নাম-

লাল চব্বিশের পাঁচই আগস্ট।
[মোশাররফ হোসেন খান]

আমি দেখলাম পাঁচই আগস্ট উড়ছে আকাশে সোনালি ঈগল,
তাকে ঘিরে নৃত্য করছে একজোড়া কপোত-কপোতী আর
বাংলাদেশের সমস্ত দোয়েল।
[সায়ীদ আবুবকর]

এইসব স্মরণীয় পঙ্‌ক্তিমালা আমাদের আরো অনেক কবির বিপ্লবী কবিতার কাছে নিয়ে যায়। জাহাঙ্গীর ফিরোজের 'ঘুরবে রথের চাকা'; মাহবুব হাসানের 'বোবা-কালা জনগণ'; আবদুল হাই শিকদারের 'আমরা মানুষ আমরা এসেছি', 'সাঈদ', 'স্বাধীনতা ও মুক্তি', 'স্বদেশ ও সন্তান', 'মুগ্ধ', 'জুলাই বাংলাদেশ'; সোলায়মান আহসানের 'আমাদের লড়াইটা শেষ হয়নি'; মুজতাহিদ ফারুকীর 'যারা রুয়ে দিলে রক্ত-বীজ'; আশরাফ আল দীনের 'দুঃশাসনের নিপাত হোক'; নাসির মাহমুদের 'ঝিঁঝিঁপোকা'; রহমান হেনরীর 'বর্ণাংশ'; সেলিম রেজা নিউটনের 'ভয় কেটে যাবে রাস্তায় যদি নামি'; কাজী জহিরুল ইসলামের 'শহিদ আবু সাঈদ'; জাকির আবু জাফরের 'তুমি জাগলে জাগবে বাংলাদেশ'; নয়ন আহমেদের 'মুগ্ধ; একটি ফিনিক্স পাখি'; মুহম্মদ আবদুল বাতেনের '-ড়-ড়-ড়-ড়, মনসুর আজিজের 'লাল সালাম'; আশরাফ হাসানের 'ডেটলাইন জুলাই ও অন্যান্য'; ইমতিয়াজ মাহমুদের 'আশুরার কবিতা'; সৈয়দ সাইফুল্লাহ শিহাবের 'তোমরা জুলুম করো'; সাজ্জাদ বিপ্লবের 'শেষ রক্ষা হবে না তোমার'; জামসেদ ওয়াজেদের 'সর্বশান্ত পদাতিক মাছ'; মাহফুজুর রহমান আখন্দের 'শিল্পময় নতুন স্বপ্ন'; আফসার নিজামের 'বের হয়ে যাও আমার সীমানা থেকে'; মুসা আল হাফিজের 'কার আদেশে'; হাসনাইন ইকবালের 'অভিশাপ দিচ্ছি'; জব্বার আল নাঈমের 'জুলাই, দু'হাজার চব্বিশ'; আলতাফ শাহনেওয়াজের 'রক্তজবা'; পলিয়ার ওয়াহিদের 'গুলি ও গাদ্দার'; তাজ ইসলামের 'স্লোগান', ফজলুল হক তুহিনের 'গণজোয়ার' ইত্যাদি জুলাই কাব্যপ্রবাহে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখে। বাংলা কবিতা ও সাহিত্যের ইতিহাসে জুলাই বিপ্লবের কবিতা একটি নতুন অধ্যায় ও নতুন বাঁক। ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও বাকশালী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এই ধারার কবিতা একটি ঐতিহাসিক মাইলপোস্ট। জুলুম, নিপীড়ন, গুম, খুনসহ যাবতীয় মানবতাবাদী অপরাধ ও অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য এইসব কবিতা জাতীয় সাহিত্য হিসেবে বিবেচনার যোগ্য।

দেড় দশকের দুঃশাসনে ক্ষুব্ধ জনমানসকে ধারণ করে গীতিকবি ও শিল্পীরা কথা ও সুরে প্রকাশ করেন। গণ-অভ্যুত্থানের আগে থেকেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কিছু কিছু গান গণপরিসরে আসন্ন অভ্যুত্থানের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। গীতিকবি ইথুন বাবুর লেখা ও নাজনীন আখতার মৌসুমীর গাওয়া গান তুমুল আলোড়ন তোলে। গণ-আন্দোলনের

কালে শিল্পী হান্নান হোসাইন শিমুল র‍্যাপগানের মাধ্যমে দ্রোহ, ব্যঙ্গ, আক্রমণ ও প্রতিরোধের আগুন জ্বালায় নেট-দুনিয়ায়। র‍্যাপগানের নিজস্ব শৈলীতে কথা ও সুরের চলতি ও কথ্য ভাষার ঢঙ্গে তীব্র ও উচ্চ কণ্ঠে একের পর এক লক্ষ্যভেদী গানের তীর নিক্ষেপ করেন। প্রতিবাদী বাংলা গানগুলোর মধ্যে 'আওয়াজ উডা' সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পায়; তারপর 'কথা ক' গানটিও বেশ আলোচনায় আসে। সমকালীন গণমানুষের মন ও অনুভবকে নাড়া দেওয়ার মতো গানে ও সুরের প্রবাহে শিল্পী শায়ান ও হায়দার সাহসী ও প্রতিবাদী ভূমিকায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন। অন্যদিকে জনপ্রিয় শিল্পী শান সায়েক ছাত্র-জনতার আন্দোলনের শহিদ মুগ্ধ, আবু সাঈদসহ অন্যান্যদের নিয়ে গান তৈরি করেছেন। 'তোমাদের ভুলব না' শিরোনামের গানটি লিখেছেন ও সুর করেছেন মিফতাহ করিম এবং শানের সঙ্গে আরো গেয়েছেন লতা আচার্য্য ও মুত্তাক হাসিব। নোমান আজাদের 'শত্রু আমগো কেডা' ও 'শেখ হাসিনা পালাইসে' গান দুটিও আলোচনায় আসে। এইসবসহ আরো অনেক গানের অগ্রভাগে নজরুলের 'কারার ঐ লৌহ কপাট' গানটি নতুন ব্যঞ্জনায় জনমনে প্রতিরোধের প্রেরণাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক মুক্তির রূপরেখা প্রণয়নে এইসব কবিতা ও গান যেমন মূল্যবান সংযোজন; তেমনি আধিপত্যবাদী শক্তির মদদে পালিত ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের প্রতিষ্ঠিত বয়ান ভেঙে গণমুক্তির নতুন বয়ান নির্মাণে স্লোগানের ভূমিকাও অনন্য। দেওয়াল লিখনে তারুণ্যের যে স্লোগান অঙ্কিত হয়েছে সেখানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মালিকানা নির্ধারণ ও ফ্যাসিবাদকে চ্যালেঞ্জ উপস্থাপিত হয়েছে। একদিকে ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও বাকশালী ফ্যাসিবাদ মোকাবিলা; অন্যদিকে নতুন স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ নির্মাণের রঙ-রেখার প্রতিচ্ছবি দৃশ্যমান হয়েছে সমগ্র দেশে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের নেতৃত্বে পরিচালিত অভ্যুত্থানে বহুল উচ্চারিত কয়েকটি স্লোগান: *'আমার সোনার বাংলায় বৈষম্যের ঠাঁই নাই'; 'জাস্টিস জাস্টিস, উই ওয়ান্ট জাস্টিস'; 'তোর কোটা তুই নে, আমার ভাই ফিরিয়ে দে'; 'লাশের ভিতর জীবন দে, নইলে গদি ছাইড়া দে'; এক দুই তিন চার/ শেখ হাসিনা গদি ছাড়; 'আমার খায়, আমার পরে, আমার বুকেই গুলি করে; লেগেছে রে লেগেছে/ রক্তে আগুন লেগেছে; আমি কে তুমি কে/ রাজাকার রাজাকার; কে বলেছে কে বলেছে/ স্বৈরাচার স্বৈরাচার; রাজা কার?/ জনতার জনতার; আপস না সংগ্রাম/ সংগ্রাম সংগ্রাম; দালালি না রাজপথ/ রাজপথ রাজপথ; ক্ষমতা না জনতা/ জনতা জনতা; চলছে লড়াই চলবে/ চলছে লড়াই চলবে; আবু সাঈদ মুগ্ধ/ শেষ হয়নি যুদ্ধ; আমাদের ধমনীতে শহিদের রক্ত/সেই রক্ত কোনোদিনই /পরাজয় মানে না*। স্লোগানের বজ্রাঘাতে আগ্রাসী-ঘাতক সরকারের ভিত কেঁপে যায় এবং আমজনতা বুকের মাঝে শক্তি ও সাহস ফিরে পায়। এইসব স্লোগানের প্রেরণা ও গণক্ষোভের বিস্ফোরণে ছাত্র-জনতার অভাবনীয় রক্তাক্ত অভ্যুত্থানে দীর্ঘ দেড়

দশকের ফ্যাসিবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তির কবল থেকে বাংলাদেশ সার্বত্রিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন প্রকাশিত।

নতুন স্বপ্ন, সম্ভাবনা, সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক রূপান্তর, প্রতিবাদ-দ্রোহ-স্বাধীনতা, ব্যঙ্গ ও উদ্দীপনার প্রতিনিধিত্বশীল গ্রাফিতি, দেওয়ালচিত্র ও ক্যালিগ্রাফির রঙ-রেখা-রূপের প্রতিচ্ছবি বাংলাদেশময় ছেয়ে যায়। গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ও স্পিরিট ধারণ করে বিদ্যমান ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থাকে ভেঙে নয়া জন-অভিপ্রায় এইসব শিল্পভাষ্যে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। *বল বীর/চির উন্নত মম শির; ভয়ের দেয়াল ভাঙলো এবার/ জোয়ার এলো ছাত্র জনতার; আমরা নয় তো একজন/ আমরা কয়েকজন; রক্ত গরম/ মাথা ঠান্ডা; হীরক রাণির দেশে; স্বাধীনতা এনেছি যখন/ সংস্কার করি; সুবোধ সকাল হয়ে গেছে; বুকের ভেতর অনেক ঝড়/ বুক পেতেছি গুলি কর; আমরা ইন্টারনেট বন্ধ করিনি; বন্ধ হয়ে গেছে; বাংলাদেশ ২.০*। চিত্র ও চিত্রকল্প, রঙ ও রেখা, রূপ ও দৃশ্যকল্প মিলিয়ে যে পেন্টিং তা দেশের গ্রাফিতি ও দেওয়ালচিত্রে নতুন এক বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। ফ্যাসিবাদ থেকে মুক্তি, আধিপত্যবাদ থেকে স্বাধীনতা, শৃঙ্খল থেকে জাগরণ, খুন-গুম থেকে নিরাপত্তা, দুর্নীতি-পাচার থেকে দেশপ্রেম, হতাশা থেকে স্বপ্ন, বন্ধ্যাত্ব থেকে সম্ভাবনার রূপান্তরের ভাষা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে গ্রাফিতি ও দেওয়াল লিখনে। অন্যদিকে মুসলিম সংস্কৃতির অংশ হিসেবে ক্যালিগ্রাফি নতুন আলোয় উদ্ভাসিত ও বর্ণিলরূপে হাজির হয়েছে। এ এক নতুন স্বপ্ন ও সম্ভাবনার রঙিন বাংলাদেশ।

গণ-অভ্যুত্থানের সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক প্রভাব কথাসাহিত্যেও পড়েছে। প্রথমত, দেড় দশকের দুঃশাসনের পর্ব; দ্বিতীয়ত, জুলাই অভ্যুত্থান পর্ব। ফ্যাসিবাদের দীর্ঘদিনের বিচিত্র আখ্যান এবং চরিত্রাবলি গল্প ও উপন্যাসে শিল্পরূপ পেয়েছে। আহমেদ মাওলার উপন্যাস 'আবু সাঈদ যখন শহিদ হয়েছিল' এক্ষেত্রে স্মরণীয়। কথাশিল্পী তাশরিক-ই-হাবিবের '৩৬ জুলাই ২০২৪' ও মঈন শেখের 'জুলাইয়ের অশেষ পাখিরা' গল্পগ্রন্থ অন্যতম। গল্প হিসেবে দীপু মাহমুদের 'ঝলমলে রোদ্দুরে বিড়ালটি', হামিদ রায়হানের 'মুগ্ধর মৃত্যুর শেষ কয়েটি মুহূর্ত', আসাদুল্লাহ মামুনের 'শেকল ভাঙার শব্দ', মনির বেলালের 'ব্যারিকেড' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এইসব গল্পে গণ-আন্দোলনের আখ্যান, ভাষা, সংলাপ ও কুশীলব বাস্তবতার বারুদ ও রক্তে ভেজা অক্ষরে লিপিবদ্ধ করেন।

চিত্রকলা, ফটোগ্রাফি, নাটক, আবৃত্তিসহ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার প্রতিটি অঙ্গন বর্তমানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের স্পিরিট ও আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর ও তৎপর হচ্ছে। পুরাতন জঞ্জাল অপসারণ করে নয়া স্বপ্নের বাংলাদেশ নির্মাণের সৃজন ও মনন ধারার গতি ও বিস্তৃতির ওপর নির্ভর করছে আজ জনতার ভবিষ্যৎ। এই ধারার সফলতা মানেই আধিপত্যবাদ ও ফ্যাসিবাদমুক্ত গণবিপ্লবের পথে একধাপ এগিয়ে যাওয়া।

ড. ফজলুল হক তুহিন, কবি, গবেষক ও সম্পাদক, নতুন এক যাত্রা, ঢাকা

জুলাই বিপ্লবে গ্রাফিতিঃ প্রতিবাদ দেশপ্রেম সম্প্রীতি সাম্যের বার্তা

গোলাম সারওয়ার

বাংলাদেশের চব্বিশের 'জুলাই বিপ্লব' বিশ্বের এক নজিরবিহীন বিপ্লব। বহুবর্ণিল এক অগ্নিঝরা গণঅভ্যুত্থান। বিশ্বের যত বড় বড় বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, ছাত্র-জনতার জুলাই বিপ্লবের প্রেক্ষাপট ছিল অনেকটা ভিন্নতর। মৌলিকতার দিক থেকে এবং এর প্রকৃতির দিক থেকেও ছিল আলাদা। যেখানে ছিল না কোনো রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, ছিল না কোনো নির্দিষ্ট মতাদর্শের প্রভাব। যেখানে ছিল শিশু-নারী, অভিভাবকসহ প্রতিটি শ্রেণিপেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে কোটা আন্দোলন থেকে শুরু হয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এরপর একসময় তা রূপ নেয় ফ্যাসিবাদী হাসিনা সরকার উৎখাতের ছাত্র-জনতার মহাবিপ্লব। এ দেশের ছাত্রসমাজ জন্ম দেয় নতুন এক রেনেসাঁর। এসব কারণে আমাদের জাতীয় জীবনে জুলাই বিপ্লবের মূল্য অপরিসীম। এই বিরোচিত বিপ্লবে ঘৃতাহুতির মতো কাজ করেছে অভূতপূর্ব 'গ্রাফিতি'। বেগবান করেছে এই বিপ্লবকে। দক্ষ ও অদক্ষ আর্টিস্টরা নগর, মহানগর, গ্রামগঞ্জের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ রাস্তাসংলগ্ন প্রায় প্রতিটি দেওয়ালে দেওয়ালে লাখ লাখ গ্রাফিতি এঁকে নিজেদের মনের দুঃখ, কষ্ট, ক্ষোভ, আশার কথা তুলে ধরেন। মূলত এই বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিল ছাত্রসমাজ। কোনো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে হয়নি এই বিপ্লব। এটি ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, জেন-জির আন্দোলন। ৩৬ দিনের ধারাবাহিক কর্মসূচির এক পর্যায়ে ২৯ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে প্রথম সারাদেশে গ্রাফিতি কর্মসূচি দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়। তারা একযোগে সারাদেশের আনাচে-কানাচে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শুরু করে গ্রাফিতি কর্মযজ্ঞ। এক রঙিন রূপে রূপায়িত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। নান্দনিকতায় ভরে ওঠে সারাদেশের দেওয়ালগুলো। রং তুলির আঁচড়ে ফুটে ওঠে বিপ্লবের রং। জরাজীর্ণ অগোছালো দেওয়ালগুলো নতুন করে সাজানো হয়। তারুণ্যের রঙে রাঙিয়ে ওঠে অপরিচ্ছন্ন দেওয়ালগুলো। বাংলা, ইংরেজি ও আরবি ক্যালিগ্রাফিতিতে ফুটে উঠে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের জুলুম অত্যাচার, বৈষম্য, ক্ষোভ, প্রতিরোধের জ্বলন্ত গোলা। অপরদিকে ফুটে ওঠে দেশপ্রেম, রাষ্ট্রসংস্কার, সাম্য, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধের অনির্বচনীয় নানা কথা। তরুণদের মনের আকুতি, দ্রোহ, রাষ্ট্রকল্পের পরিষ্কার রূপরেখা গ্রাফিতির মধ্যে ফুটে ওঠে। দেশবাসীও অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করে, মেধা-মননে সৃজনশীল এই গ্রাফিতিতে তাদেরও মনের কথা উঠে এসেছে। প্রবল ছাপ ফেলে জনগণের মনে। মুগ্ধতায় ভরে ওঠে তাদের হৃদয়। ছোট ছোট ভাবগাম্ভীর্যে ভরা কী তেজোদ্দীপ্ত ভাষা, কী চরম বিদ্রোহী কথা। স্বপ্নের আগুন দিয়ে বিপ্লবী অক্ষরে অঙ্কিত এসব গ্রাফিতি সবার হৃদয়ে গেঁথে যায়। ছাত্র-জনতার মনের ভাষা মিলেমিশে একাকার হয়ে প্রতিবাদের

স্ফুলিঙ্গ তৈরি হয়। আন্দোলনরত মানুষ আরো উদ্দীপ্ত হয়, সাহস পায়, শক্তি পায়। বেগবান হয়ে ওঠে আন্দোলন, সংগ্রাম। ফ্যাসিস্ট সরকারের অন্যায়-অত্যাচার, নীপিড়নের বিরুদ্ধে বিরোচিত গ্রাফিতি হয়ে ওঠে এক সৃষ্টিশীল প্রতিবাদের ভাষা। গণঅনাস্থার প্রতীক হয়ে ওঠে এইসব গ্রাফিতি। রাজশাহীসহ সারাদেশের দেওয়ালে দেওয়ালে গ্রাফিতির বক্তব্যের মধ্যে রাজনীতি, সামাজিক বৈষম্য, সামাজিক বন্ধন, গান ও কবিতা, স্বাধীনতা ও দেশপ্রেম, নৈতিকতা ও ধর্মের ভাষা ফুটে ওঠে। গ্রাফিতির এসব বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে, বুকের ভিতর দারুণ ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর। অপরাজনীতি রুখে দাও। তুমি কে আমি কে, বিকল্প বিকল্প। বায়ান্ন দেখিনি, চব্বিশ দেখেছি। এখন দরকার, জনতার সরকার। দেশটা কারো বাপের না। চলো রাষ্ট্র সংস্কার করি। তুমি কে আমি কে, রাজাকার রাজাকার, কে বলেছে কে বলেছে, স্বৈরাচার স্বৈরাচার। চেয়েছি অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার। স্বাধীনতার সূর্যোদয়, ৩৬শে জুলাই। আমিই বাংলাদেশ। দেশ গড়ব করেছি পণ, ক্ষমতায় আজ জনগণ। লাখো শহিদের রক্তে কেনা, দেশটা কারো বাপের না। স্বাধীনতা এনেছি, স্বাধীকার আনব, স্বাধীনতা এনেছি, সংস্কারও আনব। ২৪-এর গল্প আমি নই, আমরা। সমতল থেকে পাহাড়, এবারের মুক্তি সবার। ছাত্র রাজনীতি নিপাত যাক, শিক্ষাঙ্গন মুক্তি পাক। স্বাধীন বিচার বিভাগ চাই। দেশের কোনো ধর্ম নেই, দেশের কোনো বর্ণ নেই। ধর্ম যার যার, দেশ সবার। ঘুস চাইলে ঘুসি। শিক্ষক রাজনীতি নিপাত যাক। হাল ছেড় না বন্ধু। শোন মহাজন, আমরা তো অনেকজন। হারতে নয়, জিততে এসেছি। এসেছে ফাগুন, আমরা হয়েছি শতগুণ হত্যাদি। প্রতিবাদের অন্যতম অনুষঙ্গ হয়ে সংযুক্ত হয়েছিল এসব গ্রাফিতি। গণজাগরণের এসব ভাবগম্ভীর গ্রাফিতির তাৎপর্য অপরিসীম। ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠে জুলাই বিপ্লবের এসব গ্রাফিতি। অবিশ্বাস্য রকমের সাক্ষী হয়ে ওঠে জুলাই বিপ্লবের গ্রাফিতি। ইতোমধ্যে বিনামূল্যের পাঠ্য বইয়ে যুক্ত হয়েছে জুলাই বিপ্লবের গ্রাফিতি। অনেকে এহসব গ্রাফিতি নিয়ে প্রদর্শনী করেছে, করছে। অনেকে বই লিখছেন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম জুলাই বিপ্লবের এইসব গ্রাফিতি সকলকে দেশগঠনে অনুপ্রেরণা জোগাবে। জাতির অস্তিত্বকে বহন করবে। হাসিনার স্বৈরতন্ত্রের ঐতিহাসিক পতন মানুষ ঘৃণাভরে স্মরণ করবে।

গ্রাফিতি বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি, দেওয়াল বা রাস্তায় আঁকা কোনো ছবি বা লেখা, যা সংক্ষিপ্ত আকারে। সহজ ভাষায় যা মানুষের মনকে আন্দোলিত করে, মনোযোগ আকর্ষণ করে, চেতনা কিংবা জাগরণের এক আবহ সৃষ্টি হয়। ছবি কিংবা ভাষার ভাবটা খুব গভীর-এটাই গ্রাফিতি। যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত গ্রাফিতি শিল্পী ব্যাঙ্কসি একসময় বলেছিলেন, "আপনার কাছে যদি লড়াইয়ের কোনো হাতিয়ারই না থাকে, তবে গ্রাফিতি হয়ে উঠতে পারে একমাত্র অস্ত্র"। গ্রাফিতির ইতিহাস অনেক পুরনো। প্রাচীন গ্রিস ও রোমান সাম্রাজ্যের সময় থেকে মূলত এই গ্রাফিতির প্রচলন ভালো করে শুরু হয়। আধুনিক গ্রাফিতির প্রচলন শুরু হয় ষাটের দশকের শুরুর দিকে, যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া থেকে। ডেরিল ম্যাকরে বা কর্নব্রেডকে বলা হয় আধুনিক গ্রাফিতির

জনক। সেই সূত্র ধরে সত্তরের দশকে নিউইয়র্কে বাড়ির দেওয়াল, ট্রেন, বাসের গায়ে বিভিন্ন দলের নাম লিখে জনতার মনোযোগ আকর্ষণ করতে শুরু করেন গ্রাফিতিশিল্পীরা।

বাংলাদেশে গ্রাফিতির প্রচলন খুব একটা বেশি দিনের কথা নয়। নব্বই দশকের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে দেখা যায় দেওয়াল লিখনে ছোট্ট একটি বাক্য "কষ্টে আছি আইজুদ্দিন "-যা মানুষের মনকে আন্দোলিত করে। পরের দশকে 'অপেক্ষায় নাজির' শিরোনামে আরেকটি দেওয়াল লিখন পথিকদের নজর কেড়েছিল। এরপর ২০১৭ সালের দিকে হঠাৎ করে ঢাকার কয়েকটি দেওয়ালে 'সুবোধ' নামের গ্রাফিতি সকলের নজরে আসে। সাধারণ মানুষ প্রথম দিকে এগুলোকে দেওয়াল লিখন বলেই জানতো। পরে পেপারে লেখালেখির পর মানুষ বুঝতে পারে, এ ধরনের দেওয়াল লিখনই আসলে গ্রাফিতি। এ গ্রাফিতিতে দেখা যায়, রাতের আঁধারে গোপনে কেউ একজন বড় বড় উস্কখুস্ক চুল দাড়ি, কোনো কোনোটায় কালো ছেঁড়া পোশাক মলিন এক যুবক, হাতে একটি খাঁচায় বন্দি সূর্য এঁকে মানুষকে গভীরভাবে ভাবনার জগতে নিয়ে যেত। গ্রাফিতিতে ছোট্ট একটি বা দুটি করে কথা 'সুবোধ তুই পালিয়ে যা, এখন সময় পক্ষে না। 'সুবোধ তুই পালিয়ে যা, মানুষ ভালোবাসতে ভুলে গেছে; 'সুবোধ তুই পালিয়ে যা, তোর ভাগ্যে কিছু নেই' কিংবা 'সুবোধ এখন জেলে, পাপবোধ নিশ্চিন্তে বাস করছে মানুষের মনে 'সুবোধ' কবে হবে ভোর, 'সুবোধ, তুই ঘুরে দাঁড়া'- এসবই একেকটি গ্রাফিতি। প্রতিটি গ্রাফিতির নিচে ইংরেজিতে ক্যাপিটাল লেটারে আঁকিয়ের নাম দেওয়া হয়েছে HOBE? যেটি স্পষ্টতই ছদ্মনাম। সেই থেকে গ্রাফিতি সবার কাছে জনপ্রিয় হতে শুরু করে। গ্রাফিতি দেখে মনে হয়, এখানে কোনো গ্রামার প্রয়োজন হয় না। গ্রাফিতি যারা করে, সবসময় তারা গোপন থাকে। বহুকাল ধরে বিদ্রোহের এক শক্তিশালী মাধ্যমে পরিণত হয়েছে গ্রাফিতি।

জুলাই বিপ্লবের নেতৃত্বদানকারী বিপ্লবী তরুণ ছাত্রসমাজসহ গণতন্ত্রকামী মানুষের হাতে তৈরি এসব গ্রাফিতি বলে দিচ্ছে নতুন প্রজন্মের অদম্য চেতনার কথা। আগামী বাংলাদেশ তারা কেমন দেখতে চায়, তা তারা তাদের গ্রাফিতির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তারা এমন একটি বাংলাদেশ কামনা করেন, যেখানে সব নাগরিক সমান অধিকার ও মর্যাদার সঙ্গে বাঁচবে। তারা গণতন্ত্র, সুশাসন, ন্যায়বিচার আর দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চান। তারা চান বাংলাদেশ হবে তারুণ্যের দক্ষতানির্ভর-যেখানে তরুণরা তাদের মেধা ও দক্ষতা দিয়ে রাষ্ট্রকে নিয়ে যাবে এক অনন্য উচ্চতায়। জুলাই বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করছে কালজয়ী এসব গ্রাফিতির অদম্য আবেগ এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর উপর। বর্তমান সরকারের উচিত হবে, সারা বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে দেওয়ালে দেওয়ালে যেসব গ্রাফিতি রয়েছে, সেগুলো সংরক্ষণ করা, যা ভবিষ্যত প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।

গোলাম সারওয়ার, উপ-রেজিস্ট্রার (অব.), একাডেমিক শাখা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই বিপ্লব

তাছনিমা আক্তার হীরা

রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষায়,

যে যাবে না সে থাকুক, চলো, আমরা এগিয়ে যাই।
যে-সত্য জেনেছি পুড়ে, রক্ত দিয়ে যে মন্ত্র শিখেছি,
আজ সেই মন্ত্রের সপক্ষে নেবো দ্রীপ্র হাতিয়ার।
স্লোগানে কাঁপুক বিশ্ব, চলো, আমরা এগিয়ে যাই।

বিপ্লব সমাজে এক ধরনের গভীর এবং আকস্মিক পরিবর্তনের ফল। এটি সাধারণত রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণমানুষের অসন্তোষের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' সমাজের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের সংগঠিত আন্দোলন, যা 'জুলাই বিপ্লব' নামে আখ্যায়িত। বিশ্বজুড়ে শিক্ষার্থীরা বরাবরই সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবিতে নেতৃত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশে জুলাই ও আগস্ট মাসে সংঘটিত 'জুলাই বিপ্লব' অথবা 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জুলাই বিপ্লবের উৎপত্তি ও পটভূমি

২০১৮ সালে সরকারি চাকুরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনের শুরু হয়। এ আন্দোলনের মূল দাবি ছিল - ৫৫ শতাংশ কোটা বাতিলের। পরবর্তীকালে সরকার কোটা বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছিল। কিন্তু ২০২১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান কর্তৃক এ রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করা হয়।

২০২৪ সালের ৫ জুন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকারের জারি করা কোটা বাতিলের পরিপত্রকে অবৈধ ঘোষণার পর কোটা সংস্কার আন্দোলন নতুন করে সূচনা হয়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ ছিল- সরকার বিচার বিভাগের উপর অযাচিত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কোটা পুনর্বহালের নীলনকশা বাস্তবায়ন করেছেন।

এই আন্দোলন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার দমন-পীড়ন শুরু করলে এটি অসহযোগ আন্দোলনে রূপ নেয়। এই আন্দোলনের অর্থাৎ গণঅভ্যুত্থানের মুখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের দিল্লিতে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। ফলে বাংলাদেশ সাংবিধানিক সংকটে পড়েন। তারই কিছুদিন পর বাংলাদেশের নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়।

কোটা আন্দোলন যেভাবে রূপ নিলো সরকার পতন আন্দোলনে

২০২৪ সালে কোটা সংস্কার আন্দোলন কিছুদিন চলার পর সরকারের কঠোর পদক্ষেপ ও অগ্রহণযোগ্য আচরণের কারণে সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়। সরকার প্রথমে আন্দোলনকারীদের দমন করতে নানা কৌশল প্রয়োগ করে। শিক্ষার্থীদের উপর নির্যাতন, আটক, ছাত্রলীগ ও পুলিশের আক্রমণ আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তোলে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আন্দোলনের দৃশ্য ভাইরাল হওয়ার পর আন্দোলন দ্রুত গতিশীল হয় এবং দেশব্যাপী সমর্থন লাভ করে।

প্রথমদিকে কোটা সংস্কার আন্দোলন কেবল সভা-সমাবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বক্তব্যে কোটা আন্দোলনকারীদের 'রাজাকারের নাতি-পুতি' হিসেবে অভিহিত করেন। প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা সেদিন রাতেই তীব্র প্রতিবাদ জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ধ্বনিত হতে থাকে কিছু স্লোগান-

'তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার;
কে বলেছে? কে বলেছে? স্বৈরাচার, স্বৈরাচার।'

এবং

'চেয়েছিলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার।'

এছাড়াও

'লাখো শহিদের রক্তে কেনা দেশটা কারো বাপের না'

পরদিন ১৫ জুলাই আওয়ামী লীগ ও সরকারের বিভিন্ন কর্মকতা, মন্ত্রী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' নষ্ট করার অভিযোগ আনেন। এই দিনেই আবার দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। সেই সাথে পুলিশও আন্দোলনে লাঠিচার্জ করে এবং রাবার বুলেট ছুঁড়তে থাকে। এসব হামলায় ১৬ জুলাই থেকে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়।

১৬ জুলাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে নিহত হলে আন্দোলন অতি দ্রুত পুরো দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।

ফ্যাসিবাদী সরকার কর্তৃক গণহত্যা

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়ে সরকার পুলিশ এবং ছাত্রলীগ বাহিনী দিয়ে ছাত্র জনতার উপর গণহত্যা শুরু করে। এসময় ছাত্র থেকে শুরু করে সাধারণ পথচারী কেউ

হত্যাকাণ্ড থেকে রেহাই পায়নি। এমনকি শিশুরাও পুলিশের গুলিতে নির্মমভাবে প্রাণ হারায়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের স্বাস্থ্যবিষয়ক উপ-কমিটি এবং জাতীয় নাগরিক কমিটির বিবৃতি মতে, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে এখন পর্যন্ত ১৫৮১ জন নিহত হয়েছে। আন্দোলনে ১২৭ শিশু প্রাণ হারায়, যা মোট মৃত্যুর ১৭ শতাংশ। শহিদ আবু সাঈদ ও মীর মুগ্ধ নামে দুই আন্দোলনকারী নির্মম মৃত্যু বিবেককে নাড়িয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে, 'দফা এক দাবি এক, শেখ হাসিনার পদত্যাগ' এবং 'স্টেপ ডাউন হাসিনা'সহ বিভিন্ন স্লোগানে রাজপথ কম্পিত হয়ে ওঠে।

এই আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপামর জনতা অংশগ্রহণ করা ও ব্যাপক গণহত্যার মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন নিশ্চিত হওয়ায় একে বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলেও অভিহিত করা হয়।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সমন্বয়কসহ সর্বস্তরের জনগণের ভূমিকা

কোটা আন্দোলনের সমন্বয়করা আন্দোলনকে সংগঠিত করতে এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আন্দোলনের সামগ্রিক কাঠামোতে নেতৃত্ব এবং সুষ্ঠু সংহতির উপস্থিতি আন্দোলনকারীদের মধ্যে মজবুত বন্ধন সৃষ্টি করে। বিভিন্ন পর্যায়ের সমন্বয়করা একযোগে কাজ করে আন্দোলনকে সুসংগঠিত ও কার্যকর করার পাশাপাশি তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা এবং কৌশল নির্ধারণে সহায়তা করেন। আন্দোলন দমন করতে এক পর্যায়ে সরকার গোপনে সমন্বয়কদের গ্রেফতার করে। যার ফলে আন্দোলন আরও বেশি বেগবান হয়।

সমন্বয়কদের মধ্যে অন্যতম হলেন- নাহিদ ইসলাম, সারজিস আলম, হাসানাত আব্দুল্লাহ, আসিফ মাহমুদ, মো. মাহিন সরকার ও আব্দুল কাদের। এদের মধ্যে সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম ও আসিফ মাহমুদ এই দুইজন ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে একাধিক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন।

ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো থেকে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ সময় কৃষক, মজুর-শ্রমিক, শিক্ষক, আইনজীবীসহ দেশের সর্বস্তরের মানুষ আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। যারই ফলপ্রসূতে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। লাখো মানুষ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন 'গণভবন'-এর দিকে যাত্রা করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার পদত্যাগপত্র রাষ্ট্রপতির নিকট জমা দিয়ে সেনাবাহিনীর সহায়তায় হেলিকপ্টারযোগে ভারতের দিল্লিতে পালিয়ে যান। যার ফলে প্রধানমন্ত্রীবিহীন চলমান সংসদ ভেঙ্গে যায়। একইসাথে, আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃবৃন্দ গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়।

জুলাই বিপ্লবের শহিদদের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের যারা শহিদ হয়েছেন, তাদের আত্মত্যাগ বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে। তাদের পরিচিতি এবং জীবন কাহিনি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা। তাঁদের মধ্যে রয়েছে সাধারণ শিক্ষার্থী, যাদের জীবন বিসর্জনের মধ্যে রয়েছে গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার। শহিদদের স্মরণে এই বিপ্লব একটি চিরন্তন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

০১. **আবু সাঈদ (২২) :** বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী এবং তার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটা আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক।

০২. **মো. ফারুক :** আসবাবের দোকানের কর্মচারী।

০৩. **ওয়াসিম আকরাম :** চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র ও কলেজ শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক।

০৪. **ফয়সাল আহমেদ শান্ত (২৪) :** অনার্সের শিক্ষার্থী।

০৫. **মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ :** বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এর শিক্ষার্থী।

০৬. **তাহির জামান প্রিয় :** সাংবাদিক।

এছাড়া আরও অনেক পেশাজীবী, শিক্ষার্থী ও দিনমজুরের প্রাণের বিনিময়ে স্বৈরাচারের পতন সম্ভব হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন এবং আমাদের নতুন গৌরবগাঁথার জুলাই বিপ্লবের গুরুত্ব

শেখ হাসিনা পদত্যাগের পর বাংলাদেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়। এই সরকার দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। ৮ আগস্ট শপথ গ্রহণর মাধ্যমে মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে সরকার গঠন করা হয়। রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ৬ আগস্ট সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণার পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন বলে ঘোষণা দেন।

বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জুলাই গণঅভ্যুত্থান এক নতুন সংযোজন। এই গণঅভ্যুত্থান ১৯৬৯ বা ১৯৯০ থেকে পৃথক। এটি কোনো রাজনৈতিক দল কর্তৃক সংঘটিত হয়নি। ছাত্রজনতা তাদের শিক্ষাজীবন শেষে নায্যতার ভিত্তিতে কর্মজীবনের প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা নিরসনের জন্য কোটা ব্যবস্থার সংস্কার

চেয়েছিল। এই গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের সকল মানুষের জন্য আবারও একটি সুন্দর দেশ নির্মাণের সুযোগ এনে দিয়েছে। তা আমাদের রক্ষা করতে হবে।

এজন্যই ধ্বনিত হয়-

"বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে এই জনতা, এই জনতা।
তোমার গুলির, তোমার ফাঁসির,
তোমার কারাগারের পেষণ শুধবে তারা
এই জনতা, এই জনতা।"

উপসংহার : সিকান্দার আবু জাফরের কণ্ঠনিশ্রিত লাইন-

"আমি সেই জগতে হারিয়ে যেতে চাই,
যেথায় গভীর-নিশুত রাতে
জীর্ণ বেড়ার ঘরে
নির্ভাবনায় মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে ভাই।"

বাংলাদেশ একটি সুন্দর-সৌহার্দপূর্ণ দেশ হলেও স্বৈরাচার বাসা বেঁধে শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকার আয়েশ হারিয়ে গিয়েছিল। ২০২৪-এর জুলাই বিপ্লব বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এ বিপ্লব দেশের রাজনেতিক ব্যবস্থার ত্রুটি উন্মোচন করেছে এবং তরুণ প্রজন্মের সচেতনতা ও অংশগ্রহণে গণতান্ত্রিক কাঠামোর পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে। জনগণের অধিকার রক্ষায় এই বিপ্লব একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। বাংলার এ স্বাধীনতা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। দেশের উন্নয়ন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের সকলকেই একত্রে অগ্রসর হতে হবে।

তাছনিমা আক্তার হীরা, পপুলেশন সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ; তাপসী রাবেয়া হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তাল ২৯ জুলাই

মেহেদী সজীব

সকাল থেকে আকাশটা থমথমে। রাজশাহীর চারপাশ এখন ভূতুড়ে নগরীর মতো লাগে। দিনে দুপুরেও মানুষের আনাগোনা চোখে পড়ে না। এরই মাঝে চলছে কারফিউ। মাঝে মাঝে শিথিল হচ্ছে। আজ দিনের বেলা কারফিউ শিথিল করা হয়েছে। আমাদের ৬ সমন্বয়ককে ডিবি অফিসে তুলে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা হয়। পরবর্তীকালে আন্দোলন থেকে সরে আসার জন্য তাদের মাধ্যমে একটি জোরপূর্বক ভিডিয়ো বার্তা দেওয়া হয়েছে। যা সারাদেশের সমন্বয়করাসহ ছাত্র-জনতা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। সেকেন্ড লেয়ারের নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দিয়েছে আন্দোলন দুর্বার গতিতে চলবে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে রাজশাহীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ দিয়ে সর্বশেষ ফেজে জোরালো আন্দোলন শুরু হয়।

গতকাল রাতের ঘোষণা অনুযায়ী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মেন গেটে আমাদের বিক্ষোভ সমাবেশ সকাল সাড়ে ১১টায়। আমি আর ফাহিম ছিলাম মণ্ডলের মোড়ের একটি বাসায়। প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার আধঘণ্টা আগেও পুলিশ মাইক নিয়ে ঘোষণা করে, সম্মানিত এলাকাবাসী, এখনো কারফিউ চলমান আছে। কারফিউ ভেঙে কেউ কোনো ধরনের সভা সমাবেশ করলে তার বিরুদ্ধে কারফিউ ভঙ্গের আইনে বিচার করা হবে। মণ্ডলের মোড়ের আশেপাশে বেশ কয়েকটা মেসে যে ছাত্ররা ছিল তারা এ মাইকিং করার পর বিচলিত না হয়ে উপায় নেই। মনে মনে তাই ভাবছিলাম আজ কেউই তেমন আসবে না। এই মুহূর্তে আন্দোলনে যাওয়া মানে হচ্ছে বুলেটের সামনে বুক পেতে দেওয়া। আন্দোলনের পুরো সময়টায় এই প্রথম মৃত্যু ভয় অনুভূত হওয়া শুরু করে। মনে মনে প্রশ্ন জাগছিল, তাহলে সত্যি কি শহিদ হচ্ছি আজকে? গুলিটা ঠিক কোথায় লাগবে? বুকে আর মাথায় লাগলে তো বাঁচব না। হাতে, পায়ে লাগলে বাঁচার সম্ভাবনা আছে। ইত্যাদি নানানরকম অদ্ভুত প্রশ্ন মাথার ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছিল। কোনো হিসেব মিলাতে পারছিলাম না।

ঘড়িতে সকাল দশটা বেজে কয়েক মিনিট হলো সম্ভবত। বাড়ি থেকে আম্মু কল দিলো। ভিডিও কল দিলাম। অনেকদিন নাকি আম্মু আমাকে দেখে না। নিজে থেকেই ভিডিও কল দিতাম না। সেসময় এমন অবস্থা হয়েছিল যে নিজেই নিজেকে চিনতে পারছিলাম না। তাই শুধু শুধু কল দিয়ে ওনাদের চিন্তা বাড়াতে চাইনি। কল দিয়েই আম্মু কান্না জুড়ে দিলো। যথারীতি সাবধানে থাকতে বলল। আল্লাহর কাছে আমানত করে দিলো। ওনার কাছে আমানত রাখলে নাকি কেউই খেয়ানত করতে পারে না। আম্মুকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমার নাই। তবুও নম্রস্বরে বললাম, যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার আগে এমন করলে কীভাবে হবে বলেন? আবু সাঈদ ভাই যখন এভাবে বুক পেতে দিতে পেরেছে, তাহলে

আমরা কেন পারব না? সারাদেশে স্বৈরাচারী হাসিনা সরকার গণহত্যা চালিয়েছে। আর বসে থাকার সুযোগ নাই। আমার জন্য দোয়া করো। আর হাসিমুখে বিদায় দাও। আম্মুর কাছে প্রশ্নগুলোর উত্তর ছিল না। শুধু বলল পুলিশ এমনিতেই গুলি করলে করুক। তবে আবু সাঈদের মতো এভাবে বুক পেতে দিস না। আল্লাহর হাওলা, আল্লাহর কাছে আমানত। এই বলে ফোন রাখলাম।

আম্মুর সাথে কথা বলে নিজের ভিতর অনেকটা শক্তি পেলাম। আজই হয়তো শেষ দিন এমনটা প্রায় ভেবে নিয়েই আন্দোলনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে আন্দোলন যেন স্তিমিত না হয় সেজন্য একটি পোস্ট লিখলাম ফেসবুক ওয়ালে। তারই খণ্ডিতাংশ, আমি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে চাই, আজকের পর যদি আপনাদের সামনে আর কথা বলার সুযোগ না পাই, তবুও আপনারা আন্দোলন থেকে পিছু হটবেন না। সারাদেশের সাথে সমন্বয় করে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। আমাদের একজন গ্রেফতার হলে অন্যজন আন্দোলনের হাল ধরবেন। একজন শহিদ হলে অপরজন বুলেটের সামনে বুক পেতে দেবেন। তবুও কেউ আমাদের শহিদ ও আহত ভাই-বোনদের রক্তের অমর্যাদা করবেন না। আমরাও দেখতে চাই তারা ঠিক কতজনকে গ্রেফতার করতে পারে। ঠিক কতজনকে শহিদ করতে পারে!

বেরিয়ে পড়লাম আমি আর ফাহিম। সমন্বয়কদের মধ্যে আমাদের দুজন ছাড়াও রাজশাহীতে আছে আকিল, সালাহউদ্দিন আর আতাউল্লাহ। বিনোদপুর থেকে রিকশা নিয়ে মেন গেটে পৌঁছে দেখি আমাদের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ, বিজিবি। দেখে মনে হলো তাদের সবার পূর্ণ প্রস্তুতি ছিল। বলা বাহুল্য আমাদের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মিছিল যাওয়ার কথা ছিল মেন গেট থেকে কাজলা। তবে আমরা ইন্সট্যান্ট সিদ্ধান্তে মিছিল কাজলায় না নিয়ে বিনোদপুর নিয়ে আসি। কাজলা পুলিশ ফাঁড়িকেন্দ্রিক যৌথবাহিনীর ভালোই তৎপরতা ছিল বলে ইনফরমেশন পেয়েছি।

পুলিশ, বিজিবির তুলনায় আমরা নিতান্তই কম। চাইলে সবাইকেই গ্রেপ্তার করতে পারবে। তখনই দেখি আমাদের মাঝে ড. সালেহ্ হাসান নকীব, ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ, ড. মো. জামিরুল ইসলামসহ কয়েকজন স্যার এসে উপস্থিত হয়েছেন। স্লোগান তোলার সাহস পেয়েছি। হ্যান্ড মাইক হাতে নিয়ে আমাদের নয় দফা ক্লিয়ারলি পাঠ করলাম। স্যারদের বক্তব্যের পর বিনোদপুর অভিমুখে শুরু হলো আমাদের মিছিল। বিসমিল্লাহ টাওয়ারের কাছে এসে 'শেইম শেইম, ডিক্টেটর' স্লোগানে মুখরিত হয় পুরো বিনোদপুর।

প্রোগ্রাম শেষ করে আমি আর ফাহিম রওনা দিই কোর্ট স্টেশনের উদ্দেশ্য। সকালে ওখানে রাজন ভাই গিয়ে একটা পরিত্যক্ত বাসা ঠিকঠাক করে রেখেছে। আমরা ফিরতি পথে না গিয়ে কাটাখালী হরিয়ান হয়ে আমচত্বর দিয়ে কোর্ট স্টেশন গিয়ে পৌঁছাই।

রাজন ভাই এসে আমাদের রিসিভ করে নিয়ে যায়। একটু পর দুপুরে খাওয়ার জন্য বের হই। এর আগে গত প্রায় দুই সপ্তাহ কোথাও এভাবে বের হইনি। আশেপাশের পরিবেশ স্বাভাবিকই মনে হলো। আবারো রুমে ফিরে আসলাম।

ঘড়িতে রাত সাড়ে ৯টা। রাতের খাবারসহ টুকটাক জিনিসপত্র কিনতে আমি, ফাহিম ও রাজন ভাই আবারও বের হলাম। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে একদিনে দুইবার বের হওয়ার সুযোগ পাবো তা কখনো ভাবি নাই। এসে বিভিন্ন জিনিসপত্র কিনে দেখি কোর্ট স্টেশন সংলগ্ন রেলগেটে একটা পুলিশের টহল গাড়ি। রাজন ভাইকে বললাম, পুলিশ আছে। ভাই বলল ওরা টহল পুলিশ। চিন্তা করো না, কিছু হবে না। আশেপাশের পরিবেশটা আবারো থমথমে হতে শুরু করে। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে আসছে। রাতে কালাই রুটি খাওয়ার জন্য রাজন ভাই খুব করে বলল। এদিকটায় না পেয়ে একটা রিকশা নিয়ে কোর্টের ওইদিকে গিয়ে দেখে আসলাম। বাধ্য হয়ে আবারো কোর্ট স্টেশন বাজারে ফিরে এসে ভাত খেতে হলো। ভাত কোনোভাবে গলা দিয়ে নামছে না। রাজন ভাইকে বলি দ্রুত রুমে ফেরার কথা। হোটেল থেকে বের হওয়ার পর একটা সাদা গাড়ি থেকে উঁচু লম্বা এক লোক এসে রাজন ভাইকে পিছন দিক দিয়ে জড়িয়ে ধরে গাড়ির কাছে নিয়ে যায়। আমি বিষয়টি বুঝতে পেরে ফাহিমকে ইশারা দিয়ে দ্রুত পাশের হোটেলে ঢুকে যাই। পাঁচ-সাত মিনিট পর আর বাসার দিকে না গিয়ে হোটেল থেকে বের হয়ে একটা রিকশা নিই। যোগাযোগের জন্য তখন আমাদের কাছে আছে জাস্ট একটা বাটন ফোন। ওখানে খুঁজে খুঁজে রাজন ভাইয়ের এক ছোট ভাই বাবু ভাইয়ের নাম্বার পেলাম। ভাইকে তুলে নেওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দিলাম। আর আমরা যে রিকশা নিয়ে রওনা দিয়েছি তা জানিয়ে দিলাম।

রিকশা নিয়ে সিঅ্যান্ডবি মোড়ের কাছে আসতেই দেখতে পাই পুলিশের ব্যারিকেড। রিকশাওয়ালাকে বললাম লক্ষ্মীপুরের রাস্তায় নিয়ে যেতে। ইতোমধ্যে পিছনে দুটি বাইক ফলো করছে। ফাহিমকে বললাম, আজ আর আমাদের ছাড় নেই। লক্ষ্মীপুর মোড়ের কাছে এসে বাইক দুইটা আর দেখা যাচ্ছিল না। একটি সাদা কার একটু পর ফলো করা শুরু করে। রিকশা নিয়ে তেরোখাদিয়া স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে কোনোভাবে উপশহরের দিকে চলে যাই। বাবু ভাইয়ের মাধ্যমে আমার ডিপার্টমেন্টের ড. আখতার হোসেন মজুমদার স্যারের নাম্বার ম্যানেজ করি। এরই মাঝে যারা ফলো করছিল তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে উপশহরের অলিগলি ঘুরে স্যারের বাসায় এসে আশ্রয় নিই।

এদিকে সমস্যা হয়ে গেছে আরেকটি। ফোনের সিম না খুলেই স্যারের বাসায় চলে যাই। ওই সিমটি দিয়ে রাজন ভাইয়ের সাথে কথা হইছিল। ফলে পুরো বিল্ডিংয়ের সবাইকে বিপদে ফেলার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাইনি। তাই স্যারকে বলি আমাদের সেফটি এখন গুরুত্বপূর্ণ। স্যারের বাসার কিছুদূরেই একটি কনস্ট্রাকশন বিল্ডিংয়ের কাজ চলছে।

ইলেক্ট্রিসিটি, পানি কিছুই নেই সেখানে। এমনকি কোনো জানালাও লাগানো হয়নি। শুধু টাইলসটুকু করা হয়েছে। স্যারের বাসা থেকে দুটি ছোট বালিশ, একটি বেডশিট, একটি মশারি নিয়ে আসি। পাঁচতলার একটি ফ্ল্যাটে গিয়ে স্যার নিজ হাতে মশারি টাঙিয়ে দেয়। আশপাশে একটু ঝেড়ে নিয়ে বেডশিট বিছিয়ে নিই। এদিকে চিন্তা হচ্ছিল রাজন ভাইয়ের জন্য। ভিতর থেকে সবকিছু চেপে কান্না আসছিল। কিন্তু চোখ দিয়ে এক ফোঁটা পানিও বের হচ্ছে না। কেমন জানি পাথর হয়ে গেছি। এসব ভাবতে ভাবতেই শুয়ে পড়লাম দুজনে। পরবর্তী অনিশ্চিত দিনের চিন্তা চাইলেও বাদ দিতে পারছিলাম না।

মেহেদী সজীব, ৪র্থ বর্ষ, সমাজকর্ম বিভাগ, শহীদ জিয়াউর রহমান হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই-২৪ বিপ্লবঃ ফ্যাসিবাদের মুখোমুখি এক অভ্যুত্থানের দিনলিপি

রাশেদ রাজন

১৯৪৭ সালের দেশভাগের মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র। কিন্তু রাষ্ট্র বদলালেও পূর্ব-পাকিস্তানিদের ভাগ্য বদলায়নি। পাকিস্তানি সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক শাসকেরা শোষণ-নিপীড়নের হাত থেকে আমাদের মুক্তি দেয়নি। সেই শোষণের বিরুদ্ধে আমাদের জাতিকে জেগে উঠতে হয়েছিল ভাষা আন্দোলনে (১৯৫২), ছাত্র গণঅভ্যুত্থানে (১৯৬৯), এবং অবশেষে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে (১৯৭১)। কিন্তু সেই মুক্তিযুদ্ধের ফসল ছিল কি শুধুই এক টুকরো মানচিত্র? না কি ছিল একটি সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণের স্বপ্ন?

এই স্বপ্নের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র শুরু হয়। পাকিস্তানি দোসরদের হাত থেকে মুক্তি পেলেও, নতুন দোসর হয়ে ওঠে ভারত। আর তার চেয়েও ভয়ংকর হয়ে ওঠে আওয়ামী লীগ নামের এক লেজুড়বাদী রাজনৈতিক গোষ্ঠী। তারা ভারতীয় উপনিবেশবাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্রতী হয়। ভারতের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধেই গড়ে উঠেছিল এই জনপদের ভারতবিরোধী চেতনা, যা ছিল জনগণের স্বাধীন আত্মপরিচয়ের স্বাভাবিক দাবির অংশ। কিন্তু সেই চেতনাকে দমন করতে শেখ হাসিনার সরকার তাদের সমগ্র প্রশাসন, দলীয় ক্যাডার, এবং মিডিয়া দিয়ে নেমে পড়ে।

আমরা যারা ছাত্র, আমাদের ভবিষ্যৎ যেন অন্ধকারে। চাকরি নেই, সম্মান নেই, ভোট নেই কেবল এক ফ্যাসিবাদী শাসনের দীর্ঘ ছায়া। স্বপ্ন দেখলেই রাষ্ট্রীয় জুলুম। প্রশ্ন তুললেই 'রাজাকার', ভিন্নমত পোষণ করলেই 'দেশদ্রোহী'। জনগণের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছিল। আর তখনই শুরু হয় ছাত্র-জনতার ইতিহাসগড়া এক অভ্যুত্থান–'জুলাই-২৪ বিপ্লব'।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলাম দীর্ঘ পাঁচ বছর। সেই সূত্রে ছাত্রলীগের অসংখ্য অপকর্মের সাক্ষী ছিলাম– চাঁদাবাজি, হলের সিট বাণিজ্য, দলীয় মিছিলে বাধ্য করা, র‍্যাগিংয়ের নামে নির্যাতন, অধিকার আদায়ের আন্দোলনে অস্ত্রসহ হামলা কিংবা ভিন্নমতের শিক্ষার্থীকে ধরে 'শিবির' তকমা দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এই ভয়ঙ্কর বাস্তবতার ভেতরেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) "Student Rights Association (SRA)"—একটি অরাজনৈতিক মানবাধিকার সংগঠনের সহযোদ্ধারা, আমি ছিলাম যার প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি।

২০২৪ সালে হাইকোর্ট কোটা পুনর্বহালের রায় ঘোষণার পর ঢাকা থেকে যখন আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল ছাত্রজনতার ক্ষোভ, তখন রাজপথে নামার ডাক এল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনের সমন্বয় করছিল এসআরএ'র তৎকালীন সভাপতি মেহেদী সজীব ও সাধারণ সম্পাদক ফাহিম রেজা। তারা রাবির আন্দোলন সম্পর্কে আমার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতেন–কারণ আমি শুধু একজন আন্দোলনকর্মী ছিলাম না, ছিলাম রাজশাহী রাজনৈতিক অঙ্গনের এক নীরব পর্যবেক্ষক।

সাংবাদিকতার সুবাদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও মহানগর রাজনীতির ভেতরকার জটিল গলিপথ আমার জানা ছিল। ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী লীগ, পুলিশের বিভিন্ন শাখা, র‍্যাব, ডিবি, সিটিটিসি, এমনকি ডিজিএফআই–এই ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীদের অনেক গোপন তৎপরতা আমার কানে আসতো। ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল উভয় দিকেই তাদের কৌশল, হুমকি, কার নির্দেশে কে চলছে সবই আমি নিরীক্ষণ করতাম সাংবাদিক ও সংগঠক হিসেবে।

তাদের গতিবিধি বুঝে আন্দোলনের জন্য কৌশল নির্ধারণ করাটা তখন সহজ ছিল না, কিন্তু সম্ভব ছিল। আমার কাছে নিয়মিত আপডেট থাকায়, আন্দোলনকারীরা জানতো–কখন কোথায় সভা করা নিরাপদ, কোথায় প্রশাসন হামলা চালাতে পারে, কারা ছাত্রবেশে গুপ্তচর হয়ে আছে। এই বাস্তবতা বুঝে তারা আমার পরামর্শ চাইত, আমি বুঝিয়ে দিতাম–সতর্কতার সীমা কোথায়, সাহসের রেখা কতদূর টানতে হবে।

ঠিক সেই সময় আমি একটি জিওপলিটিক্যাল ডকুমেন্টারির কাজে ব্যস্ত ছিলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে মেহেরচণ্ডী এলাকায় একটি বাসা নিয়ে গবেষণায় ডুবে ছিলাম। কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপ, বিচারহীনতা, ছাত্রদের চোখের আগুন–এসব কিছু আমায় চুপ করে থাকতে দেয়নি। ভেতর থেকে টান অনুভব করলাম– দূর থেকে দেখা আর নোট নেওয়ার সময় শেষ। কলম নামিয়ে হাতে তুলে নিলাম লাল পতাকা। সব কাজ স্থগিত করে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিলাম ছাত্র আন্দোলনের ভেতরে।

আমি তখন কেবল পর্যবেক্ষক নই, হয়ে উঠলাম সরাসরি প্রতিরোধের অংশ। ছাত্র-জনতার কণ্ঠ হয়ে, ভেতর থেকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়ালাম ফ্যাসিবাদের বিপরীতে। এই ছিল শুরু–জুলাই বিপ্লবের রাজশাহী অধ্যায়ের।

এদিকে কর্মসূচির ধরন দেখে আমরা বুঝতে পারি আন্দোলনের ভেতরে ছাত্রলীগ-ঘেঁষা লেজুড়বৃত্তিক চক্র ঢুকে পড়েছে; যারা আন্দোলনকারীদের তথ্য ফাঁস করে, বিভ্রান্তি ছড়ায় এবং আন্দোলনের মূল ব্যানার বাদ দিয়ে ভিন্ন নামে কর্মসূচি দিতে থাকে। এদের

নেতৃত্বে ছিল আরবি বিভাগের ছাত্রলীগ নেতা রেজওয়ান গাজী মহারাজ, যে ছিল ছাত্রলীগের সভাপতি বাবু ও সেক্রেটারি গালিবের পালিত গুপ্তচর।

কেন্দ্রীয় ব্যানার 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'কে ছুঁড়ে ফেলে তারা চালায় 'কোটা পদ্ধতি সংস্কার আন্দোলন'। উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট–কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে দুর্বল করা, আন্দোলনকে ডিসক্রেডিট করা, আর ছাত্রলীগের সুবিধাভোগীদের জায়গা করে দেওয়া।

ছাত্রলীগের নেতৃত্বাধীন কমিটি থেকে মেহেদী সজীব পদত্যাগ করলে তখন থেকেই শুরু হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপ্লবের এক নতুন মাত্রা। তখন ছাত্রজনতার চোখ খুলে যায় এবং বাকি তিন সমন্বয়কারীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। কেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'-এর ব্যানারে আবার সংগঠিত হয় রাজশাহীর বিপ্লবীরা। এতে যুক্ত হয় রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, নার্সিং কলেজ, বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের বিপ্লবী শিক্ষার্থীবৃন্দ।

১৪ জুলাই শেখ হাসিনা শিক্ষার্থীদের 'রাজাকারের নাতি-নাতনি' বলে গালি দেওয়ার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজনতা রাতেই প্রশাসন ভবনের সামনে বিক্ষোভ করে। মেয়েরা হলের তালা ভেঙে বেরিয়ে আসে, প্রতিবাদী মিছিল গর্জে ওঠে 'আমি কে তুমি কে রাজাকার, রাজাকার' স্লোগানে। পরে ঢাকা রাজশাহী-মহাসড়ক অবরোধ করে এবং রাত ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি পালন করে।

১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগ-পুলিশ-যুবলীগের যৌথ হামলার পর রাজশাহীর আন্দোলন রূপ নেয় এক অপ্রতিরোধ্য অভ্যুত্থানে। আমি, ফাহিম রেজা, মেহেদী সজীব এবং রাবি শিবিরের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক মুজাহিদ ফয়সাল বাবু এক যৌথ মিটিংয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে, রাবিকে 'ছাত্রলীগমুক্ত' করতে হবে রক্ত দিয়ে হলেও। কিন্তু গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি সেই দিন দুপুরের আগেই নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগ হলগুলোতে তালা লাগিয়ে দেবে যেন বিপ্লবী শিক্ষার্থীসমাজ হল থেকে বের হতে না পারে। এজন্য সেই রাতে সবাই মিলে একেক জনকে একেক হলের দায়িত্ব দেওয়া হয় যেন শিক্ষার্থীরা ১৬ জুলাই দুপুরের আগে যেকোনোভাবে হল থেকে বের হতে পারে। ছাত্রলীগ ও গোয়েন্দাদের কড়া নজরদারি এড়াতে প্রতিটি হলের প্রতিনিধিদের গোপনে সেই তথ্য পাঠানো হয় সাংবাদিকদের মাধ্যমে। সেসময় রাবি প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির সভাপতিসহ বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ব্যাপক সহযোগিতা করেন।

১৬ জুলাই সকাল ৯টা থেকে আমি ও একজন সাংবাদিকসহ বেশ কয়েকজন মাদার বখশ্ হলের পাশে অবস্থান করছিলাম হলগুলোর পরিস্থিতি বোঝার জন্য। সে সময়ের

আপডেট আমি মুজাহিদ ফয়সালকে জানাতে থাকি। এদিকে দুপুর দেড়টা থেকে বিনোদপুর মন্ডলের মোড়ে অনাবাসিক বিপ্লবী শিক্ষার্থীদের জোড় করতে থাকে মুজাহিদ ফয়সাল এবং দুপুরের নামাজ শেষে আড়াইটার দিকে তার নেতৃত্বে মিছিল নিয়ে মেন গেটের তালা ভেঙে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে ছাত্রজনতা। সেই মিছিলে যুক্ত করতে একে একে সব হলের তালা ভাঙে শিক্ষার্থীদের বের করা হয়। শিক্ষার্থীদের গণজোয়ারের মুখে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাস থেকে পালাতে বাধ্য হয়। সেইদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে দেশের প্রথম ছাত্রলীগমুক্ত ক্যাম্পাস। পলাতক ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের রুম থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, মাদক, ককটেল এবং তাদের অপরাধের কালো দলিল।

রাবি ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রলীগকে বিতাড়িত করার পর আন্দোলনের ভার অনেকটা আমাদের কাঁধে এসে পড়ে। তখন একদিকে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অন্যদিকে সম্মুখসারির নেতাকর্মীদের জন্য নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা–এই দুই কাজকে একসাথে সামলাতে হচ্ছিল। একইসাথে চিন্তা চলছিল এই আন্দোলনকে কীভাবে আরও গতি ও দিকনির্দেশনা দেওয়া যায়।

এইসব পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণের জন্য রাজশাহীর হোটেল ডালাস ইন্টারন্যাশনালে আমরা দুটি রুম বুক করি, যেখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে ডাকা হয় গোপন মিটিংয়ের জন্য। ঠিক সে সময়টায় আমি নীরবে নজর রাখছিলাম– রাবি ছাত্রলীগ ও মহানগর আওয়ামী লীগের কেউ কি নতুন করে হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে? ছাত্রলীগের একটি অংশের সূত্র থেকে পাওয়া খবরে জানতে পারি, তখনকার রাসিক মেয়র ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি খায়রুজ্জামান লিটন সরাসরি ক্যাম্পাসে হামলার পক্ষে ছিলেন না। তবে রাবি ছাত্রলীগের সভাপতি বাবু, সেক্রেটারি গালিব এবং সাবেক সেক্রেটারি ফয়সাল আহমেদ রুনু তাদের ক্যাডার বাহিনী দিয়ে রাতের আঁধারে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস চালানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল।

এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম উৎকণ্ঠা বিরাজ করছিল। কেউ কেউ ভাবছিল–কখন যে আবার হলের ওপর চড়াও হয় সন্ত্রাসীরা, কে জানে! এদিকে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে ভুয়া ভয়ভীতি ছড়ানোর নতুন পাঁয়তারা শুরু হয়। উদ্দেশ্য একটাই–মিথ্যা ভয় দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঠ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করা। বিভিন্ন মিথ্যা অডিয়ো ক্লিপ ছড়িয়ে দেওয়া হয় ক্যাম্পাসজুড়ে। সেই সময় আমি যে তথ্য সরবরাহ করেছিলাম–তা ছিল শতভাগ নির্ভরযোগ্য। আমি শিক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করতে বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে এই তথ্য সবার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করি যে, "ভয় নেই, আজ রাতে হামলার সম্ভাবনা নেই।" আমার এই বার্তা শিক্ষার্থীদের মনোবল টিকিয়ে রেখেছিল। আমার এই তথ্য প্রতিটি হলের আন্দোলনের ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে তথ্যগুলো

পৌঁছানোর জন্য ফাহিম, মেহেদী সজীব, মুজাহিদ ফয়সালকে বলা হয় যেন একজন বিপ্লবীও যেন ক্যাম্পাস ছেড়ে না যায়। শিক্ষার্থীদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় পালানো নয়, প্রতিরোধই হবে আমাদের অস্ত্র।

এদিকে রাত ১২টার দিকে মুজাহিদ ফয়সাল হোটেল ডালাসে আসার জন্য ফোন দেয় এবং বলে "ভাই, সবাই ফোন বন্ধ রাখেন, শুধু আপনার ফোন খোলা থাকবে। এই নাম্বারে যোগাযোগ রাখবেন।" আমরা চারজন একটি রিকশা নিয়ে মাস্ক পরে রওনা দিই ভদ্রা মোড়ের দিকে। রাস্তায় সব নিস্তব্ধ, কিন্তু বাতাসে থমথমে উত্তেজনা। আমরা ভাবছি, সামনে কী অপেক্ষা করছে?

ভদ্রা মোড়ে পৌঁছানোর পরপরই মুজাহিদ ফোন করে জানায়–"ভাই, বড় বিপদ হয়ে গেছে। পাশের রুমে রাবি ছাত্রলীগের সভাপতি-সেক্রেটারিসহ ছাত্রলীগের অনেকেই সেখানে অবস্থান করছে। মিটিং করা নিরাপদ না।"

আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যাই, কোনো মহাবিপদে পড়তে যাচ্ছিলাম! অলৌকিকভাবে আল্লাহর রহমতের কারণে সেদিন রক্ষা পেয়ে যাই। মুজাহিদ কিছুক্ষণ পর আমাদের নতুন ঠিকানা দেয়। পরে আমরা কাদিরগঞ্জের একটি কোচিং সেন্টারের বিল্ডিংয়ে গোপন মিটিং শেষ করি। সেখান থেকে বাড়ি ফিরি সূর্য ওঠার আগেই ভোর পাঁচটার দিকে।

এই রাতটা আমাদের মনে করিয়ে দেয়–ফ্যাসিবাদ কখনো শুধু বন্দুক বা লাঠি দিয়ে আসে না, আসে ছদ্মবেশে, মিথ্যা প্রচারণা আর বিশ্বাসঘাতকতার চাদরে ঢাকা পড়ে। কিন্তু আমরা জানতাম, সতর্কতা ও সংহতির শক্তিই আন্দোলনের আসল বর্ম। সেই রাত্রি ছিল না শুধু পালাবার গল্প, বরং ছিল লড়াইয়ের প্রস্তুতির এক সাহসী অধ্যায়।

২৪ জুলাই পর্যন্ত আন্দোলনের দুই গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক ফাহিম ও সজীবসহ নেতৃত্বে থাকা কয়েকজন নিরাপত্তার কারণে আশ্রয় নিয়েছিলেন আমার মেহেরচণ্ডিস্থ ভাড়াবাসায়। ১৮ জুলাই থেকে রাষ্ট্র ইন্টারনেট বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এক অদৃশ্য শ্বাসরুদ্ধ পরিস্থিতিতে পড়ে যাই আমরা। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং নজরদারির ফাঁদ এড়িয়ে চলতে এক সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়–সবাই মোবাইল বন্ধ রাখবে, সিম কার্ড খুলে ফেলা হবে এমনকি ফোন পর্যন্ত বদলে ফেলতে হবে। ফলে রাজশাহী অঞ্চলের আন্দোলনের সমস্ত বাইরের যোগাযোগের একমাত্র সেতুতে পরিণত হয় আমার ফোন। পরিবার, সংবাদমাধ্যম, আন্দোলনের সকল যোগাযোগ হতো আমার নম্বর থেকেই।

এদিকে, একের পর এক ছাত্রাবাস, মেস, ভাড়াবাড়িতে হানা দিতে থাকে পুলিশ, র‍্যাব, ডিবি। আমার বাসার চারপাশেও চলে তল্লাশি। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি পদক্ষেপ তখন নজরদারির ছায়ায় বন্দি। বিপদের ঘনঘটা টের পেয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিই আত্মীয়ের

বাড়িতে গিয়ে কিছুটা নিরাপদ আশ্রয় নেওয়ার। ঠিক সেই সময়, দুপুর গড়িয়ে বিকেল, হঠাৎ বাইকে এসে হাজির হয় মুজাহিদ ফয়সাল। সে হাতে তুলে দেয় নতুন একটি ফোন নম্বর। জানায়, 'আপনারা যেদিকে যাচ্ছেন, সেখান থেকে যোগাযোগ রক্ষা করা দুঃসাধ্য হবে। আমি একটা ঠিকানা দিচ্ছি, আপনারা তিনজন এখনই সেখানে চলে যান।'

আমরা দ্রুত রওনা দিই সমাজকর্ম বিভাগের কিবরিয়া স্যারের বাসার দিকে। ২৪ জুলাই, সন্ধ্যার আগেই পৌঁছাই। সেখানে কিছুটা আশ্রয় মেলে, কিন্তু সেটা টিকল না বেশিক্ষণ। সন্ধ্যা পেরোতেই হঠাৎ ওয়াইফাই চালু হয়ে যায়–ইন্টারনেট ফিরে আসে। মুহূর্তের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপে ডিজিএফআইয়ের কল আসে ফাহিম ও সজীবের নম্বরে। আমি তৎক্ষণাৎ ফোন রিসিভ করতে নিষেধ করি এবং জানিয়ে দিই–এই ঠিকানাও আর নিরাপদ নয়। সেদিনই আমরা বাসা বদলাই। এরপর শুরু হয় গেরিলা কৌশলে ঘনঘন বাসা পরিবর্তনের এক দুঃসাহসিক অধ্যায়। প্রতিদিন রাতে নতুন বাসা, প্রতিদিনই অনিশ্চয়তা, প্রতিদিনই আন্দোলনের দিকনির্দেশনা নিয়ে জরুরি বৈঠক। আমরা ঘর বদলাই, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য বদলায় না–জুলাই বিপ্লবকে বিজয়ের দিকে এগিয়ে নেওয়ার লড়াই অব্যাহত থাকে।

২৫ জুলাই বিকেলে ছাত্রলীগ নেতা রেজওয়ান গাজী মহারাজের নেতৃত্বে চারজন তথাকথিত সমন্বয়ক পরিচয়ে ডিজিএফআই-এর প্রেসক্রিপশনে রাবির গ্রন্থাগারের পেছনে এক সংবাদ সম্মেলনে করে। সাংবাদিকদের তারা বলে, "সরকার আমাদের দাবি মেনে নিয়েছে এবং আন্দোলনের ভেতরে শিবির ঢুকে পড়েছে, এজন্য আমরা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের সকল কার্যক্রম আগামী এক মাসের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেছি।" তারা শুধু আন্দোলন বন্ধ করেনি আন্দোলনের ফেসবুক পেজটিও ৩০ দিনের জন্য বন্ধ করে দেয় যেন আর কোনো অ্যাক্টিভিটি চালাতে না পারে কেউ।

এই প্রহসনের বিরুদ্ধে আমরা সিদ্ধান্ত নেই–রাজশাহীর মাটি থেকে আন্দোলন থামবে না। চালিয়ে যেতে হবে যেকোনোভাবে এবং নতুন সমন্বয়ক পরিষদ গঠন করতে হবে। অতঃপর আমি ফ্যাসিবাদবিরোধী রাবি ছাত্রসংগঠনের নেতৃত্বস্থানীয় সবাইকে ফোন করি এবং আন্দোলনে সমন্বয়ক হিসেবে থাকার কথা বলি এই শর্তে যে, কেন্দ্রীয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলন যে কর্মসূচি দিবে তা নির্দ্বিধায় পালন করতে হবে। সেসময় অনেকেই সমন্বয়ক পরিষদে থাকতে চায়নি। ছাত্র ইউনিয়নের রাকিব না থাকতে চাইলেও আতাউল্লাহ রাজি হয়, এই দিকে ছাত্র অধিকার পরিষদের মেহেদি মারুফ প্রতিশ্রুতি দেয় সে থাকবে। আইন বিভাগের ছাত্র আকিল বিন তালেবকে ফোন দিলে সে বেশ আগ্রহ দেখায়, মাসুদ রানাকে ফোন দিলে সে জানায় রাজশাহীতে থাকতে পারবে না কিন্তু সমন্বয়ক পরিষদে থাকতে পারবে। ছাত্রফ্রন্টের ফুয়াদ রাতুল, নাগরিক

ছাত্র ঐক্যের মেহেদি হাসান মুন্না, আইন বিভাগের মৃত্তিকাকে আমি একই শর্তে রাজি করায় সমন্বয়ক পরিষদে থাকার জন্য। মুন্না তখন পাবনায় শ্বশুরবাড়িতে আত্মগোপনে। আমার ফোন থেকে মেহেদী সজীব ফৌজিয়া নৌরিন ও তাসিনকে ফোন দিয়ে কমিটির বিষয়ে জানালে তারা রাজি হয়। মিশু সমন্বয়ক পরিষদের থাকতে রাজি না থাকলেও আমার জোরাজুরিতে সে রাজি হয় তবে তখন সে ঢাকায় একটা বাসায় অবস্থান করছিল। চারুকলার তানভীর আহমেদ রিদমের নামটা আমরা দেই তার নামে হল ভাঙচুরের মিথ্যা মামলা থাকার কারণে। মেহেদী সজীব ও ফাহিম রেজা এই দুইজন তো আমাদের এই আলাপে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলই। এদিকে মুজাহিদ ফয়সাল বাবু সমন্বয়ক পরিষদে থাকার জন্য ম্যানেজ করে নওসাজ জামান, সালাউদ্দিন আম্মার, মাহাদী হাসান মাহাইর ও নুরুল ইসলাম শহীকে।

২৫ ও ২৬ জুলাই এই দুই দিন আমাদের সবারই বেশ ধকল যায়। ২৮ জুলাই কেন্দ্রীয় সমন্বয়কদের আটকে রেখে আন্দোলন প্রত্যাহারের জন্য যখন বাধ্য করা হয়, ঐদিন সন্ধ্যায় আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে আগামীকাল কারফিউ ভেঙে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেনগেটের সামনে মিছিল করব। যথারীতি রাতেই সকলে পোস্ট দেয় এবং প্রচার করতে থাকে। সেই দিন রাতে মুজাহিদ ফয়সাল আমাদের তিন জনকে বাসা পরিবর্তন করে কোর্ট স্টেশন এলাকায় এক বড়ভাইয়ের বাসায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলে। ২৯ জুলাই ফজরের নামাজ পড়ে সে আমাকে নিতে আসে। পুরো রাজশাহী শহর ঘুরে ঐ বাসায় আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। কী এক পরিত্যক্ত বাসা! কয়েক বছর ধরে কেউ থাকে না। ফ্যান, লাইট, বিছানাপত্র কিছুই নাই। আমরা দুইজন মিলে ধুঁয়ে-মুছে পরিষ্কার করে কোন রকম ফ্লোরে থাকার ব্যবস্থা করি। সজীব ও ফাহিম বেলা ১১টার কর্মসূচি শেষ করে অনেক অলি-গলি ঘুরে সেখানে আসে দুপুর তিনটার পরে। সবাই ক্লান্ত, দুপুরে কারোরই খাওয়ার সুযোগ হয়নি। সন্ধ্যার পর আমি, ফাহিম ও সজীব খেতে বের হয়েছি কোর্ট স্টেশন বাজারে। খেয়ে হোটেল থেকে বের হয়ে মাঠা কেনার জন্য মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করছি এমন সময় আমার কাঁধে একজন অপরিচিত হাত রাখে। আমি ভেবেছিলাম পরিচিত কেউ হবে হয়তো। উনাকে কেমন আছেন জিজ্ঞাস করতেই উনি উত্তর দিলেন 'ডিবি'। উনি জিজ্ঞেস করছিলেন আমার নাম রাজন কি না আর উনার ফোনের স্কিনের দিকে তাকিয়ে ছবি মিলাচ্ছিলেন আমার চেহারার সাথে। আমি সামনে তাকিয়ে দেখলাম একটা সাদা মাইক্রো সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বুঝে গেলাম ধরা পড়ে গেছি। পরিস্থিতি এমন সেইখান থেকে পালানোর চেষ্টা কিংবা চিৎকার করলে ফাহিম ও সজীব ধরা পড়ে যাবে কারণ দুইজনই তখন পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আর তাদের চোখের দিকে তাকাইনি। তখন মন বলছিল, মরলে আমি মরব কিন্তু তাদের বাহিরে থাকা খুব জরুরি। সামনের গাড়িতে আমাকে নিয়ে গিয়ে ৭-৮ জন মিলে আমার

হাত-পা এবং চোখ বেঁধে ফেলে। তারা আমার মোবাইল ও মানিব্যাগ নিয়ে নেয়। সেখান থেকে সরাসরি ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যায় যেটা আমি পরে বুঝতে পারি। গাড়ি থেকে নামিয়ে সিঁড়ি দিয়ে আমাকে উপরে ২য় তলায় উঠাচ্ছে তখনও আমার চোখ বাঁধা। সেখানে একটা রুমে নিয়ে গিয়ে আমাকে ফ্লোরে শুইয়ে দেওয়ার পর পায়ের তালুতে ৫০-৬০ কিংবা তার বেশি হবে লাঠি দিয়ে মারতে থাকে। মার থামিয়ে তখন বলে, যা জিজ্ঞেস করব তা সত্য বলবি মিথ্যা বললেই ক্রসফায়ার করে দিব। এবার দাঁড় করিয়ে উলটা দিকে ঘুরিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকে আর মারতে থাকে। এমন সময় আমার ফোনে মা বার বার ফোন দিচ্ছিল। তখন একজন এস আই বলল তোর চোখ ও হাত খুলে দেবো কিন্তু তুই খুবই শান্তভাবে কথা বলবি। এরপর তারা আমাকে লাউড স্পিকার অন রেখে মায়ের ফোন রিসিভ করতে বলে। আমি কলে মায়ের কান্নার আওয়াজ শুনতে পাই। মাকে জিজ্ঞাস করলাম কী হয়েছে কান্না করছ কেন? উলটো মা আমাকে প্রশ্ন করে তুমি কোথায় এখন? তোমাকে এলাকায় অনেকেই খোঁজাখুঁজি করছে। মা যেন টেনশন না করে সেজন্য মাকে বললাম আমি একটু ব্যস্ত আছি তোমার সাথে পরে কথা বলব। মায়ের কান্না যখন থামেই না তখন অনেক করে আশ্বস্ত করার পর মা ফোন রাখতে রাজি হয়। কিন্তু তারা চাচ্ছিল আমি যেন মায়ের সাথে কথা চালিয়ে যাই যাতে তার কোনো তথ্য উদ্ধার করতে পারে।

ফোন রাখাতেই প্রশ্ন করে– তুই বাড়ি যাস নাই কেন? আন্দোলন চালাবি এজন্য।

আরো অনেক প্রশ্ন করতে থাকে– তুই কার টাকায় খাস?

তুই কার হয়ে কথা বলিস?

তোর সঙ্গে বিএনপি, জামায়াত, ছাত্রদল-শিবির, সমন্বয়কদের সাথে কী সম্পর্ক?,

কে তোকে এইসব বলায়? কার হয়ে তুই কাজ করিস?

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সাথে তোর এত যোগাযোগ কেন?– এইসব বলতে বলেতে গালি দিতে থাকে এবং এই রকম আরো প্রশ্ন করতে থাকে। এমনকি আমার অডিয়ো কল রেকর্ড তাদের কাছে থাকার সত্ত্বেও পুনরায় প্রশ্ন করে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে যেন আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়ি। সেরকম কোনো তথ্য না পেয়ে তারা আমাকে চোখ বেঁধে ৭-৮টা রুম পরিবর্তন করে এবং একেক রুমে একেক জন ভিন্ন রকম প্রশ্ন করতে থাকে আর ক্রমাগত আরেকজন মারতে থাকে। তারপর শুরু হয় অমানসিক নির্যাতন। তারা আমাকে উলটো ঘুরিয়ে ওয়ালের সাথে দুই হাত উপরে করে হাত-পা ও চোখ বাঁধা অবস্থায় সারা রাত দাঁড় করিয়ে রাখে। আমি কেবল আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলাম যেন আমার চুপ থাকার শক্তি অটুট থাকে, মুখ দিয়ে যেন এমন

কিছু বের না হয় যা আন্দোলনকে শেষ করে দিতে পারে। সেই মুহূর্তে আমি শুধু এতটুকুই জানতাম আমার মুখ খুললেই সর্বনাশ অনিবার্য। আমার অসর্তকতায় একটি ভুল শব্দই হয়তো রাজশাহীর রাজপথ হারিয়ে ফেলতে পারত তার গর্জন, আঘাত হানতে পারত আন্দোলনের হৃদপিণ্ডে।

৩০ জুলাই, ঠিক পরদিন সন্ধ্যায় আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় মতিহার থানায়। কিন্তু থানায় দায়িত্বে থাকা এক নারী অফিসার আমার বিরুদ্ধে মামলা নিতে রাজি হননি। আমার শরীরজুড়ে নির্যাতনের চিহ্ন দেখে তিনি শঙ্কিত হন–এমন কিছু যদি ঘটে, তার দায় নেবে কে? তিনি চেয়েছিলেন, আগে মেডিকেল রিপোর্ট হোক, তারপর আইনগত প্রক্রিয়া চলুক।

কিন্তু আইন আর মানবিকতা তো তখন ডিবির চোখে 'অপরাধ'। ঠিক সেই মুহূর্তে এক এসআই আমার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে হুমকি দেয়–'মেডিকেলের কথা বলবি না, নয়তো ক্রসফায়ারে শেষ করে দেবো।' আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। রাষ্ট্র তখন আমার কণ্ঠও ছিনিয়ে নিয়েছিল।

এরপর আর কোনো কথা বলিনি। আমাকে জোর করে 'বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে' মামলায় জড়িয়ে কোর্টে চালান দেওয়া হয়। বিচার তো নয়, এক নাটকীয় প্রহসনের মধ্য দিয়ে রাতেই আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে।

এইভাবেই রাষ্ট্র চাইছিল প্রতিবাদের শেষ আলোটুকুও নিভিয়ে দিতে। ডিবি অফিস ও জেলে থাকাকলীন সময়টুকু কেটেছে প্রচণ্ড মানসিক অবসাদ নিয়ে। ডিবি অফিসে থাকা অবস্থা আমার সাথে কেউ দেখা করতে আসেনি– কোনো আত্মীয়, কোনো আপনজন। ডিবি কার্যালয়ে নেওয়ার পর থেকে মতিহার থানায় হস্তান্তরের আগপর্যন্ত আমাকে তারা কোনো কিছু খেতেও দেয়নি। এক পোশাকেই ছিলাম তিনটা দিন; একটা থ্রি-কোয়াটার প্যান্ট আর হাফ হাতা গেঞ্জি। অন্যদিকে ভীষণভাবে শঙ্কায় ছিলাম আদৌ মুক্তি মিলবে না কি স্বৈরাশাসক হাসিনার দেওয়া মিথ্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাগারে কাটাতে হবে।

জেলজীবন মানেই যেন মৃত্যুর ছায়ায় মুক্তির জন্য বেঁচে থাকার প্রতীক্ষা। কথা বলা নিষেধ, হাঁটাচলা নিষেধ, ফ্লোরে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে থাকা ছাড়া যেন আর কিছুই করার নেই। দুই ঘণ্টা পরপর জেলপুলিশ এসে গণনা করে বন্দিদের–এ যেন নিছক সংখ্যা নয়, বরং নিঃস্বত্ব জীবনের হিসেব। পত্রিকাগুলো কেটে দেওয়া হয়–যেন বন্দিজীবনে শুধু শ্বাস নেওয়ার অনুমতি থাকে, কিন্তু দেশের কী ঘটছে, বাস্তবতা কোথায় গড়াচ্ছে সেই খবরটুকুও জানার অধিকার যেন আর না থাকে। জেলখানার গ্রন্থাগারও তালাবদ্ধ, যেন চিন্তা-চর্চা নয়, অন্ধকারেই পচে মরে বিপ্লবের বীজ। জুলাই-২৪ বিপ্লবের অভিঘাতে এমন নিষ্ঠুর, অমানবিক, অবর্ণনীয় জীবনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে আমাদের সবাইকে।

৫ আগস্ট, বাংলার ছাত্র-জনতার রক্তে লেখা এক নতুন স্বাধীনতার ঘোষণা।

দুপুর আড়াইটার দিকে ঘুম ভাঙতেই চোখ পড়ল কারাগারের সেই একমাত্র সক্রিয় টেলিভিশন স্ক্রিনে বিটিভি ছাড়া তো আর কিছুই চলে না জেলে। দেখলাম, '২৪-এর আন্দোলনকারীরা জামাত-শিবিরের এজেন্ট, রাষ্ট্রদ্রোহী, সন্ত্রাসী!' বলে নিউজ প্রচার করছে কিন্তু স্ক্রিনের নিচের দিকে ভেসে উঠছে–'শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও পলায়ন'। বিটিভির পর্দা থেকেও সেই খবর সম্প্রচার হচ্ছে যমুনা নিউজের ক্রেডিটসহ! বুকের ভেতর মুহূর্তেই এক বিস্ফোরণ অনুভব করলাম–চিৎকার করে উঠলাম, "আল্লাহু আকবার!" ফ্যাসিবাদের দেওয়াল যেন কেঁপে উঠল সেই ধ্বনিতে, কাঁপল জেলের পাথুরে দেয়াল, কেঁপে উঠল ইতিহাসের বন্ধ দুয়ার। আমার চিৎকারে পুরো সেলের বন্দিরা উঠে এল, সবাই হতবাক কারণ জেলের ভেতরে এমন কেউ কখনো করে না। চারপাশে ছড়িয়ে গেল খবর–শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছে, স্বৈরাচার ফ্যাসিস্ট শাসন ভেঙে পড়েছে! সেলভর্তি মানুষ সিজদায় লুটিয়ে পড়ল, কেউ কাঁদছে, কেউ কুরআনের আয়াত পড়ছে, সবাই সবাইকে জড়িয়ে ধরছে। কারো কাছে মিষ্টি নেই–তাই আমার সেই জমিয়ে রাখা গুড় দিয়েই সবাইকে মিষ্টিমুখ করালাম। যেন পরাধীনতার শেষপ্রহরে আমরা নতুন সূর্যের স্বাদ নিচ্ছিলাম।

তবু মুক্তি এল পরে– ৭ আগস্ট, নয় দিন নিঃশ্বাস বন্ধ করা বন্দিজীবনের পর আমার কারামুক্তি ঘটে আমার। কিন্তু মুক্তি কি মানেই ভোলা? চোখ বন্ধ করলেই এখনো দেখি সেই ডিবি অফিসের অন্ধকার ঘর, চোখ বাঁধা অবস্থায় বুটের লাথি, লাঠির আঘাত, আর অনবরত চিৎকার–"কেন আন্দোলনে জড়িয়েছিস? কার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল? কাদের হয়ে কাজ করিস? তোদের মদদদাতা কে?"

এটি ছিল শুধুই ব্যক্তিগত না, এটি ছিল একটি প্রজন্মের লড়াই–ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, এবং আমাদের কাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জন্য। এই সংগ্রাম কেবল চাকরির কোটা সংস্কারের আন্দোলন ছিল না। এই আন্দোলন ছিল একটি রাষ্ট্রব্যাপী ফ্যাসিবাদ ধ্বংসের ঘোষণা যেখানে বৈষম্যের শিকল ছিঁড়ে, সাম্যবাদী ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের শপথ নিয়েছিল ছাত্র-জনতার। সেই স্বপ্নের আগুন ছিল আমাদের চোখে–আর সেই আগুনেই আমাদেরকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে চেয়েছিল ফ্যাসিবাদের দোসর, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসীরা।

আমাদের অনেক সহযোদ্ধা জীবন দিয়েছে, বুক পেতে দিয়েছে রাষ্ট্রীয় গুলির সামনে দাঁড়িয়ে। শহিদ হয়েছে শুধু একটি স্বপ্নের জন্য। আজও যদি সেই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে না পারি, আজও যদি রাষ্ট্রীয় দমনযন্ত্র ও শাসকগোষ্ঠীর লেলিয়ে দেওয়া সন্ত্রাসীদের পরাজিত করতে না পারি, তবে আমাদের বিজয় অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

জুলাই বিপ্লব আমাদের শিখিয়েছে–এই লড়াই কেবল কোনো গোষ্ঠীর নয়, কোনো ছাত্রসংগঠনের নয়, এটি গোটা জাতির মুক্তির লড়াই। ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ না করলে, বিভাজনের রাজনীতির বিষ দূর না করলে, শত্রুর ঘাড়ে চেপে বসা সম্ভব নয়। আমাদের লড়াই থামবে না, থামবে না রক্তের জবাব চাওয়ার তীব্রতা। আমরা যে বাংলাদেশ চেয়েছি–সেই কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

গড়ে উঠুক বৈষম্যহীন বাংলাদেশ!
সফল হক ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রাম!
ইনকিলাব জিন্দাবাদ

রাশেদ রাজন, জুলাই-২৪ বিপ্লবের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী ও সংগঠক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই বিপ্লবের স্মৃতি

মো. মশিউর রহমান

রাত ২টা। রুমের দরজায় ঠক ঠক করছে আম্মার। সাব্বির ভাই, সাব্বির ভাই দরজাটা একটু খোলেন তো! ঘুম জড়ানো চোখে সাব্বির দরজা খুলে দেয়।

আম্মার কম্পিউটার নিয়ে বসে, কোচিংয়ের আইডিতে পোস্ট করার জন্য প্রশ্ন দিয়ে স্টিকার বানায় বাকি রাতটুকু। ফেসবুকে টাইম সিডিউল সেট করে পোস্ট করে ঘুমিয়ে যায় আম্মার।

এভাবেই চলছিল বিপ্লবের প্রথম দিনগুলো, কোটা সংস্কার আন্দোলনের দিনগুলো।

আম্মার আমার কোচিংয়ের মার্কেটিং অফিসার। আমি অফিসে বসে থাকি, ঘুম থেকে উঠে আম্মার দুপুর ১২/১-টার দিকে অফিসে আসে। আমি কৈফিয়ত চাই,

-আপনি কোচিংয়ের মার্কেটিং অফিসার, এভাবে অনিয়ম করে অফিসে আসলে হবে? দাঁত খিলখিল করে একটা হাসি দিয়ে,

-ভাই, কী করব? আপনাদের জন্যই তো আন্দোলনটা করতেছি! বিসিএস তো আমি কোনোদিন দেবো না, দেবেন তো আপনারা।

-তা ঠিক আছে, আপনি কোচিংয়ে কাজ করেন। আবার আন্দোলনে যাচ্ছেন এটা ছাত্রলীগের-প্রশাসনের লোকজন জানলে তো কোচিংয়ের সমস্যা হয়ে যাবে!

আবার হাসি দেয়, দাঁত খিলখিল করে বলে, সে আপনারা ম্যানেজ করিয়েন। ৩টায় মিছিল আমি গেলাম ভাই! দোয়া করিয়েন।

-স্বভাবসুলভ তার কাছ থেকে শেখা ডায়ালগটা দিয়ে দিই, ঠিক আছে দেখেশুনে যাইয়েন, পৌঁছে ফোন দিয়েন"।

সকালে একদিন কোচিংয়ে আসতেছি। কোচিংয়ের গেটেই বিল্ডিংয়ের নাইট গার্ড হাসান ভাই ধরেছে ঐ ঝাঙ্কু কই! আমার শার্ট নিয়ে গেছে দিছে না যে! (বড় বড় চুল থাকায় হাসান ভাই আম্মারকে ঝাঙ্কু বলে ডাকতো)

আমি বললাম আপনার শার্ট নিয়ে গেছে কেন?

হাসান ভাই বলল, ঐযে বৃষ্টিতে ওর কাপড় চোপড় ভিজে গেছে তাই চেঞ্জ করে আমার শার্ট নিয়ে গেছে।

আমি বললাম, আচ্ছা আমি দেখতেছি বলে অফিসে ঢুকলাম।

ঢুকে দেখি চেয়ারের পাশে ভেজা গন্ধযুক্ত একটা শার্ট। সাব্বিরকে বললাম, এই আম্মার যে হাসান ভাইয়ের শার্ট নিয়ে গেছে, এটা কোনো কথা! সাব্বির একটা হা হা হা বলে হাঁসি দেয়, বলে ছেলেটা কাক ভেজা হয়ে আসছে অফিসে, হাসান ভাইয়ের শার্ট পাইছে নিয়ে গেছে। আমিও হাঁসি। প্রতিদিন মিছিল, প্রতিদিন আন্দোলন চলছে।

১৬ জুলাই, বিপ্লবের প্রথম শহিদ আবু সাঈদকে পুলিশ সরাসরি গুলি করে হত্যা করলে সারাদেশের মতো রাজশাহীও উত্তাল হয়ে ওঠে। সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বন্ধ ঘোষণা বিরোধীতা করে আবু সাঈদকে হত্যার প্রতিবাদে বিকাল ৩টায় প্যারিস রোডে মিছিল আহ্বান করে।

পুরো ক্যাম্পাস প্রায় ২০ হাজারের অধিক লোকের মিছিল হয়। প্রত্যেকের হাতে বাঁশের লাঠি, কাঠের বাটাম, রড, স্টিক। যে যেটা পেয়েছে নিয়ে মিছিলে চলে এসেছে। মেয়েদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গালিবের ত্রাসের হল মাদার বখ্শ হলে ছাত্রলীগের রুমে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ভাঙচুর করে এবং গালিবসহ ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের ধাওয়া করে। গালিব তার দলবল নিয়ে কুকুরের মতো মটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর প্রতিটি হলে হলে শিক্ষার্থীরা ছাত্রলীগের রুম ভাংচুর এবং তাদের আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে নেতৃত্ব দেয় রাজশাহী শিবিরের তৎকালীন সাংগাঠনিক সম্পাদক মুজাহিদ ফয়সাল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রথম ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীমুক্ত ক্যাম্পাস ঘোষণা করা হয় ১৬ জুলাই।

পরেরদিন ১৭ জুলাই আবু সাঈদের হত্যাকে কেন্দ্র করে সারাদেশ আরোও উত্তাল হয়ে উঠে। ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করায় বহু শিক্ষার্থী বাড়ি চলে যায়। বাড়িতে না যাওয়া শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ পুলিশ এবং ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের ভয়ে ক্যাম্পাসের হলে থাকার পরিবর্তে ক্যাম্পাসের বাইরের বিভিন্ন বাসায়, মেসে আশ্রয় নেয়। বহু শিক্ষার্থীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেয় শিবির।

১৮ জুলাই ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। তীব্র রোদ রাজশাহীতে। মেন গেটে অল্পকিছু শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করতে থাকে পুলিশ-বিজিবি-র‍্যাবের সামনেই। আমি, সাব্বির কোচিংয়েই ছিলাম। বসে থাকতে পারছিলাম না। শেষে দুইজন ডাবল মাস্ক পড়ে মিছিলের দিকে যাই। যেতেই সাত তলা বিল্ডিংয়ের নিচে অনেকেই দেখি পানির জন্য বলছে। আমি আর সাব্বির ওখানে একটা দোকান থেকে পানি নিতে নিতে দেখি একজন আপু রিকশা থেকে নেমে বলতেছে, যত পানি লাগে নেন আমি টাকা দেবো। আমরা দোকানের সব পানির বোতল নিয়ে নিলাম। এক ভাই মটরসাইকেল নিয়ে এসে

দাঁড়াল বলল আমিও টাকা দেবো। আপুটা বলল না ভাই, আমি দেবো। এ নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা করল দুইজন। আমি ভাইকে বললাম ভাই, আপনি অন্য নাস্তার টাকা দেন। ভাই বলল ঠিক আছে, দোকানের সব বিস্কুট দিয়ে দাও। তাদের দুজনের প্রতিযোগিতা দেখে আমরা যারপরনাই অবাক হলাম। এভাবে বহু মানুষ তাদের সাধ্যমতো খাবার-পানি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। সাব্বিরকে পানির কেস এবং সব বিস্কুটসহ একটা রিকশা নিয়ে পাঠিয়ে দিলাম মেন গেটের দিকে। পিছনে পিছনে আমিও হেঁটে হেঁটে মিছিলে যোগ দিলাম।

২০ জুলাই কারফিউ জারি করা হয়। একদিকে ইন্টারনেট বন্ধ, আরেকদিকে কারফিউ। পুলিশ-বিজিবি প্রতিটা রাস্তায় রাস্তায় বসে আছে, একটা সাইকেল চলা তো দূরে থাক মানুষকে হেঁটে যেতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। বাসায় বসে বসে অলস সময় কাটে। আমি আর সহধর্মিনী দুইজনে বিকেল করে হাটতে বের হই। হানুফার মোড় দিয়ে মির্জাপুর দিয়ে বিনোদপুর দিয়ে হেঁটে হেঁটে বেতার মাঠে যেয়ে বসে থাকি। মণ্ডলের মোড় একটা হোমিও ডাক্তার আপার দোকানে মাঝে মাঝে যাই খবরের শিরোনাম দেখতে। মাঝে মাঝে কোচিং বন্ধ থাকার পরেও চুপচাপ করে আমি আর সাব্বির কোচিং খুলে ভিতরে বসে থাকতাম।

২৬ জুলাই। কোচিংয়ের সামনের চা দোকানদার জামান ভাই আমাকে ধরে নিয়ে গেল তার দোকানে, বলল বসেন কথা আছে। বলল, এই কোচিংয়ে ডিবি ঘুরতেছে, আমাকে এসে জিজ্ঞেস করতেছে আম্মারের কথা। আমি বললাম আপনি কী বললেন? জামান ভাই বলল, বলেছি ও এখানকার কেউ না, কোচিংয়ে কত ছাত্র আসে যায়। আমি বললাম ভাই কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে কিছু বলিয়েন না।

পরেরদিন রাতে পুলিশ বিসমিল্লাহ টাওয়ারের শিক্ষার্থীদের নিচে নামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে আম্মারের বিষয়ে। আমাকে ভবনের গার্ড হাসান ভাই ধরে বলছে, ঐ ঝাঙ্কুর জন্য আজ হামার ছাত্রদের পুলিশ নিচে নামায়ছে। ওকে সাবধানে থাকতে বলেন।

আন্দোলনের এই মুহূর্তে কোচিংয়ের বাসায় আসা ছেড়ে দিয়েছে আম্মার। পরে জানতে পারি তাকে শিবিরের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক মুজাহিদ ফয়সাল বাসা থেকে নিয়ে যেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখেছে।

এতদিনে মিছিলে আম্মার লিডিং। আম্মারসহ বেশিরভাগ সমন্বয়ককে পূর্ণ প্রটেকশন দিয়েছে শিবির। মিছিলে, সমাবেশে শিবিরের কয়েকটা মটরসাইকেল রেডি থাকতো সমন্বয়কদের জন্য। শেষ হবার সাথে সাথেই তাদের তুলে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেত শিবিরের ভাইয়েরা। মিছিলের ব্যানার থেকে শুরু করে মাইক ভাড়া, ফেস্টুন,

গ্রাফিতি করার রংয়ের একটা বিশাল সাপোর্ট দিয়েছে শিবির। এভাবেই চলতে থাকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত কারফিউ এবং ইন্টারনেট ব্লাক আউটের দিনগুলো।

২৯ জুলাই, কারফিউ ভাঙ্গার কর্মসূচি। সারাদেশের মধ্যে রাজশাহীতে সর্বপ্রথম সকাল ১১টায় কারফিউ ভেঙে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন গেট থেকে বিনোদপুর পর্যন্ত মিছিল করে শিক্ষার্থীরা। উপস্থিতি মোট ১০০-এর কাছাকাছি হবে মিছিলে। এই ১০০ জনের অধিকাংশই ছিল শিবিরের। তারা মাথায় নীল রঙের ক্যাপ এবং মুখে মাস্ক পড়ে মিছিলে অংশ নিয়েছিল। সেইদিন প্রথম "শেম শেম ডিক্টেটর" স্লোগান তুলেছিল। সমন্বয়ক মেহেদী সজীব ৯ দফা পাঠ করেছিলেন সেদিন রাজশাহীতে। আমরা কয়েকজন কোচিং থেকে বের হয়ে মিছিলের পাশে পাশে ছিলাম এবং ছবি তুলেছিলাম। সেদিন ইন্টারনেট খোলা থাকার কারণে রাজশাহীর মিছিল নিমেষেই সারাদেশে ভাইরাল হয়ে যায়।

৩১ জুলাই, ৯ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ছাত্র-জনতা মাথায় লাল কাপড় বেঁধে মেন গেটে মানববন্ধন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি সালেহ্ হাসান নকীব স্যারসহ অনেক শিক্ষক, রাজশাহীর সাধারণ জনতা এতে অংশ নেয়। অপরদিকে আওয়ামী দালাল শিক্ষকরা কালো কাপড় বেঁধে প্যারিস রোডে মানববন্ধন ও শিক্ষার্থীদের সন্ত্রাসী আখ্যা দেয়।

৩ আগস্ট/৩৪ জুলাই। রাজশাহীর ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা, স্থানীয় সকল শ্রেণি পেশার মানুষ তালাইমারি মোর থেকে রেলগেট পর্যন্ত মিছিল করে। ঐদিনই ৯ দফা থেকে ১ দফার দাবি উঠে। সারাদেশে বিভিন্ন যায়গায় ছাত্র-জনতা পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

৪ আগস্ট/৩৫ জুলাই। লং মার্চ টু ঢাকা ঘোষণা করা হয় ৬ আগস্ট। রাতের বেলা আবার ঘোষণা করা হয়, পরশু নয় কালই লং মার্চ টু ঢাকা। ছাত্র-জনতা, সকল শ্রেণি পেশার মানুষ দলে দলে রাস্তায় নেমে আসে, রাতভর ঢাকা অভিমুখে মার্চ শুরু করে। আমাদের সিদ্ধান্ত হয় ঢাকা যাব। পরে সিদ্ধান্ত হয় না ঢাকা যাওয়া হবে না, রাজশাহীতেই আগামীকাল আন্দোলন করতে হবে। পরেরদিন সকাল থেকে হৈ হৈ রৈ রৈ রবে সারা রাজশাহী শহরের মানুষজন নেমে আসে তালাইমাড়ি মোড়ে, উদ্দেশ্য সাহেব বাজার মূল পয়েন্ট এবং আওয়ামী লীগের আস্তানা অফিস সব গুড়িয়ে দেওয়া।

৫ আগস্ট/৩৬ জুলাই, রাজশাহী শহরের তালাইমারি মোড় হতে বেলা ১২টা নাগাদ ছাত্র-জনতার বিশাল মিছিল নিয়ে সাহেব বাজার জিরোপয়েন্টের দিকে রওনা হয়। মিছিল আলুপট্টি পৌঁছালে ছাত্রলীগ, যুবলীগের সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে পিস্তল দিয়ে গুলি করা শুরু করে। পুলিশ সন্ত্রাসীদের সহযোগী হয়ে রাবার বুলেট, টিয়ারশেল এবং সাউন্ড গ্রেনেড মারতে শুরু করে। প্রতিরোধের প্রস্তুতিহীন ছাত্র-জনতা আহত হতে শুরু করে।

স্পটে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সাকিব আনজুম ভাই শহিদ হয় এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮ আগস্ট শহিদ হয় ছাত্রশিবিরের রাজশাহী মহানগরীর সাংগাঠনিক সম্পাদক আলী রায়হান ভাই। আরো ৩/৪ জন গুলিবিদ্ধ হয়। টিয়ারশেল, রাবার বুলেটে আহত হয় আরোও অনেকে।

সন্ত্রাসীদের মুহুর্মুহু গুলিতে ছাত্র-জনতা পিছু হটতে বাধ্য হয়। আমরা পিছন দিকে সরে আসতে থাকি। শিবিরের একটা বিশাল বাহিনীসহ আম্মার এবং সমন্বয়করা ছিল সামনে। রিকশার উপর আম্মার মাইকে স্লোগান দিচ্ছিল। কিন্তু টিয়ারশেল খেয়ে সকলেই পিছু হটতে বাধ্য হয়। আমি ২ লিটারের একটা বোতলে পানি ধরে শাহ্মখদুম কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখলাম আম্মার উপরের দিক দিয়ে হাটছে, চোখ মুছতেছে টিয়ারশেল খেয়ে। আমি বোতল থেকে পানি ঢেলে দিলাম আম্মার পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিল।

ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিল শিবিরের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন সভাপতি আব্দুল মোহাইমিন। আব্দুল মোহাইমিন ভাই সামনে যেতে চাচ্ছিল, কিন্তু রাবি শিবিরের তৎকালীন সাংগাঠনিক সম্পাদক মুজাহিদ ফয়সাল ভাই সভাপতি ভাইয়ের হাত ধরে টেনে বলতেছিল ভাই পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে পিছনের দিকে চলেন। আমরা একসাথেই মূল রাস্তার উপরের রাস্তা দিয়ে তালাইমারির দিকে যাচ্ছিলাম। ততক্ষণে ছাত্র-জনতা দিগ্বিদিক ছুটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল। হাঁটতে হাঁটতেই অন্যান্য সমন্বয়ক মেহেদী সজীব, ফাহিম রেজা এবং সালমান সাব্বিরের সাথে দেখা হয়।

আমরা যখন তালাইমারি শহিদ মিনার কাছে তখন আমাদের সামনেও কতগুলো পুলিশের গাড়ি। আমরা আতঙ্কিত হলাম। পেছনেও পুলিশের গাড়ি সামনেও পুলিশের গাড়ি। কিন্তু সামনের পুলিশের গাড়ি থেকে আমাদেরকে গ্রিন সিগন্যাল দেওয়া হলো। আমাদের শান্তভাবে তালাইমারির দিকে চলে যাওয়ার জন্য বলা হলো। আমরা রাস্তার এক সাইড দিয়ে তালাইমারি এসে উঠলাম।

সাহেব বাজারে প্রবেশে ব্যর্থ হয়ে ছাত্র-জনতা আবারো তালাইমারি মোরে অবস্থান নেয়। সবার ভেতরে আতঙ্ক এবং হতাশা ভর করে আছে। সমন্বয়করাসহ অনেকেই তাদেরকে উজ্জীবিত করার জন্য বক্তব্য দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় তালামারিতেই অবস্থান গ্রহণ করবে সবাই। অনেকেই বাসায় চলে যেতে লাগলেন। কিন্তু খবর এলো কাজলা মোড়ে ছাত্রলীগ অবস্থান নিয়েছে। আমি আরোও কয়েকজনসহ সেই খোঁজ নেওয়ার জন্য অক্ট্রয় মোড়ের দিকে রওনা হই। ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় কেউ কোনো নিউজ পাচ্ছিল না দেশের।

এর মধ্যেই আল মামুন ভাই আমাকে ১:৫৫ মিনিটে মোবাইল করে জানায় শেখ হাসিনা পদত্যাগ করছেন এবং সেনাপ্রধান ২টার সময় টেলিভিশনে ভাষণ প্রদান করবেন। (যদিও ভাষণ দেন ৪টায়)

এই খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চিৎকার করতে করতে হাতের মোবাইল উঁচু করে ধরে রুয়েট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে অট্রয় মোড় হতে তালাইমারির দিকে দৌড় দিই এবং চিৎকার করে করে বলতে থাকি হাসিনা পদত্যাগ করেছে, হাসিনা পদত্যাগ করেছে, হাসিনা পদত্যাগ করেছে, সেনাবাহিনী ক্ষমতা নেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। বলতে বলতে আমি এক সময় তালাইমারিতে যেয়ে রাস্তার উপর পড়ে যাই। সবাই আমাকে ঘিরে ধরে। ভাই সত্যি নাকি ঘটনা। আমি বলি হ্যাঁ ঘটনা সত্যি। আবার মামুন ভাইকে ফোন দেই ভাই ঘটনা কি সত্যি? মামুন ভাই বলে ১০০% সত্যি। সেনাপ্রধান একটু পরে ভাষণ দেবে। হাসিনা পালিয়ে গেছে। আমি আবারও চিৎকার করে বলি, হাসিনা পালিয়ে গেছে।

এ খবর শুনে খুশিতে উল্লসিত হয়ে অনেকে সেখানেই আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। সবার মধ্যে আবারো সেই প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে। সেখান উপস্থিত নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি হাসানাত স্যার, গোপালগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রো-ভিসি সোহেল স্যার, রাবি প্রেসের প্রশাসক মাহফুজুর রহমান আখন্দ স্যার আমাকে খুশিতে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করেন। এই মিছিলে স্বাধীনতার বার্তাবাহক হিসেবে নিজেকে একজন গর্বিত অংশীদার মনে করি। বাসায় এসে দ্রুত সহধর্মিণীকে নিয়ে তালাইমারীর দিকে রওনা হই বিজয় মিছিল উদ্‌যাপন করতে।

এ যেন মুক্তির স্বাদ, এ যেন খাঁচার পাখি আকাশে ওড়ার মতো স্বপ্নীল স্বাধীনতা। এ যেন বুকের ওপর চাপানো এক বিশাল পাথর সরে যাওয়ার স্বস্তি।

মো. মশিউর রহমান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, নবাব আব্দুল লতিফ হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

তিন শহিদের কথা

মো. তানভীর খান

জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক বিপ্লবে রাজশাহী জেলার তিনজন শহিদ হয়েছেন। তারা হলেন শহিদ আলী রায়হান, শহিদ সাকিব আনজুম ও শহিদ মিনারুল ইসলাম। তাদের ত্যাগ ও পরিবারের কান্না নিয়ে আমার এই লেখা।

শহিদ আলী রায়হান-এর স্মৃতিকথাঃ জুলাইয়ের শুরুর দিক, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন শুরু হলে রাজশাহীতে আন্দোলন জোরালো করতে কিছু ছাত্র এগিয়ে আসেন। তার মধ্যে অন্যতম শহিদ আলী রায়হান। শুরু থেকেই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রাজশাহীর সমন্বয়কদের উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা পালন করেন আলী রায়হান। নেতৃত্বগুণে পারদর্শী আলী রায়হান ছিলেন সুঠাম দেহের অধিকারী ও অসাধারণ সংগঠক। তিনি আন্দোলনের সমন্বয়কদের দিতেন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ, সাথে নিজেও একটি ক্যাপ মাথায় মিছিলের সামনে থাকতেন।

ক্রমেই আন্দোলন জোরালো হতে থাকে, আন্দোলন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন রাজশাহীর আওয়ামী লীগ নেতা ডাবলু সরকার এবং তৎকালীন সিটি মেয়র খায়রুজ্জামান লিটনের ক্যাডার বাহিনী শিক্ষার্থীদের উপর হামলা চালায়। ওইদিন ছিল ৫ আগস্ট। রায়হান ফজর নামাজ আদায় করে সৃষ্টিকর্তার কাছে শহিদি মৃত্যু কামনা করেন। বেলা ১১টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রুয়েট, রাজশাহী কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা রুয়েট গেট সংলগ্ন নগরীর তালাইমারি মোড়ে জড়ো হয়ে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী সাহেব বাজারের দিকে রওনা দেয়। কিন্তু মিছিলটি আলুপট্টি নামক জায়গায় গেলে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা শিক্ষার্থীদের উপর মুহুর্মুহু গুলি চালায়। কারো হাতে দুইটা পিস্তল, কারো হাতে শর্টগান। শিক্ষার্থীরাও সমান তালে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে লড়াই করতে থাকে। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ছোঁড়া একটি গুলি এসে আলী রায়হানের মাথায় লাগে, মাথা ভেদ করে অপর পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। রায়হান মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আন্দোলনকারী সহকর্মীরা তাৎক্ষণিক তাকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।

এরপর গুলি বের করতে অপারেশন করা হয়। অপারেশন সফল হলে পরদিন ৬ আগস্ট আলী রায়হান হাত-পা নাড়াতে থাকেন, সবাই আশান্বিত হয় সবার প্রিয় আলী রায়হান হয়তো ফিরে আসবে। কিন্তু না, ৮ আগস্ট সকাল থেকেই রায়হানের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়

আলী রায়হান সবাইকে কান্নার সাগরে ভাসিয়ে সৃষ্টিকর্তার ডাকে সাড়া দিয়ে চিরবিদায় নেন। পরদিন রাজশাহী কলেজে তার জানাজায় বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হয়, এরপর রায়হানের মরদেহ নেওয়া হয় গ্রামের বাড়ি পুঠিয়ার মঙ্গলপাড়া গ্রামে। সেখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন শহিদ আলী রায়হান।

২৭ বছর বয়সি শহিদ আলী রায়হান ছিলেন নেতৃত্বগুণে অসাধারণ একজন মানুষ। রাজশাহী কলেজ থেকে স্নাতক শেষ করে স্নাতকোত্তর করছিলেন। ছোট থেকেই ছিলেন বিনয়ী, নম্র-ভদ্র ও মেধাবী। রায়হানের ছোট ভাই ইন্টারমিডিয়েট পড়ুয়া রানা ইসলাম বলেন, ভাইয়া আমাকে অনেক খেয়াল রাখতো, আমি ঢাকায় থাকতাম জন্য মাঝে মাঝেই কল করে কেমন আছি, কী করি, খেয়েছি কিনা এগুলো জিজ্ঞাসা করতো। ভাইয়া সবসময় পড়াশোনার খোঁজ নিত, আজ আমার ভাই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে, আমি ভাই হত্যার সঠিক বিচার চাই।

শহিদ আলী রায়হানের পিতা মো. মোসলেম উদ্দিন, বাড়ির ১৩ শতক জমি ছাড়া আর তেমন কিছু নেই। অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করেন, দরিদ্র কৃষক, বয়সটাও ৫৫ পার হয়ে গিয়েছে, দুই ছেলেকে নিয়ে কত স্বপ্ন, বড় ছেলের পড়াশোনা শেষের দিকে, এরপর ছেলে চাকরি করবে, সংসারে সচ্ছলতা আসবে, তাকে আর এত রোদে পুড়ে কাজ করতে হবে না। কিন্তু সন্ত্রাসী আওয়ামী লীগের একটি বুলেট কৃষক মোসলেম উদ্দিনের সমস্ত স্বপ্ন কেড়ে নিল। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমার কোনো মেয়ে ছিল না, কিন্তু আমার বড় ছেলেটা মেয়ের অভাব পূরণ করতো, রায়হান বাড়িতে আসলেই আমার জামাকাপড় পরিষ্কার করে দিত, হাতের নখগুলোও কেটে দিত। তিন মাস হলো আমার বাড়িতে কোনো আনন্দ নেই। আমার বাসায় একটা বিড়াল আছে, বিড়ালটাও নিষ্প্রাণ। আমার রায়হান ছোট থাকতে রাতের বেলায় কেঁদে উঠতো, আমি ওমনি ওকে কোলে নিয়ে হাঁটতাম আর বলতাম, খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো, বর্গি এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিবে কীসে।

আমার বংশে তেমন শিক্ষিত নেই, আমার রায়হান যেন একটি ফুটে ওঠা কলি ছিল। আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকেই আমি নিয়মিত খবর দেখতাম, দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই স্বৈরাচার আর তার বাহিনী ছাত্রদের নির্বিচারে হত্যা করছিল। আমার মনটা শুধু ছটফট করতো, অনেক উদ্‌বিগ্ন থাকতাম। আমার বড় ছেলে রায়হান প্রতিদিন দুই তিনবার করে মোবাইলে কল করতো। বলতো আব্বা, আপনি খেয়েছেন? কী করছেন? ৫ আগস্ট আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন করছিল, আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। এরপর সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো, আমার রায়হান একবারও ফোন করল না। হঠাৎ দুপুরের পরে আমার মোবাইলে একটা কল আসে। ওপাশ থেকে একটা ছেলে বলল,

আপনি কি রায়হানের বাবা? বললাম, হ্যাঁ। ছেলেটা বলল, চাচা আপনাকে একটু রাজশাহী মেডিকেলে আসতে হবে। আমি হন্তদন্ত হয়ে গেলাম, তখনই রাস্তায় বের হয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি রাস্তায় গাড়ি নেই, কোনোমতে দুপুর সাড়ে ৩টার দিকে রাজশাহী মেডিকেলে গেলাম। গিয়ে দেখি অপারেশন থিয়েটারের সামনে আমার রায়হানের বন্ধু ও আন্দোলনের সহযোদ্ধারা দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, বাবা আমার রায়হানের কী হয়েছে? ওরা বলল, আমার রায়হানের নাকি মাথায় গুলি লেগেছে। একটু পরে ডাক্তাররা বের হয়ে এসে বলল, আমার ছেলে রায়হানের অপারেশন ভালো হয়েছে। তখন মনে হচ্ছিল মরুভূমির বুকে একফোঁটা পানি পেলাম, আমার মন একটু শান্ত হলো।

কিন্তু পাঁচ তারিখ গেল, ছয় তারিখ গেল, আমার রায়হান আমার সাথে কোনো কথা বলে না, আব্বা বলে ডাকে না। আমি শুধু কাচ দিয়ে আইসিইউ রুমে তাকাই। ওর আন্দোলনের সহযোদ্ধারা সিদ্ধান্ত নিল ওকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকায় নিয়ে যাবে উন্নত চিকিৎসার জন্য, কিন্তু ডাক্তাররা বললেন, এই অবস্থায় নেওয়া যাবে না, অবস্থা খুব খারাপ। আমার কষ্ট লাগা আরও বাড়তে থাকে, আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার সন্তানকে ফিরে পাবো কিনা। ৮ আগস্ট দুপুর গড়িয়ে যখন বিকাল এল, আমার রায়হানের অবস্থা খারাপ হতে থাকল। সন্ধ্যায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার রায়হানকে কবুল করে নিল। আমার রায়হানকে চিরতরে হারিয়ে ফেললাম।

শহিদ আলী রায়হানের মা মোছা: রুকসানা বিবি ছেলে হারানোর শোক এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি, আলী রায়হানের বিড়ালটার মাঝে ছেলেকে খুঁজে ফেরেন রুকসানা বিবি। তিনি বলেন, যেদিন আমার রায়হান ফোন করে বলতো মা আমি বাড়িতে আসব, ওইদিন সকালেই আমি রান্না করে বসে থাকতাম আর অপেক্ষা করতাম আমার রায়হান কখন বাড়িতে এসে মা ডাক দিবে। আমার ছেলে রায়হান ছিল আমার শান্তি, ও বাড়িতে আসলে আমাদের হৃদয় ঠান্ডা হয়ে যেত। পড়াশোনা করতো জন্য আমার বেটা অনেকদিন পর পর বাড়িতে আসতো। আর আমার রায়হান বাড়িতে এসে মা ডাক দিবে না। আমি রান্না করে ওর জন্য খাবার নিয়ে বসে থাকলেও আমার রায়হানকে আর পাবো না। আমার সোনার ছেলেকে ওরা কীভাবে গুলি করে মারল।

শহিদ সাকিব আনজুম: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক লড়াকু সৈনিক সাকিব আনজুম। অন্যদের বাঁচাতে গিয়ে নিজে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। রাজশাহী বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগ থেকে সদ্য মাস্টার্স শেষ করেছেন। ৫ আগস্ট সোমবার, রাজশাহী নগরীর তালাইমারি মোড় থেকে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে সাহেব বাজার এলাকার দিকে রওনা দেয়। সেই মিছিলে ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ্ হাসান নকীবসহ অনেক শিক্ষকও। মিছিলটি কিছুক্ষণ অতিবাহিত করার পর মিছিলে আওয়ামী লীগ নেতা ডাবলু সরকারের নেতৃত্বে গুলিবর্ষণ

শুরু হয়। শিক্ষার্থীরা প্রাণ বাঁচাতে দিগ্‌বিদিক ছড়িয়ে যায়। কিছু নারী শিক্ষার্থীর উপর আওয়ামী লীগ হামলা চালায়, এমতাবস্থায় শহিদ সাকিব আনজুম দৌড়ে গিয়ে একটা বাড়ির মধ্যে ওই নারী শিক্ষার্থীদের আশ্রয়ের জন্য চেষ্টা করেন, অধিকাংশ মেয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেলে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা দৌড়ে এসে সাকিব আনজুমকে গুলি করে, গুলি লেগে পেছনে ঘুরতেই খুব কাছ থেকে আরও একটি গুলি করে। তবুও সাকিব আনজুম ওই বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতে বসলে পেছন থেকে তাকে পিঠে নির্মমভাবে কুপিয়ে মারাত্মক আহত করে আওয়ামী হায়েনারা।

এরপর আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা বাড়িটি অবরুদ্ধ করে রাখে, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে সাকিব আনজুম একটা সময় নিস্তেজ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর উদ্ধার করে নেওয়া হয় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সাকিব আনজুম। ওইদিন শহিদ সাকিব আনজুমরা তিন ভাই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন, দুই ভাই ফিরে আসলেও ফেরেনি সাকিব আনজুম। সাকিব আনজুম খুব সাহসী ও পরোপকারী ছিলেন। তার মা রোকেয়া খাতুন বলেন, কিছুদিন আগে মার্কেটে গ্যাসের সিলিন্ডারে আগুন লাগে, সেখানে আমার সাকিব দৌড়ে গিয়ে আগুন নেভায়। ও আন্দোলনে যাওয়ার আগে আমি বলি, বাবা যদি কোনো বিপদ হয়? আমার সাকিব আমাকে বলে মা, কত মানুষ জীবন দিচ্ছে, আর আমি কি ঘরে বসে থাকতে পারি? আমার ছেলেকে যারা হত্যা করেছে আমি তাদের বিচার চাই, ডাবলু সরকারের ফাঁসি চাই।

সাকিব আনজুম বিবাহিত ছিলেন, তার স্ত্রী রাজশাহী কলেজে মাস্টার্স পড়ুয়া নিশাত সালসাবিল। কিছুদিন পরে স্বামী-স্ত্রীর একসাথে ডেনমার্কে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সবকিছু শেষ হয়ে গেল। স্ত্রী নিশাত কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমার স্বামী অনেক পরোপকারী ছিল। ও মাঝে মধ্যেই মানুষকে রক্ত দিত। ৫ আগস্ট ও আমাকে বলে, আমার নতুন জামা বের করে দাও, আমি ওটা পড়েই মিছিলে যাব। হয়তো সাকিব বুঝতে পেরেছিল ও শহিদ হবে, তাই নতুন পোশাক পরিধান করে আন্দোলনে গিয়েছিল।

শহিদ মো. মিনারুল ইসলাম: রাজশাহী নগরীর রাজপাড়া থানার গোলজারবার্গ মহল্লায় জন্ম মিনারুল ইসলামের। মিনারুলের বয়স যখন দুই বছর, তখন তার পিতা এনামুল হক মারা যান, ছোট থেকেই অনেক কষ্টে বড় হয়েছেন মিনারুল। তাই তো পড়ালেখাটাও বেশি দূর আগায়নি, ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিলেন ইউসেফ স্কুলে। এরপর শুরু করেন কর্মজীবন। মিনারুল ইসলাম ২০১৭ সালে বিবাহ করেন নূরে সম্পাকে। তাদের দাম্পত্য জীবনের ৭ বছরের মাথায় সন্তান সম্ভবা হন সম্পা। বিবাহের এত বছর পর সন্তানের মুখ দেখতে যাচ্ছেন, এই কারণে মিনারুলের যেন আনন্দের শেষ নেই। কত পরিকল্পনা তার সন্তানকে নিয়ে।

মিনারুল শ্রমিক ছিলেন; কাজ করছিলেন বেঙ্গল কোম্পানিতে। থাকতেন নারায়ণগঞ্জের একটি মেসে। মেসে থাকলে পালাক্রমে বাজার করতে হয়। সেদিন ছিল মিনারুলের বাজার করার দায়িত্ব। মেস থেকে ব্যাগ নিয়ে মিনারুল বাজার করতে বের হয়েছে, একটু যেতেই হঠাৎ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলি, সেই গুলি তার পেটে বিদ্ধ হলে মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মিনারুল। হাসপাতালে নিতে চাইলে উদ্ধারকারীদের মারধর করে স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা। হয়তো-বা তখন মিনারুলের চোখে ভাসছিল তার হবু সন্তানের স্মৃতি। এরপর দীর্ঘক্ষণ মাটিতে পড়ে থেকে মিনারুল অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা যায়।

মিনারুল যখন শহিদ হন তখন তার স্ত্রী নূরে সম্পা ৭ মাসের সন্তান সম্ভবা, সম্পা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, সন্তান একটু বড় হয়ে তার বাবাকে খুঁজবে, আমি তখন ওরে কী বলে বোঝাব যে তোমার বাবা পৃথিবীতে নেই। মিনারুলের কত ইচ্ছে ছিল বাবা ডাক শুনবে, আজ সন্তান পৃথিবীতে এসেছে, কিন্তু মিনারুল আর নেই। সন্তানকে নিয়ে হাজারো পরিকল্পনা ছিল ওর, তবে আমি আমার সন্তানকে বলতে পারব তোমার বাবা স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের একজন বীর শহিদ। তুমি শহিদের সন্তান।

মিনারুলের মা ডলি বাওয়া স্বামীকে হারিয়েছেন মাঝ বয়সে, বৃদ্ধ বয়সে এসে সন্তানকেও হারালেন। এরকম হাজারো মিনারুলের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি ২৪'র স্বাধীনতা।

এভাবেই ছেলে হারানোর শোক বুকে নিয়ে দিন কাটে শহিদ আলী রায়হান, শহিদ সাকিব আনজুম ও শহিদ মিনারুল ইসলামের পিতা-মাতার। অসহায় বয়স্ক পিতা-মাতা আজও সন্তানের রুমে গিয়ে না পেয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকেন। কাঁদতে থাকে শহিদ আলী রায়হানের পোষা বিড়ালটাও। এ রুম থেকে ও রুমে খুঁজে বেড়ায় রায়হানকে।

মো. তানভীর খান, ২য় বর্ষ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, সৈয়দ আমীর আলী হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রুদ্ধ শহরের মুক্তির লড়াই

সিফাত আবু সালেহ

কারফিউর দিনগুলো.. চারপাশ থমথমে। শহর যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে রেখেছে। পুলিশি অভিযান চলছে। বাসার বিদ্যুৎও চলে গেছে বিকালে, মিটারের ব্যালান্স যে শেষ। সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত। ৮ জন শুয়ে আছি বাসার ছাদে, যাবার জন্য নিরাপদ কোনো জায়গাও নেই। রাত ৩টা বেজে ৪৫ মিনিট। হঠাৎ, নিচে দরজা পেটানোর শব্দ। ঘুম ভেঙে গেল। পুলিশ নয় তো...!

কোটা নিয়ে শুরু হওয়া আন্দোলন তখন তীব্র আকার ধারণ করেছে। খুনি হাসিনার দীর্ঘদিনের ট্যাগিং-এর বিরুদ্ধে সারা দেশের ছাত্রসমাজ ফুঁসে উঠেছে; 'তুমি কে, আমি কে, রাজাকার-রাজাকার' স্লোগানে।

১৬ জুলায় শহিদ হলেন আবু সাঈদ ভাই। তার নিথর দেহ দেখে মনে হলো, এটাই কি আমাদের ভবিষ্যৎ? ফ্যাসিস্টদের বিদায় করা অবধি প্রকৃত মুক্তি নেই। এই উপলব্ধি যেন বুকের ভেতর গরম সিসার মতো ঢুকে গেল। তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম, সহযোদ্ধাদের ছেড়ে বাসায় বসে থাকা অসম্ভব। জেলা শহরের চেয়ে বিভাগীয় শহরের আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ। পরদিন ভোরেই রাজশাহী চলে আসলাম। যখন রাজশাহী প্রবেশ করছি অনেকেই তখন রাজশাহী ত্যাগ করছে।

জুলাইয়ের ১৯ তারিখ, গতকয়েকদিনে এতগুলো প্রাণ ঝড়ে গেল। তবুও ১ দফায় আন্দোলন গড়াচ্ছে না। যে জাতি এখনো তাদের মুক্তির পথ অনুধাবন করতে পারছে না, তাদের নিয়ে বিরক্তই হচ্ছিলাম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল। আন্দোলনের মিছিলগুলো ছোট হতে থাকল, কিন্তু আমরা কজন রয়ে গেলাম, লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।

২০ জুলাই, শুরু হলো কারফিউ। রাস্তা ফাঁকা, যানবাহন চলাচল বন্ধ, পুলিশ টহল দিচ্ছে। ক্যাশ টাকা শেষ, এটিএম, বিকাশ দুটোই বন্ধ। মেসে সবার অ্যাকাউন্টেই মোটামুটি টাকা আছে কিন্তু ক্যাশ নেই। সেকদিনে কিছুটা বুঝলাম দুর্ভিক্ষের সিনারিওগুলো কেমন হতে পারে। ৭৪'এ কী হয়েছিল কিছুটা অনুমান করলাম।

নেট নিয়ে যে নাটক মঞ্চস্থ করেছে ফ্যাসিস্টরা, আর নির্বিচারে আমাদের ভাই-বোনদের বুক ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে, হেলিকপ্টার থেকে গুলি করছে, বাড়ছে লাশের সারি। শুধু অফলাইন কলে যা কিছু তথ্য পাচ্ছিলাম। একটা নিউজ দেখার জন্য সকাল-সন্ধ্যা বসে থাকতাম সেলুনে। লাস্ট কবে যে টিভি দেখার জন্য এমন উদ্‌গ্রীব থেকেছি ভুলেই

গেছি। অবস্থা এই যে, নিউজ দেখার জন্য ওই ফ্যাসিস্টিদের পদলেহন করা মিডিয়াগুলোই ভরসা ছিল। তবু, যেটুকু পাই।

একদিন খবর পেলাম সতর্ক থাকতে হবে, পুলিশ অভিযান শুরু করবে। আমার কাছে দুই দফা সতর্কতা এল- যেহেতু মিছিলগুলোর উৎপত্তি স্থলই ছিল বিনোদপুর মণ্ডলের মোড়। কিন্তু কী আর করার, নিরাপদ জায়গার সঙ্কট। রাতে ছাদে থাকার ভয়ংকর সে অভিজ্ঞতা, তার উপর গুড়িগুড়ি বৃষ্টি। বাসার কারেন্ট চলে যাওয়ায় পরদিন রিচার্জ করতে তীব্র রোদের মধ্যে ১ সাইকেলে ৭ কিলোমিটার দূরে দুজনের কলাবাগান যাওয়া, বারংবার পুলিশি চেকিং... সবগুলো অভিজ্ঞতা ছিল বড়ই রোমাঞ্চকর।

কারফিউর এই অন্ধকার সময়ে একটু স্বাভাবিকতা আনতে বিকালে আমরা ক্রিকেট খেলতাম। চারপাশে টহলরত পুলিশের চোখ এড়িয়ে, এই খেলাগুলো যেন মুহূর্তের জন্য হলেও আমাদের মনে করিয়ে দিত, আমরা এখনো বেঁচে আছি। আমাদের সাথে রাবি শিবিরের তৎকালীন সভাপতি আব্দুল মোহাইমিন ভাই, সেক্রেটারি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ ভাইয়েরাও জয়েন করতেন মাঝে সাঝে। আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম কেমন হবে বলে দিতেন।

২৯ জুলাই মেন গেইট থেকে মাত্র ক'জনের 'শেইম শেইম ডিক্টেটর'[স্লোগান উচ্চারণ করা ছিল সারা দেশের নবাগত আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ। ২রা আগস্ট ক্যাম্পাসের ভেতর সাধারণ ছাত্রদের উপর গোয়েন্দা বাহিনীর হামলে পড়া রাবি প্রশাসনের ফ্যাসিস্ট প্রীতিরই তীব্র প্রতিফলন ছিল। সেইসাথে আমাদের সহযোদ্ধাদের, শিক্ষার্থী ভাই-বোনদের বীরত্ব কিংবা সকল মতের শিক্ষকদের খুনিদের বিরুদ্ধে একত্রিত হওয়া সকলকে করেছিল আরো উজ্জীবিত, আরো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আগস্টের ৩ তারিখ, অসহযোগ আন্দোলনে সারাদেশের ন্যায় রাজশাহীতেও সর্বস্তরের মানুষের রাজপথে নেমে আসা হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আরো বাড়িয়ে তুলেছিল। কারফিউয়ে স্তমিত হয়ে যাওয়া আন্দোলন অবশেষে পরিণতির দিকে যাচ্ছে, ১ দফা ঘোষণা করা হয়েছে।

ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ এবং তাদের দোসররা আন্দোলনকারীদের ঠেকানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে সশস্ত্র। ৪ আগস্ট ভোরবেলা, আমাদের বাসা (মেস) থেকে দুজন গেলাম লাঠির খোঁজে। এক বাঁশের দোকানে বললাম কিছু বাঁশ লাগবে, কত দিতে হবে। বুঝলাম তিনি এটার জন্য কোনো বিনিময় নিবেন না। এভাবেই দেশের সর্বস্তরের মানুষ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কোনো না কোনোভাবে অংশ নিয়েছিল।

বেলা ১১টায় আমরা উপস্থিত হয়ে গেলাম নির্ধারিত স্থান তালাইমারিতে। সম্মানিত শিক্ষকদের পরামর্শে বিশাল মিছিল যাত্রা করল ভদ্রার দিকে। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়ানোর

জন্য আমরা আর এগোলাম না। আন্দোলনকে আরো কিছুদিন দীর্ঘায়িত করাই তখন ছিল আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল।

সেদিন দুপুর ৩টা, যে ঘটনা অনেকের কাছে অজানা...

খবর এল ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা মেনগেট এবং বিনোদপুরে আক্রমণ চালিয়েছে। আমাদের কাছেও ম্যাসেজ এল, তাদের প্রতিরোধ করতে হবে। এমন কোনো অভিযানের সাথে পুরোপুরি অপরিচিত আমি। আমার বড় ভাইকে ফোন কলে জাস্ট এতটুকু বলে বাসা থেকে বের হলাম, "একটা অপারেশনে যেতে হচ্ছে। দোয়া করিও, আব্বা-আম্মাকে কিছু বলিও না।"

ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা সশস্ত্র অবস্থায়। আমরা ৫ জন হাতে একটা করে লাঠি আর ফল কাটা চাকু নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম নিজেদের প্রটেকশনের জন্য। রাবি শিবিরের আরো কিছু গ্রুপ একত্রিত হয়ে এক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিলাম। সেক্রেটারি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ ভাই এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মুজাহিদ ফয়সাল ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা বিনোদপুরের দিকে পৌঁছলাম ততক্ষণে তারা পালিয়ে গেছে।

৬ নয়, ৫ তারিখেই হবে ঢাকা অভিমুখে লং মার্চ - ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত। মনে আসা জাগালো হয়তো খুব শীঘ্রই ফ্যাসিবাদের পতন ঘটতে চলেছে তবে।

৫ আগস্ট কারফিউ চলছে। সকাল ১১টায় রাজশাহীর বিক্ষোভ সমাবেশ ডাকা হয়েছে রুয়েট গেট থেকে। সেদিন কারফিউ ভেঙে রাস্তায় নামার দায়িত্ব পড়েছিল আমাদের কজনের উপর উপর। গোসল করে দুরাকাত নামাজ পড়ে শাহাদাতের প্রস্তুতি নিয়ে বের হলাম। শত শত পুলিশ পেরিয়ে ১০:৪০ মিনিটে আমরা পৌঁছলাম রুয়েট গেটে। আমাদের পরপরই উপস্থিত হলেন রাবির অন্যতম সমন্বয়ক ও রাবি শিবিরের তৎকালীন ছাত্র আন্দোলন সম্পাদক নওসাজ্জামান ভাই। খবর পেলাম নর্দান এবং অক্সিয় মোড়ের ভেতরের দিকে দুটি বড় গ্রুপে আমাদের ভাইয়েরা অপেক্ষা করছেন। আমরা অবস্থান নিলাম রুয়েট গেটের ভেতরে।

১১:০২ মিনিট, আমরা ১৫ জনের মতো একটা টিম 'জ্বালো, জ্বালো' এবং '১ দফা'র স্লোগানে রুয়েট গেট থেকে বের হয়ে রাস্তায় অবস্থান নিলাম। বড় দুটি গ্রুপও এসে জয়েন করল। এভাবেই ৫ আগস্টের কারফিউ আমরা ভেঙে ফেললাম। ১২টা নাগাদ পুরো তালাইমারি লোকে লোকারণ্য। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, দিনমজুর সকল শ্রেণি পেশার মানুষ।

আমাদের সেদিনের অভিযান নির্ধারণ হয়েছিল আওয়ামী লীগ অফিস অভিমুখে। যখন আমরা আলুপট্টির কাছাকাছি পৌঁছলাম, ওদিক থেকে টিয়ারশেল নিক্ষেপ করা শুরু

হলো। রাবি শিবিরের তৎকালীন সেক্রেটারি জাহিদ ভাইয়ের সাথে দেখা হলে ভাই জানালেন মহানগর শিবিরের একটা টিম সামনে আছে, পেছনে আছে বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের আরেকটি টিম। আশ্বস্ত হলাম। প্রথমে সাধারণ ছাত্রদের একটা অংশ আতঙ্কে পিছে হটলেও আবার একত্রিত করার চেষ্টা করলাম। মুহুর্মুহু গুলি চলছে। আমার পাশেই ৩ জন ভাই হাতে-পায়ে গুলিবিদ্ধ হলেন। সশস্ত্র বাহিনীর সম্মুখ নিরস্ত্র ছাত্র-জনতা খুব একটা সুবিধা করতে না পেরে সবাই যখন পিছনে ফিরল, আমিও ফিরলাম তখন আমার চোখ সর্বশেষ দেখেছিল শহিদ আলী রায়হান ভাইকে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে। সম্ভবত এর পরপরই একটি বুলেট তার মাথা ভেদ করে।

শাহ্ মখ্দুম কলেজের পাশের গতিতে যখন প্রবেশ করলাম আমার পেছনে আর কেউ নেই। সেখানে আবারো সাথে পেলাম জাহিদ ভাইকে। অনেক বোনেরাও সেই গলিতে প্রবেশ করেছেন। একটু পরই দেখলাম গলির মুখে রামদা হাতে এসে ছাত্রলীগের এক ছেলে তার বাকি সহযোগীদের ডাকছে। তবে তারা সেই গলিতে ঢোকার সাহস করেনি।

আলুপট্টি থেকে নদীর ধার হয়ে তালাইমারি ফেরার অভিজ্ঞতাও ছিল এক ইতিহাস। কিছু বোনের লড়াকু মানসিকতা স্বচক্ষে অবলোকন করেছি। তালাইমারিতে যখন ফিরলাম তার কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর আসল খুনি হাসিনা পালিয়েছে। এই আনন্দ এবং আলী রাইহান ভাইয়ের শাহাদাতের সংবাদ (প্রাথমিকভাবে) চোখের অশ্রু হয়ে গড়ে পড়তে থাকল। রাস্তাতেই নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করলাম সকলে।

এরপর বিজয় মিছিল নিয়ে পুনরায় আলুপট্টি হয়ে পুরো রাজশাহী প্রদক্ষিণ একটা অবিস্মরণীয় স্মৃতি হয়ে থেকে যাবে। যখন অনেকগুলো রিকশায় বিজয় মিছিল নিয়ে রাবি শিবিরের সাথে তাকবির আর জয়ধ্বনিতে ক্যাম্পাসে ফিরছিলাম, এক ৩ বছরের ছোট্ট মেয়ে তার পরিবারের সাথে আমাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় প্রিয় মাতৃভূমির পতাকা উড়িয়ে বলল, "স্বাধীন বাংলাদেশ।"

নতুন বাংলাদেশে সকল বাংলাদেশপন্থিদের প্রয়োজন সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্য, সম্প্রতি। যেকোনো অনাচার, অবিচার. দুর্নীতি, ফ্যাসিবাদ কিংবা আধিপত্যবাদের পরাজয় ঘটাতে পারলে তবেই স্বাধীন বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হবে।

সিফাত আবু সালেহ, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই বিপ্লবের স্মৃতিময় দিনগুলো

আলিফ আল মুজাহিদ

জুলাই বিপ্লব জেনারেশন জেড-এর একটি অনন্য মাইলফলক। ফ্যাসিবাদী শাসকের দীর্ঘ পনেরো বছর শাসনে সাধারণ মানুষ গুম-খুন, গায়েবি মামলা, জেল-জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন, লুণ্ঠন, ধর্ষণের মতো নিয়মিত ঘটনায় অতিষ্ট হয়ে গেছিল। শুধু কি সাধারণ মানুষ, কোমলমতি শিক্ষার্থীরা পর্যন্ত এই স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের শোষণ-বঞ্চনায় জর্জরিত ছিল। যার ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক দল-মত-নির্বিশেষে সাধারণ মানুষজন যখন ব্যর্থ তখনি শিক্ষার্থীরা অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিপ্লবী হয়ে উঠে।

পবিত্র ইদুল-আজহার ছুটি শেষে জুলাই মাসের ১ তারিখ থেকে শুরু হয় কোটা সংস্কার আন্দোলন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে দল-মত-নির্বিশেষে পাবলিক, প্রাইভেট ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক সাধারণ শিক্ষার্থী এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। কারণ পতিত হাসিনা সরকার সরকারি চাকুরিতে কোটা নির্ধারণ করে শিক্ষার্থীদের সাথে তামাশা শুরু করে। কোটা সংস্কার আন্দোলন একটি দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসা আন্দোলন। ২০১৮ সালে সংসদের এক ভাষণে তাই বাধ্য হয়ে কোটা বাতিলের ঘোষণা দেয় পতিত স্বৈরাচার হাসিনা সরকার। কিন্তু ২০২৪ সালের জুন মাসে এসে পুনরায় সেই সরকারি চাকুরিতে কোটা হাইকোর্টের মাধ্যমে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে আমরা শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে শুরু করি, কোটা সংস্কারের জন্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

> কোটা না মেধা? মেধা! মেধা!
> সারা বাংলায় খবর দে, কোটা প্রথার কবর দে।
> বায়ান্নর বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই।
> ৭১-এর বাংলায় বৈষম্যের ঠাঁই নাই।

প্রভৃতি স্লোগান প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও এই কোটা সংস্কারের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ব্যাপক রূপ লাভ করে। আর এই আন্দোলনের পিছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। ১ তারিখ থেকে শুরু হওয়া আন্দোলনে ব্যানার, ফেস্টুন, মাইক ভাড়া করে নিয়ে আসতো রাবি শিবির শাখার দায়িত্বশীল ভাইয়েরা। এরপর মাইক ও আনুষঙ্গিক কাজের ব্যয় বাবদ আন্দোলনকারীদের থেকে কিছু টাকা উত্তোলন করতো। আমি একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনের শুরু থেকে ছিলাম। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ক্যাম্পাসে আন্দোলন চলমান ছিল। ধীরে ধীরে

বিশ্ববিদ্যালয় মেন গেট থেকে শুরু করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে যাওয়া রেলপথ অবরোধ শুরু হয়। কিন্তু এই আন্দোলন পণ্ড করতে কিছু বাম রাজনৈতিক ধারার শিক্ষার্থী সমন্বয়ক সাজে। পরবর্তীকালে তাদেরকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা বয়কট করে নতুনভাবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কমিটি গঠন করা হয়। যে কমিটিতে রাবি ছাত্রশিবির শাখার তৎকালীন ছাত্র আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক নওসাজ্জামানও ছিল। আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীরা আন্দোলনকে বিভিন্ন ডাইমেনশনে পরিচালনা করতে থাকি। যেমন, একদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে মিছিল নিয়ে দীর্ঘ এগারো কিলোমিটার পায়ে হেঁটে রাজশাহী ডিসি অফিসের কার্যালয়ে কোটা সংস্কারের জন্য স্মারকলিপি প্রদান করতে গেছিলাম।

আমাদের শান্তিপূর্ণ এই কোটা সংস্কার আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে সরকারের দাস পেটুয়া বাহিনী ছাত্রলীগ, পুলিশ, বিজিবি মাঠে নামায় হাসিনা সরকার। আমরাও তাদের শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিরোধ করতে বিপ্লবী হয়ে উঠি। আমরা বলতে থাকি- "আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম, সংগ্রাম।"

কাজী নজরুল ইসলাম ভাষায়,
ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।
এছাড়াও আরেক কবি আমাদের বিপ্লবের আহ্বান জানিয়েছেন-
দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে,
যেভাবে রুখে দাঁড়ায় আক্রান্ত দুর্বল
বিধ্বস্ত জাহাজ যাত্রীরা
আঁকড়ে ধরে ভাসমান পাটাতন
তেমনি একাগ্রতা নিয়ে
আমি আপনাদের আসন্ন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার কথা বলছি।

কবির কথার সাথে সুর মিলিয়ে আমরা বলেছিলাম, আমাদের কোটা সংস্কার আন্দোলন সফল করার জন্য সর্বদা রাজপথে থাকার প্রস্তুতি নিয়েছি।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৬ জুলাই আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রলীগকে বিতাড়িত করেছিলাম। এই দিনে রাবি ছাত্রশিবির শাখার প্রত্যেক জনশক্তি অংশগ্রহণ করেছিল। সেদিন প্রতিটি হলে গিয়ে ছাত্রলীগের আস্তানা গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেদিন রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী

শিক্ষার্থী আবু সাঈদ দুই হাত প্রসারিত করে পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দিয়ে শহিদ হয়েছিল। আমরা তখন থেকে স্লোগান শুরু করি,

বুকের ভেতর অনেক ঝড়,
বুক পেতেছি গুলি কর।

পরবর্তীকালে ১৭ তারিখেও যথারীতি আবু সাঈদ হত্যার বিচার ও কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করছিল সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ছাত্রশিবিরের জনশক্তিরা এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা সংঘবদ্ধ হয়ে সেদিন আন্দোলন চালাচ্ছিল। ছাত্রশিবিরের কয়েকটি গ্রুপ ক্যাম্পাসের প্রত্যেকটি প্রবেশ পথে পুলিশ ও ছাত্রলীগের হামলা থেকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য অবস্থান নিয়ে তথ্য সরবরাহ করেছিল। আমি স্টেশন বাজারে সেদিন বেশ কয়েকজন ভাইকে অবস্থান নিতে দেখেছিলাম।

কিন্তু সেদিন বিকেলে হঠাৎ করে ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা ক্যাম্পাস ও হল ত্যাগ করার জরুরি নোটিশ দেয় সরকারের তৎকালীন পুতুলমার্কা ভিসি গোলাম সাব্বির সাত্তার। এছাড়াও ক্যাম্পাসে পুলিশ, বিজিবি, সোয়াত সম্মিলিতভাবে রাবার বুলেট ও টিয়ারশেল মারে অভিযান চালায়। আমরা স্লোগান দিয়েছিলাম,

আমার ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দেবো না।
দিয়েছি তো রক্ত, আরও দেবো রক্ত।
রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়।

আমি হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী হলের একজন আবাসিক ছাত্র। কিন্তু হল প্রভোস্ট আমার জন্য কোনো আসন বরাদ্দ দিতে পারেনি তৎকালীন ছাত্রলীগের আধিপত্যের কারণে। আমি ছিলাম আমাদের হলের জিমনেসিয়াম রুমে। ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করার পর সবাই বাড়ি যাওয়া শুরু করে এবং প্রায় সবাই সেদিনই ছাত্রলীগের আক্রমণের ভয়ে হল ত্যাগ করে চলে যায় । আমি তখন বাধ্য হয়ে কিছু কাপড়চোপড় সাথে নিয়ে তৎকালীন রাবি ছাত্রশিবির শাখার সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের দায়িত্বশীলের বাসায় গিয়ে উঠি। এরপর ১৮ জুলাই থেকে শুরু হয় ইন্টারনেট শাটডাউন ও কারফিউ। আমি প্রায় এক সপ্তাহ সেই বাসায় অবস্থান করে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। ২৪ জুলাই ইন্টারনেট শিথিল করলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখি আবু সাঈদ, মুগ্ধসহ আরো অনেক শিক্ষার্থী জীবন দিয়েছে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা অনেকে তখন বাড়িতে। কিন্তু এই নির্বিচারে গুলি ও ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী হামলা সাধারণ শিক্ষার্থীদের আরো বিপ্লবী হতে উৎসাহিত করে। এলাকাভিত্তিক সবাই পুনরায় আন্দোলন জোরদার করে। ফলে পুলিশ শিক্ষার্থীদের গণ-গ্রেফতার শুরু করে।

আমি সেসময় গ্রেফতার এড়াতে ২৫ জুলাই রাবি ছাত্রশিবিরের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের বাসা থেকে এক স্যার এর বাসায় অবস্থান নিয়েছিলাম। যাহোক আমাদের আন্দোলন বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে চলছিল। সারা দেশে যখন মিছিল প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ২৯ জুলাই আমরা একটি মিছিল বের করি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন গেট থেকে। সেদিন শিবিরের জনশক্তিরায় মূলত মিছিলটি বের করেছিল। আমি আরও কয়েকজন মোল্লা স্কুলের মোড়, আমজাদের মোড় হয়ে বেতার মাঠ ও বরই বাগানের ভেতর দিয়ে সেদিন রাজপথে মিছিলের জন্য উঠেছিলাম। চতুর্দিকে পুলিশ, বিজিবি, সোয়াত, ডিবি তাদের সাঁজোয়া যান নিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে অবস্থান করছে। কিন্তু আমরা নির্ভয়ে সেদিন কিছু সাহসী শিক্ষকের উপস্থিতিতে মিছিল করেছিলাম। স্লোগান দিয়েছিলাম,

Shame! Shame! Dictator.

এভাবেই আমরা আমাদের আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং রাজশাহী শহরে। আমরা অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছিলাম কবির ভাষায়-

আমরা হারব না, হারব না
তোমার মাটির একটি কণাও ছাড়ব না
আমরা পাথর দিয়ে দুর্গ ঘাটি গড়তে জানি
তোমার ভয় নেই মা
আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।

অবশেষে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোটা সংস্কারের জন্য গঠিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে "এক দফা, এক দাবি" স্বৈরাচার হাসিনা সরকার-এর পতনের ডাক দেয়। যেখানে আপামর ছাত্রজনতা অংশগ্রহণ করে ৫ আগস্ট গণভবন থেকে বিতাড়িত করি ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে। মূলত জুলাই মাসে আন্দোলন শুরু হওয়ার কারণে এই স্বৈরাচার পতনের মাসকে ৩৬ জুলাইয়ে পরিবর্তন করে জুলাই বিপ্লব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অবশেষে আমরা স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়েছি ও দেশ থেকে হটিয়ে দিয়েছি কিন্তু তার রেখে যাওয়া দোসরদের জন্য আমাদের সংগ্রাম অবিরাম চলতে থাকবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ

আলিফ আল মুজাহিদ, ৪র্থ বর্ষ (২য় সেমিস্টার), রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৬ জুলাই ও সরকার পতনের আন্দোলন

আহম্মাদ মুন্সী

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে ঐতিহাসিক একটি দিন হলো ১৬ জুলাই ২০২৪। এই দিনে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, হলের অবৈধ সিট বাণিজ্যকারী শিক্ষার্থীদের একটি জঘন্য রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা)-কে বিতাড়িত করা হয়। তাদের বিতাড়িত করতে সম্মিলিতভাবে সাধারণ শিক্ষার্থী, ছাত্রশিবিরসহ অন্যান্য দলগুলো অংশগ্রহণ করে। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা সেদিন সফল হয়েছিলাম।

১৬-৭-২০২৪ তারিখের আগের ছোট বড় সকল আন্দোলনেই নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার চেষ্টা করেছি এবং অন্যকেও শামিল হতে উদ্‌বুদ্ধ করেছি। তবে ১৬ তারিখে যে মূল গেম আমাকেই খেলতে হবে তা জানা ছিল না, আলহামদুলিল্লাহ ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছে।

১৬ তারিখ আমারা একটা সংকটে ছিলাম এমন যে, ছাত্রলীগ হামলা করতে পারে এবং হলে হলে সাধারণ ছাত্রদের বাধা প্রদান করবে এমন শব্দ শোনা যাচ্ছিল। এই রকম পরিস্থিতিতে আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল ভিন্ন। আশ্চর্যের বিষয় হলো যখন আমাদের ৩০০ জনের একটা মিছিল বিনোদপুর থেকে ক্যাম্পাসে চলে যায়, ২০ মিনিটের মধ্যে দৃশ্যপট পালটাতে থাকে, একে একে জড়ো হতে থাকে রাবি, রুয়েট এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা। আনুমানিক ১০-১২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ঐদিন উপস্থিত থেকে আন্দোলনকে শক্তি জুগিয়েছে। আমাদের যেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল কোনো হলে যাবে না, কাউকে আঘাত করব না, কেউ যদি আসে তাহলে শুধু ডিফেন্স করবে। সেই ভাবেই সব চলছিল।

আমাদের মিছিল বিকাল ৩টায় শুরু হয়েছে, সকলকে জড়ো করতে করতে সাড়ে ৩টা বেজে যায়। আমার চিন্তা হলো আজকে বড় একটা সুযোগ আমরা যা চাইব তাই হবে, সেই মেসেজটা একটা গ্রুপেও সেন্ট করি।

ইতোমধ্যে মূল মিছিল শুরু হয়েছে প্যারিস রোড হয়ে মেয়েদের হলের সামনে দিয়ে সায়েন্স বিল্ডিংয়ের সামনে দিয়ে মেন গেটে আসার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

হঠাৎ করে সাংগঠনিক সম্পাদক মুজাহিদ ফয়সাল ভাইয়ের সাথে দেখা সাথে সাথে ভাইকে বললাম ভাই মিছিল কোন দিকে নেবেন, ভাই আগের সুরেই কথা বললেন। আমি পরামর্শ দিলাম ভাই আজকে সুযোগ এসেছে এর মধ্যে ভাই বলল জিয়া হলে ২ জনকে মেরে আটকে রাখছে। আমি বললাম ভাই মিছিল ঐ দিকে নিতে হবে। মিছিল যখন কুদরতে খোদা বিল্ডিংয়ের সামনে আসে তখন আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলছিল। তারা আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাবে, যখন আমরা হলের দিকে নিয়ে যেতে চাইলাম, তখন তারা বাধা দেয়। তখন পর্যন্ত সমন্বয়করা আমাদেরকে খেয়াল করেনি, যখনি

দেখতে পেল তখন আমি এবং ভাইয়ের নির্দেশনায় হলের দিকে মিছিল ঘুরিয়ে দেই এবং সবাই ঐদিকে এগুতে থাকে। ইতোমধ্যে দেখি জিয়া হলের সামনে থাকা লোকগুলো একে একে দূরে চলে যাচ্ছে। এটা দেখে ধাওয়া দিলে তারা দেওয়াল টপকে পালিয়ে যায়।

শুরু হয় একের পর এক হলে হলে অভিযান, শহীদ জিয়াউর রহমান হল, মাদার বখ্শ হল, সোহ্‌রাওয়ার্দী হল, শাহ্ মখ্‌দুম হল, আমীর আলী হল, নবাব আব্দুল লতিফ হল, মতিহার হল, শেরে বাংলা হল এবং বঙ্গবন্ধু হল (বর্তমান বিজয়-২৪ হল)।

শুধুমাত্র শহীদ হবিবুর রহমান হল এবং জোহা হলে যাওয়া হয়নি। এর পর মিছিল নিয়ে মেন গেটে চলে আসি এবং কিছুক্ষণ মহাসড়কে অবস্থান করে ১৬ তারিখের কর্মসূচি শেষ করি।

মাগরিবের পরপরই একটা ভয়েস ম্যাসেজ আসে এবং সেটাতে বলা হয় যে, যারা হলে থাকে অথবা মেসে থাকে তারা সতর্কতার সাথে থেক। রাজশাহী মহানগর থেকে ২-৩ হাজার আওয়ামী লীগ, যুবলীগ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসের দিকে আসতেছে। এটা শুনে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে, কোনো রকম রাতটি যাপন করে এবং সকালে ৬৫% ছাত্র-ছাত্রী নিজ নিজ জেলায় রওয়ানা দেয়।

শুরু হয় ১৭ জুলাইয়ের ঘটনা। ১৬ তারিখ রাতে প্রশাসন কর্তৃক ঘোষণা আসে সকল হল এবং অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলো।

১৬ তারিখ রাতেই সিদ্ধান্ত হলো ১৭ তারিখে প্রতিবাদ সমাবেশ হবে। ১৭ তারিখ সকাল ৯টায় যথারীতি সমাবেশের আয়োজন শুরু হয়। এর আগে বলে রাখি ১৬ তারিখে হবিবুর রহমান হলে কোনো অ্যাটাক করা হয়নি। আমি গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারলাম এই হলে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র আছে। ১৭ তারিখ সকালে আবার প্রতিবাদ সমাবেশ উক্ত হলের সামনে থেকেই শুরু হয়।

তখন আমি কিছু ছাত্র নিয়ে হলের দিকে যাই এবং আমাদের দেখে আরো অনেকে যায়। ঐ হল থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। নতুন বানানো রাম দা, রড, স্টাম্প ইত্যাদি। ঐদিনের ঘটনায় সেকেন্ড ব্লক থেকে কে যেন ভিডিও করে, সেখানে আমাকে বার বার দেখানো হচ্ছে। এটা দেখে পরিচিত মানুষ ফোন দিচ্ছে যাতে আমি সতর্ক থাকি।

যাহোক ঐদিনের প্রতিবাদ মিছিল রাত পর্যন্ত গড়ায় এবং ভিসি স্যারের কাছে বিভিন্ন দাবি দাওয়া করা হয়। যখন প্রশাসন দাবি মানতে নারাজ তখন পুরো প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও এবং অবরুদ্ধ করে রাখা হয়।

কোনোভাবেই দাবি মেনে না নিলে একটা পর্যায় প্রশাসনিক ভবনের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হয়। দিন গড়িয়ে যখন প্রায় সন্ধ্যা নেমে এল তখন প্রশাসনের ইশারায় পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিজিবি ক্যাম্পাসে ঢুকে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর হামলা চালায় এতে অসংখ্য

ছাত্র-ছাত্রী হামলায় আহত হয়। একাধারে প্রায় ২ ঘণ্টা এই হামলা চালানো হয়। একটা পর্যায়ে যখন ছাত্র-ছাত্রী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় তখন ভিসি স্যারসহ সকলে প্রশাসন ভবন থেকে বেড়িয়ে আসে।

পর দিন থেকে মনে হয়েছিল জনমানবশূন্য ক্যাম্পাস। সবাই নিজ নিজ মায়ের কোলে ফিরে যায়।

রাজশাহী তথা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাই ১৭-২৯ তারিখ পর্যন্ত আন্দোলন-বিহীন সময় পার করে।

২৯ জুলাই সারা বাংলাদেশব্যাপী দেওয়া কারফিউ ভাঙ্গার আন্দোলন। এই ২৯ তারিখের আন্দোলনে সর্বপ্রথম মাঠে নামে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। সারা দেশে নেটওয়ার্ক বিচ্ছিন্ন। আন্দোলনের সময় দেওয়া ছিলো সকাল ১১টায় কিন্তু নেট না থাকায় সকলকে জড়ো করতে বেগ পেতে হয় আরো ৩০ মিনিট। সবাই একে একে মেন গেটের সামনে বড়ই বাগানে জড়ো হই, সেখান থেকে মিডিয়া আমাদেরকে বার বার ফলো করে আসছিল। সর্বশেষ আন্দোলন শুরু হয় ১১:৩০ মিনিটে। ২৯ জুলাই আমাদের আন্দোলনকে ঘিরে পুলিশ র‍্যাব, সেনাবাহিনী, বিজিবি চারদিকে ঘিরে ধরেছে। উনারা আমাদেরকে নিচ থেকে উপরে উঠতে বাধা দেননি, তবে উনারা দ্রুত প্রোগ্রাম শেষ করার জন্য বার বার অনুরোধ করে। প্রশাসন এত বেশি ছিল যে উনারা যদি আমাদের উপর আক্রমণ করতেন তাহলে উনারা তিন জনে আমাদের একজনকে ভাগে পেত। আল্লাহর খুবই রহমত যে, যখনি আমরা আশঙ্কা করছিলাম তখনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষক আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হন এবং আমাদের শক্তি দ্বিগুণ হয়ে গেল। পরবর্তীকালে মেন গেটে অল্প কিছুক্ষণ অবস্থান কর্মসূচি করে বিনোদপুরের দিকে মিছিল নিয়ে চলে যায়। ওখানে গিয়ে ঐ দিনের কর্মসূচি শেষ করা হয়। এই দিনের মিছিলের সংবাদ (যমুনা টিভি) মাধ্যম থেকে ফুটেজ দেখে আমার ছবি স্ক্রিনশট নিয়ে ছাত্রলীগের সেলে দেওয়া হয় এবং আমাকে শিবিরের চিহ্নিত ক্যাডার হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। শুধু তাই নয় এই আন্দোলনে শুধুমাত্র শিবির অংশগ্রহণ করেছে তার প্রমাণ করার চেষ্টা করে।

পরদিন ৩০ জুলাই ক্যাম্পাসের ভিতরে আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সেখানে মেন গেট থেকেই প্রশাসন আন্দোলনকারীদের বাধা প্রদান করতে থাকে। যখন আন্দোলনকারীরা ক্যাম্পাসের ভিতরে ঢুকে তখন থেকে কী যে পৈশাচিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পুলিশ, প্রশাসন নির্যাতন করেছে তা সকল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক বর্তমান এবং সকল স্তরের অভিভাবক মহল তার চিত্র দেখে মর্মাহত হয়েছেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে মারতে মারতে জেলখানা পর্যন্ত ধরে নিয়ে যায়। পরবর্তীকালে কয়েকজন শিক্ষক থানায় গিয়ে রাতের মধ্যে শিক্ষার্থীদের ছাড়িয়ে নিয়ে আসে।

এরপর আবার কিছু দিন অর্থাৎ ৩০ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত রাজশাহীর আন্দোলন বন্ধ ছিল। তবে ৩০ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট তারিখ পর্যন্ত পরিকল্পনা করা হয় কীভাবে আন্দোলন গতিশীল করা যায়। এর মধ্যে ছাত্রজনতা এবং আপামর জনসাধারণদের উদ্দেশ্যে আন্দোলনের ডাক আসে এক দফার। এক দফার দাবিতে ৪ তারিখ সবাই বাহিরে বেড়িয়ে আসে। ঐদিন মেন গেট থেকে তালাইমারি, তালাইমারি থেকে রেলগেট পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশের মধ্য দিয়ে আন্দোলন শেষ করলেও ৫ তারিখ চূড়ান্ত দিন সেদিন সংঘর্ষ হয়।

৫ তারিখ সকাল ১১টা থেকে আন্দোলন শুরু হবে, ঠিক তার পূর্বেই প্রস্তুতি নিয়ে বেড়িয়ে পড়ি নির্দিষ্ট স্থানে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির মিছিলের পিছন দিক দিয়ে প্রোটেকশন দেবে। আর মহানগরী সামনে থাকবে। ঠিক সেভাবেই আন্দোলন শুরু হলো। ঠিক ১১টায় রুয়েট গেট থেকে তালাইমারি জুড়ে সবাই অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে। এদিকে ঢাকার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন তাই ঐ সময় তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও কঠিন ছিল।

এর পরে ১২:৩০ মিনিট পর্যন্ত রুয়েট গেট এবং তালাইমারি সংলগ্ন রাস্তায় অবস্থান করি। ঠিক ১২:৩০ মিনিটের পর সাহেববাজার জিরোপয়েন্টের উদ্দেশ্য রওয়ানা দিই। এখানে ছাত্র জনতার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রশিবির এবং মহানগর ছাত্রশিবির মিছিলের সামনে এবং পিছনে ছিল। ছাত্রজনতা মিছিলের মধ্যে ছিল।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিম পিছনে ছিলাম। সামনে মহানগর ছিল। এভাবে আগাতে থাকি ছাত্রজনতাকে সামনে নিয়ে বাজারের দিকে। আমাদের মিছিল যখন শাহ্ মখ্দুম কলেজের সামনে পৌঁছেছে। তখন আওয়ামী সন্ত্রাসীরা পুলিশ প্রশাসনসহ আমাদের উপর হামলা করে। এতে স্পটে শাহাদত বরণ করেন সাকিব আঞ্জুম ভাই, আমার ঠিক দুই হাত সামনে ছিলেন আলী রায়হান ভাই। ভাইয়ের মাথায় গুলি লাগে এবং তাকে মেডিকেলে নিয়ে যান। এর পরে আমরা অস্ত্রের মুখে আর দাড়াতে না পেরে পিছু হটতে থাকি। শাহ্ মখ্দুম কলেজের পূর্ব পাশের একটা গলি দিয়ে প্রায় হাজার খানেক লোক আমরা ঢুকে পরি। সামনে আগাতে থাকলে শ্মশান ঘাটে গিয়ে সবাই আটকা পরে যাই। শ্মশান ঘাটের যে দেওয়াল তা মুহূর্তেই টপকানো কঠিন ছিল। একটা দেওয়াল টপকে বিপরীত পাশে নামার সুযোগ ছিল না। একটা দেওয়ালের উপরে উঠে আবার আর একটা দেওয়াল টপকাতে হয়েছে। আমাদের সাথে কয়েকটা মেয়েও ছিল খুব কষ্ট করে ওনাদেরকে পার করে দেওয়া হয়। আমি দেখলাম এই দেওয়াল টপকাতে যেই সময় লাগবে এর মধ্যে যদি পিছন থেকে আক্রমণ হয় তাহলে সব কচুকাটা হয়ে যাব। তখন তৎক্ষণাৎ মাথায় এল দেওয়াল একটা টপকাব দুইটা টপকাতে সময় বেশি লাগবে। তখন পুরো একতলা একটা বাড়ি টপকায়ে ওখান থেকে বের হই। এরপর সামনের দিকে

আগাতে থাকি, আবার সামনে থেকে আক্রমণ করছে। আমি পাশে একটা গলি পাই ঐ গলি দিয়ে সামনে আগাই এবং সামনে পাই ত্রিমোহনী। সেখানে একজনকে জিজ্ঞেস করি ভাই এই দিকে যাওয়া কি নিরাপদ? উনি বলে ঐদিকে যাওয়ার দরকার নাই আপনি আমার বাসায় চলে আসেন। আমি ভদ্রলোকের সাথে উনার বাসায় যাই। বাসায় গেলে হালকা নাস্তা খেতে দেয়, আমি ফ্রেশ হয়ে জোহর নামাজ পড়লাম। নামাজ শেষ করলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা কল আসে এক বড় ভাইয়ের, উনি আমাকে বলে মুন্সী ভাই কোথায় আছেন, হাসিনা পালাইছে, সেনাপ্রধান ২টায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন। তখন সাথে সাথে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তখন আর ঐ বাসায় আমার মন মানছে না। দ্রুত আবার নিজের পোশাক পরে বের হই। এই দিকে সবাই তালাইমারিতে অবস্থান করছে, বিজয় মিছিল করছে, আমি এখানে শামিল হই। এরপর রাজশাহী শহরে বিজয় মিছিল নিয়ে প্রদিক্ষণ করি। রাতে ক্যাম্পাসে এসে শুকরানা নামাজ আদায় করলাম সম্মিলিতভাবে।

জুলাই বিপ্লবের এই আন্দোলনের বড় অস্ত্র ছিল বাবার সাহস, মায়ের ভয় এবং আশার বাণী। বাবা বলতেন আন্দোলনে যাবি সবাই একত্রে, ঐক্যবদ্ধভাবে যাবি। মা বলতেন রাত বিরাতে একা একা বের হইস না।

বিজয়ের অর্থাৎ ৫ আগস্টের পরে দেশে যেই অস্থিরতা বিরাজ করছিল তখন মা ফোন দিয়ে কান্না করে দেয়, আমি ঠিক আছি কিনা, বার বার একটা কথাই জিজ্ঞেস করে। আমি সান্ত্বনা দিই।

জুলাই বিপ্লবের শুরুতেই অনলাইন অফলাইনে নিজেকে সক্রিয় রাখার চেষ্টা করেছি। ফেসবুকে ছোট ছোট কবিতা লিখে পোস্ট করতাম যাতে আমাকে যারা চিনে জানে তারা যাতে হতাশ না হয় এবং তারা যেন আন্দোলনে জাগ্রত হয়।

১৬ জুলাই ফেসবুক পোস্ট :
নতুন সূর্য উদয়ের অপেক্ষায়।
চলে আসুন, বেরিয়ে পড়ুন, সেই সূর্যের স্বাদ নিতে। মুক্ত করতে আমার দেশ, আপনার জন্মভূমি। ফিরে পেতে আপনার অধিকার। হটাও স্বৈরাচার।
চলে আসুন বিকাল ৩টায় প্যারিস রোড রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
জাগো বাহে কোনঠে সবাই।
আমি থাকছি, দেখা হবে ইনশাআল্লাহ।

আরও একটি পোস্টে লেখি-
ওরে ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
তোরা আয় দল বেধে আজ।
নতুন রূপে ফিরবে ক্যাম্পাস,

তোরা সব নতুন সাজে সাজ।
টিকবে নাকো তোদের তেজে
স্বৈরাচারের কোনো কাজ।
গোলামির সূত্র থেকে যদি চাস বের হতে!
তবে আজ চলে আয় ময়দানে,
ঐক্য করে হাতে হাত।
তাহলেই মিলবে মুক্তি, ছাত্র জনতা ঐক্য থাক।

১৭ জুলাই ফেসবুক পোস্ট.:.....
বাড়িতে যাওয়ার সময় এখন না, এখন শুধু ময়দানে থাকার সময়।

ফেসবুক পোস্ট ৩০ জুলাই :.....
যারা ৫২, ৬২, ৬৬, ৬৯, ৭১ এবং ২০১৮ এর ইতিহাস জানে, তারা ভয় নাহি করে।
ভয় কীসের?
ভয় করিলে আসবে কি বিজয়!
ভয় নাহি,...নাহি ভয়,
মিথ্যা হইবে ক্ষয়,
সত্য লহিবে জয়।
মেধাবীরা আনবেই আনবে
মুক্তির বিজয়।
পিছিয়ে থেকো না বন্ধু, শামিল হও মেধাবীদের কাতারে, গৌরবের আসনে।
তেশরা আগস্ট পোস্ট :...
বেড়িয়েছে সেনানীরা রুখবে কে তারে!
বিজয়ের সুবাতাস বইছে অন্তরে।
চৌঠা আগস্ট পোস্ট :.....
বেরিয়ে পড়লাম নতুন ভোরের আশায়।

এভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার চেষ্টা করেছি এবং আনন্দের বিষয় হচ্ছে আমি আন্দোলনে গিয়ে স্মৃতি হিসেবে কোনো ছবি তুলি নাই এমনকি ছবি তোলার মতো ফিলিংস কাজ করেনি। শুধু একটাই কাজ করছে এই লড়াইয়ে জিততে হবে।

আহম্মাদ মুন্সী, ৩য় বর্ষ, উর্দু বিভাগ, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাইয়ে বিকল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদের ভূমিকা

হাসান হৃদয়

রাবিতে যখন জুলাই আন্দোলনের কর্মসূচিগুলো নিয়মিত চলছিল তখন আন্দোলনে কেমন যেন পানসে পানসে ভাব বিরাজ করছিল। ঠিক ওই সময় রাবির আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক মেহেদী সজীব, ইমরান হাসানকে চিনতো একজন সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে। সেই সুবাদে ইমরান হাসানের সাথে যোগাযোগ করেন এবং আন্দোলনের পানসে ভাব দূর করার জন্য ভিন্ন কিছু করার কথা বলে আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে বলেন। তখন ইমরান হাসান বিষয়টি কথন আবৃত্তি সংসদের পরিচালক আলফাজ উদ্দিন টনিককে অবগত করান এবং আলফাজ উদ্দিন টনিক বিকল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদের সাবেক নাট্য বিভাগ পরিচালক সালাউদ্দিন আম্মারকে ডেকে নিয়ে আন্দোলনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

আন্দোলন চলাকালীন সর্বপ্রথম সাংস্কৃতিক কার্যক্রম করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তা দেখে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম করায় উদ্‌বুদ্ধ হন। রাবির আন্দোলনে সর্বপ্রথম যে গানটি গাওয়া হয় তা 'কোটার ঐ লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট' যা কারার ঐ লৌহ কপাট গানটির লিরিকে কারার স্থলে কোটার ব্যবহার করে গাওয়া হয় এবং গানটি গেয়েছিল তৎকালীন সংগীত বিভাগ পরিচালক ইমরান হাসান। একে একে এভাবেই গান, কবিতা আবৃত্তি, স্লোগানের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের পানসে ভাব কাটিয়ে আন্দোলন চলছিল দুর্বার গতিতে। গানগুলো বেশিরভাগই ছিল প্যারোডি গান যেমন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোটারে তুই খাইলি আমার দেশ চাকরি বাকরি না পাইয়া হইলাম আমি শেষ, 'বুবুজান বুবুজান আপনি ভারত চইলা যান' ইত্যাদি গানকে প্যারোডি গেয়ে আন্দোলনে বিনোদন যুগিয়ে আসছিল বিকল্পের সংগীত শিল্পীরা।

সর্বপ্রথম রাবিতে একটি নাটিকা প্রদর্শন হয়ে গোটা বাংলাদেশে সাড়া জাগায় রাবির আন্দোলন। নাটিকাটির নাম ছিল 'জীবন্ত লাশ' নাটিকাটির গল্প ভাবনা করেন সালাউদ্দিন আম্মার, ইমরান হাসান এবং আলফাজ উদ্দিন টনিক এবং নাটিকাটির অভিনয়ে ছিল সালাউদ্দিন আম্মার, ইমরান হাসান, আলফাজ উদ্দিন টনিক, নাজমুল হক আশিক। এর পরবর্তী আরো একটি একক নাটিকা প্রদর্শন করে সাড়া ফেলে সালাউদ্দিন আম্মার নাটিকাটির নাম ছিল 'ডাক পিয়ন'। এভাবেই আন্দোলনে শক্তি যুগিয়ে আসছিল বিকল্পের শিল্পীরা।

রাবির আন্দোলনে সর্বপ্রথম স্লোগান দেয় বিকল্পের শিল্পী আলফাজ উদ্দিন টনিক। পরবর্তীকালে প্রায় সময়ই বিভিন্ন মজাদার মজাদার স্লোগান দেয় সালাউদ্দিন আম্মার

যেমন উল্লেখযোগ্য একটি স্লোগান হলো 'আমার নেই দাদার কোটা আমার পকেট ফাঁকা ফাঁকা এরকম বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে আন্দোলনের মাঠ পরিচালনা করেছিল বিকল্পের সাবেক নাট্য শিল্পী সালাউদ্দিন আম্মার। এভাবেই আম্মার শিক্ষার্থীদের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হিসেবে নিজের জায়গা পাকা করেন।

আন্দোলনের ভূমিকায় বিকল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদের শিল্পীরা শুধু সাংস্কৃতিক কার্যক্রম-ই নয় আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক হিসেবেও কাজ করেছিল! এর মধ্যে ইমরান হাসান এবং আলফাজ উদ্দিন টনিক অন্যতম। এরকম যুগে যুগে যত নোংরা ফ্যাসিবাদের উত্থান হবে তাকে রুখে দিতে বিকল্প সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংসদ দৃঢ় ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

হাসান হৃদয়, ২য় বর্ষ, আরবী বিভাগ, শহীদ জিয়াউর রহমান হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

অন্যরকম জুলাই

উজ্জ্বল তঞ্চঙ্গ্যা

অনেকদিন হলো ক্যাম্পাসে বসে চা খাইনি। ব্যাচের সবারই পরীক্ষা চলছে। টানা দু'মাস পরীক্ষার পর একটু স্বস্তি পাচ্ছি। মনে হচ্ছে যেন আমার ঘাড় থেকে আমার দেখা সবচেয়ে বড় পাথরটি কেউ চাপিয়ে রেখেছিল। পরীক্ষা শেষ করে বাড়ি যাওয়া হয়নি। আমার বাড়ি যাওয়া নিয়ে অনেকে হতাশ। বছরে দু'বার কিংবা একবার যাওয়া হয়। এবারেও যাব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

হল থেকে বের হয়ে বন্ধুদের ফোন দিলাম। কিন্তু সবাই ব্যস্ততার কারণে আমার অনিয়মিত চায়ের আড্ডায় এল না। সুমনকে ফোন দিলাম - ক্লাবের মিটিং চলছে। এত বড় ক্যাম্পাসে নিজেকে কেন জানি অসহায় লাগছে। বের হতে না হতেই দেখি চারপাশে কেউ আড্ডা দিচ্ছে, কেউ প্রেমের গভীর আলাপনে হারিয়ে যাচ্ছে কিংবা কেউ সাহিত্য চর্চায় মগ্ন। দোকানে এসে মামাকে চা দিতে বললাম চিনি কম করে। সচরাচর আমি মামা বলে ডাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। ক্যাম্পাসের চায়ের দোকানে যেন চিনির কোনো মূল্যই নাই। ঠিক আমার মতো। চিনি কম করে দিতে বলি কিন্তু মুখে দেওয়ার পর সেই একই পরিমাণ চিনি। ডায়াবেটিস থাকলে রোগী দু'দিনেই মারা যাবে।

একা একা বসে ক্যাম্পাসে চা খাওয়া যেন আমার নিজেকে পৃথিবীর নির্মম বেদনার দৃশ্য মনে হয়। পাশে বসা দুজন বড়ভাই কী যেন বলাবলি করছে। একটু কান পেতে শুনলাম। ঢাকায় কোটা আন্দোলনে সড়ক অবরোধ নিয়ে কথা বলছে ইঙ্গিত করলাম। ২০১৮ সালে কোটা আন্দোলন ২৪ সালে এসে আবার নতুন রূপ নিয়েছে।

হঠাৎ সৈকতের সাথে সাক্ষাৎ হলো। দু'দিন আগে হলে সিট পেয়েছে পলিটিক্সের মাধ্যমে। বাবা নেই। মায়ের সামান্য রোজগারে তাঁদের সংসার চলে। ছোটবোন এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। ক'দিন আগে আমার টিউশনি দিয়ে দিলাম। বড্ড মায়া হয় আমার ওর প্রতি। ক্যাম্পাসে শত সৈকত আছে যাদের হলে ২২ টাকায় খাওয়ার পয়সা জুটে না। যাদের চারটি বছর পার করা যেন জীবনের সবচেয়ে একটি কঠিন সময়। বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার শিক্ষার্থীদের পেছনে ফেলে চান্স পাওয়া যতটা সহজ তারচেয়ে বোধহয় হলে আবাসিকতা পাওয়া যেন তার চেয়ে আরো বড্ড বেশি কঠিন।

- হলে কী ঝামেলা হচ্ছে? (চা খেতে খেতে প্রশ্ন করলাম)

- বন্ধু আর বলিস না (চেহারায় খানিকটা ক্লান্তির ছাপ নিয়ে)। দু'দিন আগে সিট একটা ম্যানেজ করলাম। এখন অনেক প্যারাই আছি দোস্ত। কী করব বলতো? না পারছি বাইরে ম্যাসে থাকতে না পারছি হলে একটু শান্তিতে থাকতে। রোজ রোজ আমার ল্যাব, সিটি, ক্লাস, প্রেজেন্টেশন ফেলে আমি ক্যাম্পাসে হাততালি দিয়ে সময় কাটাব কীভাবে!

- আচ্ছা, ব্যাপার না বন্ধু আমি আছি চিন্তা করিস না। চা খাবি একটা? টেনশন দূর হয়ে যাবে।

- তুই তো জানিস বোধহয়, কোটা আন্দোলনে সারাদেশের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছে।

- হ্যাঁ, আজকে জানলাম একটু আগে।

- হলে যাদের মাধ্যমে উঠেছি তাঁরা আমাকে প্রেসার দিচ্ছে আন্দোলনে যেন না যায়। এখন আমাদের যৌক্তিক দাবি আমরা না গিয়ে থাকতে পারি বল?

- আচ্ছা, শুন একটা কথা মনে রাখিস। সত্যের জয় হবে। তুই চিন্তা করিস না, বন্ধু।

- তাহলে আজকে উঠি। আমাকে বড়ভাই ডেকেছে। আন্দোলনের ব্যানার, পোস্টারের কাজ বাকি আছে মেলা।

চায়ের বিল দিতে গিয়ে কানে স্লোগানের আওয়াজ বাজল। সরকারের পক্ষে এক দল টুকিটাকির দিকে এগোচ্ছে। ভাবলাম আজকে গন্ডগোল হতে পারে। এক পরিচিত ভাই ফোনে রিং দিয়ে টুকিটাকি চত্বরে যেতে বলল। সপ্তাহখানিক আগে কমিটি হয়েছে। আবাসিক হলে একটা ভালো পদ পেয়েছে ভাই। গিয়ে ভাইদের সালাম দিলাম। এক বৃদ্ধ এসে ক্ষমা চাচ্ছে দেখলাম। বয়স ষাটের কাছাকাছি বোধহয়। ক্যাম্পাসে চায়ের দোকান থেকে যা আয় হয় তা দিয়েই সংসার চলে। দোকান হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়ায় অসহায় দেখা যাচ্ছে চোখেমুখে। অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে হলের দিকে আগালাম। ফেসবুক স্ক্রল করতেই গিয়ে দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার গ্রুপে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আগামীকাল সারাদেশে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা বাতিলের কর্মসূচি পালন করা হবে। ফোন চার্জে দিতে না দিতেই বাড়ি থেকে রিং এল। দেশের পরিস্থিতি জানতে পেরেছে হয়তো।

- হ্যালো, মা কেমন আছ?

- হ্যাঁ, আমি ভালো। শুনলাম তোমাদের ঐদিকে ঝামেলা হচ্ছে?

- না, মা, ঢাকায় হচ্ছে। এখানে আন্দোলন হচ্ছে দেখলাম শুধু।

- কোথাও বের হয়ো না তুমি। সবসময় চিন্তায় থাকি তোমাকে নিয়ে। গতকালও স্বপ্নে দেখলাম তোমাকে।

কথা বলা শেষ হতে না হতেই কল কেটে গেল। হয়তো ফোনে ব্যালেন্স শেষ। মনটা ছটফট করছে বাড়ির জন্য। বছরে দু'বার বাড়ি যাওয়া হয়। এতদূর পথ বাড়ির কথা মাঝেমধ্যে ভুলেই যায়।

১৬ জুলাই। দিনটি ছিল মঙ্গলবার

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে সময় কাটাব বলে ছাদে পা বাড়ালাম। মাথার উপর দু'টো কাক উড়িয়ে গেল। লক্ষণ তেমন একটা ভালো মনে হলো না। কথিত আছে কাক যদি কা কা শব্দ করে তাহলে মানুষ মারা যায়। ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। ক্লাস বন্ধ থাকার কারণে অলস জীবন যাপনের সাথে পরিস্থিতির বেড়াজালে অস্থির লাগছে। ক্যাম্পাসে বের হলাম মনটা কিছুটা হালকা করার জন্য। টুকিটাকি হতে প্যারিস রোদে পা বাড়িয়ে আবারও একই স্থানে চলে আসলাম। ঘড়ির কাটার দিকের সাথে একটার পর একটা কর্মসূচি দেখা যাচ্ছে। সরকার দলীয় একদল ক্যাম্পাস চক্কর খেতে না খেতেই সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিশাল প্রতিবাদ কর্মসূচি শুরু হয়ে গিয়েছে। আমরা ক'জন হলের চারতলায় ছিলাম। ভয় কাজ করছে। যদি আমাদের সরকার দলীয় ট্যাগ লাগিয়ে মারতে আসে সেই ভয়ে কাতর হয়ে জ্বালানার ফাঁকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দেখছি। শুনলাম সরকার দলীয় ছাত্রদের ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করেছে। পুরো ক্যাম্পাস আন্দোলনে মুখরিত। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে অধিকারে কথোপকথন। তালাইমারি যাওয়ার পথে সৈকতের সাথে হঠাৎ দেখা। দেখে চিনতে পারিনি। ভেবেছিলাম আমার এই প্রথম চোখে সমস্যা দেখা দিয়েছে কিনা। হাতে একটি হ্যান্ড মাইক, কপালে পতাকা, বুকে ঠাঁই পেয়েছে চেঁ গুয়েভারা। অধিকার যখন কেউ কেড়ে নেয় তখন মানুষ প্রতিবাদী হয়ে উঠেড় তা আমি সৈকতকে দেখেই বুঝে গেলাম।

কর্মসূচিতে ভিসির বাসভবন ঘেরাও করার ফলে ক্যাম্পাসে পুলিশ, বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। প্যারিস রোদ সেদিন বিপ্লবীদের পায়ের ছাপে ভরে গিয়েছিল। পরিস্থিতি খারাপের দিকে এগোচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য আবাসিক হল ছাড়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের একতা ভাঙনের সূত্র অ্যাপ্লাই করছে তা শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে পারল। তবে আমাদের বাড়ি ক্যাম্পাস থেকে ৫৫০ কিলোমিটারের বেশি। এমন একটা পরিস্থিতির বেড়াজালে আমরা ক'জন বাড়িতে রওনা হলাম। যাওয়ার সময় সৈকতের সাথে মুঠোফোনে দু'টো মিনিট কথা হয়েছিল। তারপর কথা নেইড় নেই যোগাযোগ, নেই ইন্টারনেট, দেখা নেই সাক্ষাৎ নেই। ছিল কেবল খবরাখবরের গণমাধ্যম।

৫ আগস্ট। সোমবার

রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। একটি অচেনা নাম্বার থেকে ফোন আসে। গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলাম এটা কেউ না সৈকত। সরকার পতনের খবর যদিও গণমাধ্যম থেকে জানতে পেরেছি। দ্বিতীয়বার সে আমাকে অতি আনন্দের সাথে জানায়। ফোনে কথোপকথন হলেও তার চোখেমুখে আনন্দের ছাপ দেখতি পাচ্ছি। চারদিকে পাহাড় আর জলরাশির উপর ভেসে শহরের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি। চারিদিকে লাশের গন্ধে মেলা দিন পর প্রকৃতির সুবাতাস পাচ্ছি।

উজ্জ্বল তঞ্চঙ্গ্যা, ৩য় বর্ষ, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, মতিহার হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শহিদ

নাজিব ওয়াদুদ

সিল মাছের মতো থলথলে চর্বিসর্বস্ব এক মহিলা হক ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনে বেরুলেন। বড় কষ্ট তার নিজেরই দেহখানি বহনে। একটা রিকশার আশায় রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ালেন তিনি। পা ঘেঁষটে ঘেঁষটে তার সামনে গিয়ে হাত বাড়াবে বলে সিদ্ধান্ত নিল আব্দুল মিয়া। নিজের দুরবস্থার কথা ভেবে, তার থেকে নিষ্কৃতি কামনায় তিনি হয়তো কিছু দিতেও পারেন। কেননা মহিলার মুখে-চোখে শুধু অসহায়তা নয়, এক ধরনের মায়ামাখানো আভাও জ্বলজ্বল করছে। এ রকম মানুষ দয়ালু ও দানশীল হয়ে থাকে। সে ওঠার জোগাড় করছিল। তখনি হঠাৎ লোকজন পড়ি-মরি করে ছোটাছুটি শুরু করে দিলো। বাজারে লোকজন এমনিতেই কম। বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের আন্দোলন চলছে। সারা দেশ অচল। ছাত্ররা 'লং মার্চ টু ঢাকা' ঘোষণা করেছে। রাজধানীতে মানুষের ঢল নেমেছে। চারিদিক থেকে মানুষ ছুটেছে গণভবনের দিকে– 'এক দফা এক দাবি, হাসিনা তুই কবে যাবি।' স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন সেটা।

গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলছে এই আন্দোলন। শুরু চাকরিতে কোটা প্রথা সংস্কারের দাবি দিয়ে। সরকারের লোকেরা ছাত্রদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে লাগল। স্বয়ং হাসিনা তাদেরকে 'রাজাকারের বাচ্চা' বলে গালি দিল। ছাত্ররাও কম যায় না। তারা স্লোগান দিতে লাগল– 'তুমি কে, আমি কে? রাজাকার, রাজাকার। কে বলেছে, কে বলেছে? স্বৈরাচার, স্বৈরাচার।' শুরু হলো হুমকিধমকি, নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, ও নির্যাতন। গ্রেপ্তার চলতে লাগল নির্বিচারে। দেড় যুগের নিপীড়নে অতিষ্ঠ জনগণ হতাশ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এবার তারা ছাত্রদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সকল শ্রেণির মানুষ রাস্তায় নামল। গুলির সামনে বুক পেতে দিতে এতটুকু দ্বিধা করছে না কেউ। সারা দেশে একই অবস্থা। তবে ঢাকা অগ্নিগর্ভ।

আজকে কিছু একটা ঘটবে। হয় এস্পার না হয় ওস্পার। সরকার পুলিশ, বিজিবি, আর্মি, এবং দলীয় ও ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের নিয়ে প্রস্তুত। ছাত্র-জনতাও একাট্টা। গোটা দেশ আতঙ্কে থরথর।

রাজশাহী শহরের পরিবেশও থমথমে। দোকানপাট অধিকাংশই বন্ধ। কেবল অটো আর রিকশা চলে কিছু কিছু।

লোকজনের ছোটাছুটি দেখে সতর্ক হলো আব্দুল। সাহেববাজার বড় মসজিদের বারান্দা একেবারেই ছোট আর অপ্রশস্ত। কিছু লোক ইতোমধ্যেই সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সে-

ও একটা ফাঁকে গিয়ে আশ্রয় নিল। উত্তরে জিরো পয়েন্ট একশ হাত দূরে। সেখানে সকাল থেকে এক পাল বর্মধারী সশস্ত্র পুলিশ অবস্থান নিয়েছে। এখন শ' দুয়েক গুন্ডা-পান্ডার এক ঝটিকা মিছিল এসে হইহই-রইরই শুরু করে দিলো। তাদের হাতে ইয়া বড় বড় ছোরা, কিরিচ, রামদা, পিস্তল, আর কাটা রাইফেল। মোড়ের ওপর দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে থাকল তারা– 'রাজাকারের আস্তানা জ্বালিয়ে দাও পুড়িয়ে দাও। শেখ হাসিনা ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই।'

এরা গত এক মাস থেকে রোজই এভাবে মহড়া দিচ্ছে। মণিচত্বর থেকে কল্পনার মোড় পর্যন্ত। বাকি শহর আন্দোলনকারীদের দখলে, গত কদিন থেকে তারা রুয়েটের সামনে কাজলা অঞ্চল মোড় থেকে তালাইমারি মোড় পর্যন্ত রাস্তার ওপর সমাবেশ করছে, তারপর মিছিল নিয়ে শহর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনো বড়-সড় দুর্ঘটনা এখনো ঘটেনি।

–'আজ মুনে হচ্ছে গন্ডগোল বাধবে। ভালোই-ভালোই সটকে পড়াই ভালো।' একথা বলে লোকটা সত্যি-সত্যিই সটকে পড়ল। তার কথা এবং আচরণ আরো অনেকের ওপর আছর করল। একে একে সবাই চলে গেল মসজিদের বারান্দা ছেড়ে।

দোকান-পাট দু'চারটা যা খোলা ছিল সব শটাশট বন্ধ হয়ে গেল।

আব্দুল ভেবে পাচ্ছে না এখন তার কী করা উচিত। একটা মারামারি-গোলাগুলি মনে হয় সত্যিই বাধবে। এদের কাছে হয়তো খবর আছে। তাই রোজকার চেয়ে পুলিশ-বিজিবি-সন্ত্রাসীর সংখ্যা আজ দ্বিগুণেরও বেশি। তাছাড়া সরকারি পান্ডারা আজ অন্য দিনের তুলনায় বেশি অস্ত্রসজ্জিত। এর আগে ওরা হেসে-খেলে গল্প-গুজব করে সময় কাটাত। কিন্তু আজকে যেন যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছে। কেউ কেউ গাড়িতে করে আসছে আবার চলে যাচ্ছে অন্য কোথাও। ওদের কাছে হয়তো কোনো খবর আছে।

উঠে দাঁড়াল আব্দুল। তারও চলে যাওয়া উচিত, ভাবল সে। কেননা ভিক্ষা চাওয়ার মতো লোক আর নেই রাস্তায়। গত কিছুদিন ধরে এরকমই হচ্ছে। তার আয়-রোজগারে টান ধরেছে। আর কতদিন যে চলবে এরকম কে জানে। কম তো দেখল না আন্দোলন। সরকারের নির্যাতন-নিপীড়নের কাছে বিরোধীরা শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তবে এবার পরিস্থিতি একটু ভিন্ন মনে হচ্ছে। মানুষ মরছে তবু রাস্তা ছাড়ছে না। তবু সবকিছু অনিশ্চিত এখনো। ঢাকায় হয়তো ম্যাসাকার হয়ে যাবে আজ। দু'পক্ষই যে রকম অনড়, হাজার হাজার লাশ পড়ে যেতে পারে। সবখানে এই আলোচনাই সবার মুখে।

খোঁড়া পা টেনে টেনে চলতে লাগল সে। হাঁটাহাঁটি করতে বেশ অসুবিধে হয় তার। থেমে থেমে হাঁটতে হয়। জিরো পয়েন্টের মোড় এড়িয়ে পুরনো রাস্তা ধরল আব্দুল। সবচেয়ে ভালো হতো ফুদকি পাড়া হয়ে নদীর ধার দিয়ে যাওয়া। কিন্তু ওদিক দিয়ে

অনেক হাঁটতে হবে। সেটা পারবে না সে। কুমারপাড়া মোড়ে বড় রাস্তায় উঠে রিকশা পাওয়া যেতে পারে। না পেলেও ধীরে ধীরে হেঁটে বাসায় চলে যেতে পারবে কোনো রকমে। তার বাসা, বাসা তো নয় জীর্ণ কুটির, সেটা পঞ্চবটি এলাকায়, শাহ্ মখ্দুম কলেজের পাশে, নদীর ধারের বস্তিতে।

কুমারপাড়া মোড়ও পুলিশ-বিজিবি এবং সন্ত্রাসীদের দখলে। কোনো রিকশাও দেখছে না। –কী রে বা রে! যুদ্ধ হবে নাকি? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে আব্দুল। একবার সে মনে করল এসব সন্ত্রাসীদের সামনে দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। বরং কুমারপাড়ার ভেতর দিয়ে একেবারে শাহ্ মখ্দুম কলেজের সামনে গিয়ে পৌঁছবে। কিন্তু সেটা হবে ঘোরা পথ। তার মতো পঙ্গু মানুষের পক্ষে এতটুকু বাড়তি দূরত্বও বড় কষ্টের। সে মনে মনে ভাবল, যাই, দেখি কী করে। আমি পঙ্গু, ভিখিরি মানুষ, আমাকে কিছু বলবে না। আবার ভাবে, বিশ্বাস নেই এদের। এরা পারে না এমন কোনো কাজ নেই। যা দেখছি, শুনছি, এরা জানোয়ারেরও অধম।

আলুপট্টি মোড়ে পৌঁছে একটু বসল আব্দুল। আর পারছে না সে। এদিকে একটা রিকশাও নেই। অন্য কোনো যানবাহনও চলছে না। এই মোড়টা একেবারেই সুনসান।

কখনো এভাবে হেঁটে যাতায়াত করে না সে। মানে পারে না। আজ তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। রোদও বাড়ছে, তার তাপে সে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। দৈনিক বার্তা ভবনের ধাপির ওপর বসল সে। দুই হাতে পা ডলতে লাগল। হঠাৎ গুম-গুম শব্দে সচকিত হলো আব্দুল। আওয়াজটা আসছে পুব দিক থেকে, অর্থাৎ তাদের পঞ্চবটির দিক থেকেই। ধীরে ধীরে আওয়াজের তীব্রতা বাড়ছে। মনে হচ্ছে অনেকগুলো মানুষ সমস্বরে কিছু বলছে, মানুষ সমবেতভাবে জিকির করলে যেমন হয় তেমন শব্দ। এখান থেকে পুবে কল্পনা সিনেমা হলের মোড় ছাড়িয়ে শাহ্ মখ্দুম কলেজের সামনেটা পর্যন্ত দেখা যায়। কিছু নেই। কিন্তু শব্দটা আসছে ওদিক থেকেই।

শব্দের তত্ত্বতালাশ থাকল পড়ে, কেননা দেখতে দেখতে বারো-চৌদ্দ জন অস্ত্রধারী লোক রাস্তায় বেরিয়ে এল। ওরা আশপাশে আড়ালে লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ। তারা এখানে-সেখানে যুদ্ধের মতো পজিশন নিলো। পশ্চিম দিক থেকে বড় সড়ক ধরে মিছিলের মতো এগিয়ে এল আরো একদল। আলুপট্টি মোড়ে এসে তারা দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে ঢুকে পড়ল– একদল দক্ষিণে নদীর দিকে, আরেক দল উত্তরে বোয়ালিয়া থানার দিকে।

পুব দিক থেকে আওয়াজটা এগিয়ে আসছে। এতক্ষণে বোঝা গেল সেটা শত-সহস্র মানুষের স্লোগানের শব্দ। শাহ্ মখ্দুম কলেজের সামনে সে মিছিলের মাথা দৃষ্টিগোচর হলো। হাজার হাজার মানুষের মিছিল। তরুণ, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, কিশোর, নারী, কে নেই এ

মিছিলে! কারো কারো হাতে লাঠি, কারো লাঠির আগায় পতাকা। কারো মাথায় লাল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। মিছিলের মাথা যখন কল্পনার মোড় পেরুল তখন আলুপট্টির মোড়ে উত্তর আর দক্ষিণ দিক থেকে অস্ত্রধারীরা এগিয়ে এল। এরই মধ্যে পুলিশ-বিজিবিও এগিয়ে এসেছে পশ্চিম দিক থেকে। মিছিল আলুপট্টির মোড়ে আসতে না আসতেই পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ল। মিছিল থমকে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু পারল না। পেছনের হাজার হাজার মানুষের চাপে সে মিছিল বাঁধভাঙ্গা বন্যার তোড়ের মতো ঠেলে এগোতে লাগল। লুকিয়ে থাকা অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা বেরিয়ে এল। তারা গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। মিছিলের ক্ষোভ বেড়ে গেল। লোকজন চারদিকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল। কিন্তু মিছিল থামে না। পুলিশ মুহুর্মুহু সাউন্ড গ্রেনেড এবং কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে শুরু করল। মিছিল তবু এগিয়ে আসতে থাকল। তখন পুলিশ-বিজিবি সদস্যরা এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করতে লাগল।

আব্দুল এসব দেখে এতটাই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল যে পালানোর কথা তার মনেই আসেনি। যেন ভারতের দক্ষিণী অ্যাকশন সিনেমা দেখছিল মুগ্ধ হয়ে।

পুলিশ-বিজিবির মুহুর্মুহু গুলির মুখে মিছিল ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করল। মানুষের ছোটাছুটি, চিৎকার-চেঁচামেচি, মেয়েদের কান্না, আহতদের আহাজারি, আর সাউন্ড গ্রেনেড, কাঁদানে গ্যাস এবং গুলির শব্দে নারকীয় অবস্থা।

আতঙ্কে পাথর হয়ে গিয়েছিল আব্দুল। এই শহরের প্রাণকেন্দ্রে ওঠাবসা তার। মিছিল-মারামারি তার কাছে নতুন নয়। কিন্তু এরকম নিষ্ঠুরতা দেখেনি সে কখনো। তার হাত-পা হিম হয়ে গিয়েছে। তার হৃৎপিণ্ডও যেন ভয়ে চলতে ভুলে গিয়েছে। চোখ জ্বলছে কাঁদানে গ্যাসের জ্বালায়।

এইবার তার মনে হয় এখন পালানো দরকার। যেকোনো মুহূর্তে গুলি এসে লাগতে পারে। পশ্চিমে তার বাড়ির দিকে যাওয়া সম্ভব নয়। এত গোলাগুলি সত্ত্বেও মিছিলকারীরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। কল্পনা মোড় থেকে শাহ্ মখ্দুম কলেজ ছাড়িয়ে পঞ্চবটি পর্যন্ত তারা ইট-পাটকেল ছুঁড়ছে। কল্পনার মোড় রক্তে লাল হয়ে উঠেছে।

পুবের দিকেও যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ পুলিশ-বিজিবি আর সন্ত্রাসীরা সেদিকটা দখল করে রেখেছে। এখনো তারা থেকে থেকে সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ার শেল, আর গুলি ছুঁড়ছে। দুই পক্ষে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলছে।

আলুপট্টি মোড় থেকে দক্ষিণে নদীর দিকে যাওয়াই নিরাপদ হবে, ভাবল আব্দুল। নদীর ধার দিয়ে বাড়ি পৌঁছানো যাবে। ওদিকে নিশ্চয়ই মারামারি হবে না। আহা, প্রথমেই যদি

ওদিকে যেত তাহলে এই বিপদের মধ্যে পড়ত না সে। পঙ্গু মানুষ, হাঁটাহাঁটি করা তার জন্যে যথেষ্ট কষ্টকর, সেজন্যে সোজা পথ ধরেছিল। সে পথে যে এমন দুর্গতি অপেক্ষা করছে তা কি সে আগে অনুমান করতে পেরেছিল! রাজনৈতিক মারামারি ও তাড়াতাড়ি এর আগে সে সাহেববাজার এলাকাতেই হতে দেখেছে। আজকের বিষয়টা অভিজ্ঞতার বাইরে।

দৈনিক বার্তা ভবনের ধাপি ছেড়ে উঠল আব্দুল। কিন্তু একটা-দুটা ধাপ নেমেছে কী নামেনি, মিছিলকারীরা ধাওয়া দিয়ে একেবারে সামনে চলে এল। পুলিশ-বিজিবি-সন্ত্রাসীরা পিছিয়ে যেতে থাকল। তাদের সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ার শেল, গুলি, কিছুই আন্দোলনকারীদের ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না।

হাজার হাজার মানুষ। বেশির ভাগেরই খালি হাত। কারো হাতে লাঠি, ইটের টুকরা। কারো কারো কাপড়ে লাল লাল রক্তের ছোপ। হয়তো তারা নিজেরাই আহত, বা আহতদের রক্ত হয়তো তাদের গায়ে লেগেছে। স্লোগান দিচ্ছে তারা– এক দফা এক দাবি, হাসিনা তুই কবে যাবি। রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে অন্যায়।

হঠাৎ যেন বজ্রপাত শুরু হলো। এক সঙ্গে শত-সহস্র বজ্রপাত। তার তীব্র আওয়াজে কান ফেটে যাওয়ার উপক্রম। আর মিছিলের মানুষ আর্ত-চিৎকার করতে-করতে জ্ঞানহারার মতো দিগ্‌বিদিক ছুটতে লাগল। সন্ত্রাসীরা আগে থেকেই ওঁৎ পেতে ছিল উত্তর ও দক্ষিণ দিকে। এবার তারা তিনি দিক থেকে আক্রমণ চালাল মিছিলের ওপর। সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ার শেল, আর গুলির বর্ষণ শুরু হতো। সম্মিলিত আক্রমণের মুখে নিরস্ত্র মানুষ রাস্তায় দাঁড়াতে পারছে না। তারা পিছু হটতে লাগল। কত মানুষ যে আহত হল তা গুণে শেষ করা যাবে না। রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে রক্তাক্ত মানুষ। ওর মধ্যেই আহতদের ধরাধরি করে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ।

এরকম ছোটাছুটি আর ধাক্কাধাক্কির মধ্যে পড়লে তার গুলি খাওয়ার দরকার পড়বে না, মানুষের পায়ের চাপে পিষ্ট হয়েই মারা যাবে সে, ভাবে আব্দুল। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও একেবারেই নিরাপদ নয়। যখন-তখন একটা গুলি এসে তাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে যাবে। সুতরাং এখান থেকে তাকে সরতেই হবে। বার্তা ভবনের দেওয়াল ঘেঁষে কোনো রকমে ছুটন্ত লোকজনের ধাক্কা সামলে এগোতে থাকল আব্দুল। থামছে আর এগোচ্ছে, যেন কোনো পাহাড়ের এবড়ো-খেবড়ো ঢাল বেয়ে চলেছে সে।

খুব দ্রুত রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল। মিছিলকারীরা পিছিয়ে চলে গেছে পুবে। রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে শত শত স্যান্ডেল, জুতা, লাঠি, টিয়ার শেলের খোল, আর ইটের টুকরা।

বার্তা ভবনের উত্তর-পশ্চিম কোনে পৌঁছতেই আব্দুল দেখতে পেল একজন মানুষ কাতরাচ্ছে। পড়ি-মরি করে ছুটে গেল সে। বসে পড়ল তার পাশে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর

বয়স হবে ছেলেটার। তাজা রক্তে লালে লাল তার জামা-কাপড়। –আমাক্ বাঁচান ভাই, দুহাই আল্লাহর! আমাক্ বাঁচান।

কোত্থেকে যেন জোর পেল আব্দুল। সে তাকে জাপটে ধরল। –ভাই, সাহুস ধরেন। শরীলে বল আনেন।

শরীর-মনের সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাকে তুলে ধরে বসাল সে। এলিয়ে পড়ল সে তার কোলের ওপর। –ভাই, আমাক্ বাঁচান।

বিচলিত হয়ে পড়ল আব্দুল। সে চেঁচাতে লাগল। –কে কুত্থে আছ গো, আসো এদিক্। ছেলিডা মর‍্যা য্যাছে। রেকশা ডাকো।

তার হুঁশ নেই যে এখানে এখন রিকশা পাওয়া যাবে না। কোনো মানুষের সাহায্য পাওয়াও মুশকিল। কিন্তু এসব যুক্তি বা বোধ তার মাথায় এখন কাজ করছে না।

রক্তে ভেসে যাচ্ছে ছেলেটার শরীর, পিচঢালা পথ। –ভাই, আমার বাড়ি বাদুড়িয়া। আমার বুড়ি মা আর ছুটু একটা বইন আছে। মিইয়ে আসছে ছেলেটার কণ্ঠ।

–বাঁচান, বাঁচান, কে আছেন বাঁচান! আব্দুল চেঁচাতে লাগল।

কয়েকজন পুলিশ আর সন্ত্রাসী ছুটে এল তার চিৎকার শুনে। তাদের দেখে সে হাউ-মাউ করে কেঁদে ফেলল। –ভাই, বাঁচান ভাই। ছেলিডা মর‍্যা য্যাছে। হাসপাতালে লিয়্যা চলেন।

একজন এসে প্রথমে তার ওপর লাথি চালাল। তারপর সবাই মিলে। রাইফেল এবং লাঠিও চলল। নিথর হয়ে গেল ছেলেটার দেহ। নেতিয়ে পড়ল সে-ও। উন্মত্ত উল্লাসে ফেটে পড়ল তারা। আশপাশে ছুটে বেড়াতে লাগল আরো শিকারীর আশায়।

আব্দুল মনে করতে পারছে না সে কোথায় আছে, বা কী করছে।

আজ সকাল থেকেই তার মন কেন যেন বড় অস্থির হয়ে ছিল। ভোরের সেই স্বপ্নটাই বোধ হয় তার কারণ। মনে মনে সে কথাই সে ভাবল। আসলে স্বপ্নটা আজ সারাদিন তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে।

ফজরের নামাজ সে পঞ্চবটি মসজিদেই পড়ে। তারপর আর বাড়ি ফেরে না, একটা রিকশা বা অটো ধরে সোজা সাহেববাজার বড় মসজিদে পৌঁছে। বারান্দাটা ঝাঁট দেয়। তারপর সেখানেই একপাশে শুয়ে-শুয়ে ঝিমায় আর দোয়া-দরুদ পড়ে সকাল পর্যন্ত। কিন্তু আজ কী যে হয়েছিল শরীরটা এলিয়ে পড়ল। এভাবে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে টের পায়নি আব্দুল। স্বপ্ন দেখছে সে। যেন তার গ্রামের বাড়িতে আমগাছটার নীচে দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই তাদের পারিবারিক কবর। সেখানে শুয়ে আছে দাদা-দাদি, চাচা, বাপ-

মা, আরো অনেকে। ভোরের আলো তখনো ভালো করে ফোটেনি। আবছা আঁধারে ছেয়ে আছে চরাচর। হঠাৎ দেখল কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার বাপ। সেই বাবরি চুল, মুখভর্তি দাড়ি, লম্বা কাঠামোর শ্যামলা রঙের মানুষটি। আলো-আঁধারিতে খুব স্পষ্ট দেখা না গেলেও নিজের পিতাকে চিনতে তার কোনো অসুবিধে হয় না। বাপ তাকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকছে। কী এক সম্মোহন যেন তাকে টেনে নিয়ে গেল। বাপ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর তার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল। সে অবাক হয়ে দেখল কবর কোথায়, এ যে একটা সুড়ঙ্গ! কিন্তু তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। তার ভয় করতে লাগল। তার মনে হলো সে তো মরেনি! তাহলে সে কবরের ভেতর যাবে কেন? কিন্তু বাপ তার হাত ধরে আছে। কিছুতেই সে হাত ছাড়াতে পারছে না সে। শুরু হলো টানাটানি। তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার শরীরে দরদর করে ঘাম ছুটেছে। বুকের ধড়ফড়ানি আর থামতে চায় না।

তারপর থেকে তার মন কেবলি ওই স্বপ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। কাজে মন বসছিল না। কাজ আর কী! সেই তো মানুষের সামনে হাত বাড়িয়ে ধরা। অনুনয়-বিনয় করে করুণা ভিক্ষা করা। কাজটা এত লজ্জার, এত অপমানের, এত ঘৃণার তবু করতে হয়। কিশোর বয়সে শহরে পালিয়ে এসে জীবনের তাগিদে কী-ই না করেছে সে। শেষ পর্যন্ত রিকশা ধরেছিল। একবার একটা ট্রাক তাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়েছিল। জীবন বাঁচলেও তার পাটা পঙ্গু হয়ে গেল। সেই থেকে বেঁচে থাকার জন্য তাকে ভিক্ষাবৃত্তির এই ঘৃণ্য পথ বেছে নিতে হয়েছে।

আব্দুলের বাপ ছিল একজন সাধারণ, ছোট-খাট কৃষক। জমি-জমা ছিল সামান্যই। তার বুদ্ধি হবার আগেই তার মায়ের মৃত্যু হয়। সংসার সামলাতে বাপ আরেকটা বিয়ে করে। সৎ মা তাকে সহ্য করতে পারত না। তবু চলে যাচ্ছিল তার দিন। কারণ বাপ তাকে ভালোবাসত তার প্রাণের চেয়েও বেশি। কিন্তু সেই বাপও একদিন মরে গেল। তখন তার বয়স দশ-এগারো। সৎ-মা তার একমাত্র ছেলে ও আব্দুলকে নিয়ে চলে গেল ভাইদের কাছে। সেখানে তাকে চাকরের ভূমিকায় নামানো হলো। ভাগ্যের পরিণতি না মেনে উপায় ছিল না আব্দুলের। কারণ এই পৃথিবীতে আশ্রয় দেওয়ার মতো স্বজন তার আর কেউ ছিল না। কিন্তু সৎ-মামাদের অত্যাচার দিন দিন এত বাড়ল যে তা আর সহ্য হচ্ছিল না। একদিন সে প্রতিবাদ করল। তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে সবাই মিলে তাকে বেদম পিটাল। রাগে-ক্ষোভে উন্মাদ হয়ে সেই রাতে সে তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে গেল। ঘুরতে ঘুরতে এই রাজশাহী শহরে এসে ভিড়ে গেল ভাসমান মানুষের দলে। এখন তার আফসোস হয়। আর কিছুদিন অত্যাচার সইলে হয়তো তার সামনে সুদিন আসতে পারত। একটু বড় হয়ে চলে যেতে পারত নিজ গ্রামে, পৈত্রিক ভিটায়। কিছু জমি-জমা পেত। খেটে-খুটে জীবন চালিয়ে দিতে পারত। তার অনেকবার মনে

হয়েছে সে ফিরে যাবে গ্রামে। কিন্তু ভয়ে পারেনি। কে জানে আগুনে কার কী অবস্থা হয়েছে। নিশ্চয়ই তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। গেলেই পুলিশে ধরবে তাকে। তারপর সোজা জেলখানা। তার চেয়ে এই মুক্ত জীবন, তা যত কষ্টেরই হোক, অনেক ভালো। তার আর গাঁয়ে ফেরা হয়নি। ধীরে ধীরে সব ভুলে গেছে সে। শুধু ভুলতে পারেনি তার বাপকে। তার কবরের পাশে গিয়ে ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে হয় তার। মনে হয় তাতে হয়তো বাপের প্রশস্ত রোমশ বুকের ওম সে অনুভব করতে পারত।

জীবন থেকে এতগুলো বছর খসে গেল একটা একটা করে, প্রতিদিনের এক-একটা ওয়াক্তের মতো... বাপকে তার কত মনে পড়ে, দরদে বুক পোড়ে, কতদিন ইচ্ছে জেগেছে তাকে দেখার... একটা দিন যদি স্বপ্নে দেখতে পেত! কিন্তু কোনো দিন তা হয়ে ওঠেনি। আজ হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে বাপকে স্বপ্নে দেখে তার মনের মধ্যে উথালিপাথালি শুরু হয়েছে। তার বাপ ছিল খুব সরল-সোজা প্রকৃতির, ভালো, পরহেজগার মানুষ। বাপের চেহারা তার এখন ভালো করে স্মরণও হয় না। তবু স্বপ্নে দেখে তাকে সে ঠিকই চিনতে পেরেছে। এখনও তার আবছা আদল তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ মনে হলো তার বাপ তাকে ডাকছে, ভোরের ওই স্বপ্নের মতো। সে শিশুর মতো হাঁচড়-পাচড় করে হাত বাড়িয়ে দিলো, কিন্তু বাস্তবে সে হাত তুলতে পারল না। পুলিশ আর সন্ত্রাসীদের লাথি আর পিটুনিতে তার দুই হাতই ভেঙ্গে গেছে। হাত তুলতে গিয়ে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব হলো। আর তাতেই তার ঘোর কেটে গেল। দেখল সে পড়ে আছে রাস্তার ওপর। পাশের ছেলেটা আর নড়ছে না।

কতক্ষণ রাস্তার ওপর এভাবে পড়ে থাকল আব্দুল। কখনো একটু হুঁশ ফেরে তো আবার অজ্ঞান হয়ে যায়। আলুপট্টি মসজিদে জোহরের আজান শুরু হলো। আব্দুল তখন তার গ্রামের বাড়িতে আমগাছটার নীচে দাঁড়িয়ে। কবর থেকে উঠে এসে তার বাপ তাকে বুকে জাপটে ধরেছে, স্নেহের ছোট্ট বাচ্চাকে যেমন করে কোলে আগলে নেয় মানুষ, সেইভাবে। সারাটা জীবনের সমস্ত কষ্ট, অনাহার, অর্ধাহার, দুর্ভোগ, অপমান, লাঞ্ছনা, দুঃখ, ক্ষোভ, যেন ভুলে গেল আব্দুল। বাপ তার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করছে। তাকে বুকে আগলে ধরে নিয়ে চলেছে যেন কোনো এক স্বপ্নের দেশে। কী সবুজ সে দেশ! কী অপরূপ তার পরিবেশ! আহ! কী শান্তি! অপার শান্তি!!

নামাজের পর পরই উৎফুল্ল মানুষের ঢল নামল রাস্তায়। স্বৈরাচারীরা পালিয়েছে।

তাদের উদ্ধার করতে আসা লোকেরা অবাক হয়ে দেখল কী এক তৃপ্তিকর আনন্দে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে ওদের দলিতমথিত কুঞ্চিত রক্তভেজা ঠোঁটে!

নাজিব ওয়াদুদ, কথাসাহিত্যিক ও চিকিৎসক

গণভবনে আমাদের স্বাধীনতা

মো. রেজাউল করিম

আজ শুক্রবার। সকাল ছয়টা থেকেই বৃষ্টির কড়া পাহারা চলছে। শফিক ভাই বৃষ্টির মধ্যেই আমাকে ডাকলেন। ডেকে বললেন, ঢাকায় তো এলোপাতাড়ি গুলি চলছে। খবর পেলাম রাতের বেলা গুম হচ্ছে, ছাত্রহত্যা চলছে, আর বাড়িতে বাড়িতে ছাত্র পেলেই নাকি বন্দুকের নল ঠেকিয়ে পাখির মতো মারছে। তাদের অপরাধ কী? অধিকারের দাবি তুলেছিল এই তো? তাই বলে কি পাখির মতো গুলি করে মারবে বল? এত অন্যায় সহ্য হচ্ছে না। আমাদের সবাইকে রাস্তায় নামা উচিত। তুই তো ঢাকায় যেতে রাজি না। ঢাকায় যেহেতু যেতে পারবি না, এলাকায় মিছিলের ডাক দে।

শফিক ভাই হড়হড় করে এক নিঃশ্বাসে সবকিছু বলে গেলেন। ভাইয়ের কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বয়স সাতাশের ঘরে। চাকরি যে খুঁজেনি তা নয়, দুই বছর ধরে চাকরির পিছনে খুব ছুটলেন। কিন্তু চাকরির দেখা পেলেন না। পাবেন কী করে? মুক্তিযোদ্ধা কোটা, পোষ্য কোটা, নারী কোটা, জেলা কোটা, গোপালগঞ্জ কোটা, সব কোটাই তো ভর্তি। তার উপর আবার দলীয় বাহিনীর লোক, সুপারিশ দিয়েই চাকরি অহরহ। আমরা সাধারণ মানুষ সেখানে ধুয়া খায়। তারপর আবার প্রেমিকার চাপ। এই বিয়ে কর না তো অন্য কোথাও বিয়ে দিয়ে দেবে। প্রেমিকা রুমানার জোর-জবরদস্তিতে মানুষটা বিয়ে করেছে চারমাস হলো। এলাকায় ছোট একটা ব্যাবসা আছে, ভীতুপ্রকৃতির লোক। ঘরের বাইরে তেমন বের হয় না। কিছুদিন আগেই সবাই বলাবলি করলাম যে, শফিক ভাই বিয়ে করে বউয়ের আঁচলের তলায় লুকিয়ে বসে থাকে। আজ হঠাৎ কী হলো তার?

"আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা
এই বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়"॥
এটা কার লেখা জানিস ফারহান?
সুকান্ত ভট্টাচার্যের।

তোদের বয়সে থাকবে রক্ত টগবগে। মাথা থাকবে আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত। কিন্ত তার বদলে তুই গুঁটিসুঁটি হয়ে বসে আছিস। ব্যাপার কী? দেশ যে গোল্লায় যাচ্ছে তা কি উদ্ধার করা লাগবে না?

এটার উত্তরে আমি চুপ করে বসে রইলাম।

কাল রেডি থাকিস, বৃষ্টি হলেও বের হব, রেইনকোট থাকলে নিয়ে নিস।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অল্পসময়ে দেশব্যাপী বিস্তার লাভ করা কোটা আন্দোলন যার অনলাইন যুদ্ধ আমিও করেছিলাম। ফলশ্রুতিতে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের হত্যার হুমকিসহ অনেক কিছুই মোকাবিলা করতে হয়েছে। এসব কথার কিছুই জানেন না শফিক ভাই।

পরের দিন, আন্দোলনে শামিল হব। মা তো কিছুতেই যেতে দেবে না। 'বন্দুকের নল সন্তান হারানোর ব্যাথা না বুঝলেও একজন মা ঠিকই বুঝে'। কিছুতেই মাকে রাজি করানো গেল না। ফোনের এক পাশে বাজছে কাজী নজরুল ইসলামের রক্ত গরম করা দ্রোহের গান। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। মায়ের অবাধ্য হয়েই বাড়ি ছাড়লাম। পাশ থেকে বোন রেশমা বলল, তোর কিছু হলে সমস্যা নাই কিন্তু মা হলো হার্টের রুগি, তোর জন্য মায়ের কিছু হলে তোর খবর করে দেবো।

জমায়েত হলাম উপজেলার সামনে। কানের মধ্যে বেজে উঠল, 'সামনে আসছে ফাল্গুন আমরা হব দ্বিগুণ', কেউ কেউ স্লোগান দিচ্ছে, 'কোটা না মেধা? মেধা মেধা','আমার সোনার বাংলায় বৈষম্যের ঠাঁই নাই'। জমে থাকা নয় দফা দাবি এখন নেমে এসেছে এক দফা দাবিতে। হাতে যে যা পেয়েছে নিয়ে এসেছে। দা, লাঠি, মরিচ গুড়া আরো কত কিছু। মেয়েরা নিয়ে এসেছে পলিব্যাগে করে মরিচের গুড়া ছাত্রলীগ বাহিনীকে মোকাবিলা করবে বলে। দুপুর দুইটার সময় শেষ হলো আমাদের কর্মসূচি। বাড়িতে ফিরে দেখলাম বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো আবার বন্ধ করেছে, এর আগেও সপ্তাহখানেক সময়জুড়ে বন্ধ ছিল। চারিদিকে থমথমে অবস্থা, টিভিতে দেখাচ্ছে অবস্থা স্বাভাবিক, চলমান আছে কারফিউ।

পরের দিন রবিবার। আগের মতোই কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য চললাম। মাথায় লাল সবুজের পতাকা বেঁধে যোগ দিলাম। খবর এল দেশের সমস্ত মানুষ একযোগে রাস্তায় নেমেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলিম সকলেই মিলেমিশে হয়েছে একাকার। সরকারের করুণ অবস্থা। সমন্বয়কদের বারবার গণভবনে ডাকছেন। এর আগেও ছয়জন সমন্বয়ককে আটকে রেখে মিথ্যা বয়ান দেওয়ানো হয়েছিল। কোনো লাভ হয়নি। সমস্ত জনতার ছিল স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছে। কর্মসূচি শেষ করে বাড়িতে আসলাম সন্ধ্যা-নাগাদ। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনলাম, 'পরশু না কালই লং মার্চ টু ঢাকা।' খবর শুনে শফিক ভাইয়ের কাছে দৌড়ে গেলাম কিন্তু তার দেখা পাইলাম না। অবশ্য আজ সারাদিন তার কোনো দেখা পাইনি।

৫ আগস্ট। এদিন সকালের পরিবেশ বেশ থমথমে। সতর্ক অবস্থানে ছিল ঢাকার পুলিশ। তবে কারফিউ অমান্য করে বেলা ১১টার পর থেকে সারা দেশের শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনগণ শাহবাগে জড়ো হতে থাকে। তারপর শাহবাগ থেকে আন্দোলনকারীরা গণভবনের দিকে পদযাত্রা শুরু করে।

বেলা আড়াইটার দিকে খবর এল, হাসিনা দেশ ছেড়েছে। কী মহা আনন্দ! চারিদিকে মিষ্টি বিতরণের হৈহুল্লোড় পড়ে গেল। ঠিক এই সময় শফিক ভাইয়ের কথা মনে পড়ল। শফিক ভাইকে আনন্দের সংবাদ দিতে গিয়ে দেখি রুমানা ভাবি হাউমাউ করে কাঁদছে। বললাম কী হয়েছে? বলল, দুইদিন থেকে শফিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মানুষটা কোথায় গেল কেউ জানে না। আমাকেও কিছু বলে যায়নি।

দুয়েকদিন পর যখন টিভি চ্যানেলে এত এত হত্যার ফুটেজ আসতে লাগল, যখন আসাদুজ্জামানকে পুলিশগুলো বলল, "গুলি করি, মরে একটা, আহত হয় একটা। একটাই যায় স্যার, বাকিডি যায় না"।

চোখের নিচে কালো দাগ নিয়ে, আঁচল দিয়ে কান্না করা মুখটা ঢেকে, করুণ মায়াবী সুরে রুমানা ভাবি বলল, "আমার কী এখন বিধবা হওয়ার সময় হয়েছে ফারহান"?

মো. রেজাউল করিম, ৩য় বর্ষ, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগ, শহীদ শামসুজ্জোহা হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বিপ্লবের বিলাপ

ফারজানা ইসলাম হিয়া

আজ ৫ আগস্ট, ২০৩৬। অথচ আজ থেকে একযুগ আগেও এইদিন বাংলাদেশের কাছে '৩৬শে জুলাই' নামে পরিচিতি পেয়েছিল। "আচ্ছা, যা চেয়েছিলে, তা কি পেলে?" "হ্যাঁ, পেয়েছি তো, পরিবর্তন পেয়েছি"। "বিপ্লব, তুমি পরিবর্তনই তো পাবে, এ আর নতুন কী? আমি জানতে চাচ্ছি, অধিকার কি পেয়েছ?" "কোন অধিকার? মৌলিক অধিকার! সময়, তুমি একদম হেঁয়ালি করবে না। যা বলার স্পষ্টভাবে বলো।" "আরেহ্, মৌলিক অধিকার নয়। তা তো আছেই বরাবর, যতই তার ভঙ্গুর দশা হোক না কেন। সংবিধানেই তো তা মোটা দাগে লিখা আছে। তার জন্য তোমার আর কী প্রয়োজন?" "তাহলে?" "তুমি জুলাই-২৪ এ মাঠে নেমে বললে যে! 'চেয়েছিলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার'-তা সেই অধিকারটা কি আদ্য পেলে?" "এখন হঠাৎ পুরাতন কাসুন্দি ঘাটবার মানে কী? শুনি।" "তোমার মতিগতি দেখে আমার আজ বড্ড নিজের নীতি-বহির্ভূত কাজ করতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। তাছাড়া, আমার পিছে ফিরে তাকানোর স্বাদ কোনোকালেই ছিল না।" "তা আমি কী করেছি? বলো, শুনি।" "তোমার কাজ হলো আমার ফেলে আসা অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়া, তারপর জ্বলে ওঠা। কিন্তু আজ আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, তুমি আমার অপব্যবহারই করে চলেছ বেশি। তাইতো আজ আমাকে পিছনে ফিরে তাকাতে হচ্ছে। কেমন যেন তোমার অন্ধ ভক্তদের দিন দিন তুমি উগ্র করে তুলেছ। অভ্যুত্থানের পক্ষে মব করতে যেন উসকে দিচ্ছ। কেমন যেন তুমি তাদের বিবেক-বুদ্ধি কেড়ে নিয়ে, কেবল সাহসিকতা প্রদর্শনে অগ্রগামী করে দিচ্ছ। তুমি কি জানো না, আমার কথা না ভেবে, সীমার বাইরে গিয়ে মাত্রাতিরিক্ত যে কোনো কাজ নেতিবাচক প্রভাবই নিয়ে আসে? এটা ভালোর মন্দে পরিণত হয়। জানো না তুমি?" "আমার উপর তোমার আশা-প্রত্যাশা যে দিন দিন দৃঢ় হচ্ছে, এটা জেনেই আমার খুব ভালো লাগছে। আচ্ছা, এই একযুগ পরে এসেও যে তুমি আমার উপর স্বাধীনভাবে আঙ্গুল তুলতে পারছ, এটাই কি পরিবর্তন নয়? এত আকথা-কুকথা বলতে গিয়ে তোমাকে কিন্তু শুনতে হচ্ছে না, যে-'বেশি কথা বলবেন না, সমস্যা হতে পারে'। ভেবে দেখেছ এটা?" "হ্যাঁ, আমি ধন্য হয়েছি, কিন্তু জনাব আমি তো পরিবর্তনের কথা জিজ্ঞেস করিনি। অধিকার পেয়েছেন কি না, তাই জানতে চাইলাম। আপনি তো দেখি আউলাইয়া গেছেন?" "দয়া করে আমাকে 'আপনি বলে' ব্যঙ্গ করবে না। এসব স্যাটার, মিমস-এর সাথে আমার খুব ভালোমতোই পরিচয় আছে। আমরা কিন্তু একে-অপরের পরিপূরক। বরং, তুমিই আমার গুরুজন। কেন! সরকারি চাকরিতে তো কোটা সংস্কার হয়েছেই। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ও তো পোষ্য কোটা বাতিল করেছিল।" "আর এখন?

প্রশাসক পরিবর্তন তো সিদ্ধান্তের পরিবর্তন। তোমার দ্বারা প্রাপ্ত পরিবর্তনের কি আদ্য কেউ তোয়াক্কা করল? আচ্ছা, তুমি কি নিজের দাম বাড়াতে চাচ্ছ? তুমি কি চাচ্ছ যে-সর্বোত্তম ম্যামালিয়ারা তোমাকে বার বার স্মরণ করুক? রাজপথে ঠাঁই দিক? 'বাতিল', 'সংস্কার' করতে করতে রাজপথ কাঁপাক? সোশ্যাল-মিডিয়ায় ঝড় তুলুক? আহত-নিহত-অসম্মানিত হোক? আর পড়ার টেবিলগুলো মূর্ছা যাক? তাই কী? আসলে, তুমি চাচ্ছটা কী? আমাকে বলবে একটু? আমার সত্যিই খারাপ লাগে, তাদের জীবনের অন্তিমলগ্নে তারা যখন আমাকে নিয়ে হিসেব কষতে বসে। 'তারা কী পেল? কী হারালো?'-এসব কি আর আমার দেখবার কথা? তাও আমাকেই দুষতে থাকে। এখন থেকে এর দায়ভার তোমাকেও নিতে হবে, বলে দিলাম।" "হুমম, ভেবে দেখব। আসলে তারা বৈষম্যের স্বীকার হতে হতে, দেওয়ালে তাদের পিঠ ঠেঁকে গেছে।" "এখন তুমি অবশ্য তাদের বিবেক আর সাহসিকতা জাগ্রত করেছ, যদিও আমার চোখে তাদের সাহসিকতার পরিমাণটাই এখন বেশি। তা যাহোক, এখন কিন্তু তারা শুধু তোমাকে আঁকড়ে ধরেই বাঁচতে চায়। বিপ্লব, তুমি তো শুধু ঘটনার সারাংশটুকুই দেখছ। প্রত্যেক পরিবারের দিকে তাকিয়ে দেখ, একেকটা পরিবারের একেক গল্প, শুধু তোমাকেই ঘিরে। বাবা-মার সাথেও কতজনের মতবিরোধ সৃষ্টি করেছ, তা কি তুমি জানো? তবুও সেইসব পরিবারের আশীর্বাদেই তুমি শেষমেশ সফল হয়েই যাও সদা-সর্বদা। কিন্তু তুমি কি জানো! তোমার অনুসারীরা তোমার পথে চলতে কখনো নিজেদের প্রাণের পরোয়া করে না! তাদের মূল আতঙ্কই কেবল তাদের পরিবারের জীবন।" "এই সময় এই, একটু মৌন হও। আমাকে ইমোশনাল করে তোমার কোনো লাভ হবে না। এখন তো দেখছি, তুমিই আউলাইয়া যাচ্ছ।" "পালটা জবাবটা দিয়েই দিলে! তুমি আমার কথাটা হজম করতে পারলে না?" "হা হা হা, আচ্ছা তুমি বলতে থাকো আমি শুনছি।" "তুমি হলে সুযোগ-সন্ধানী, বুঝলে? তোমার কিছু খ্যাপা অনুসারী এখন তোমার মাঝেই নিজেদের শঁপে দিয়েছে। এতে তাদের ব্যক্তিগত জীবন বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তবে একটা ব্যাপারে তোমাকে স্যালুট জানতেই হয় যে, তুমি বিদ্যান্বেষী ম্যামালিয়াদের সুপ্ত দেশপ্রেমকে জাগ্রত করেছ, দেশের রাজনীতিতে তারাও বেশ মাথা ঘামাচ্ছে। নইলে এতদিন 'মাতৃভূমি' আমার কাছে এসে নীরবে কাঁদত, জানো? এমনিতেই মায়ের জাত, মমতাময়ী, 'কেউ তাকে ভালোবাসে না'-বলে বলে কত যে অভিযোগ করত! কোমল হৃদয়ের অধিকারিনী বলে কথা। কিন্তু এখন তার আর অর্ধেক রাত ঘুম হয় না, জানো? আগে অবশ্য দুর্নীতি আর অরাজকতার চাপে ঘুমই আসতো না। নির্ঘুম রাত কাটাত। এখন দুর্নীতি-অরাজকতার চাপটা কমলেও তোমার চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। তোমার চাপটার কারণেই বাকি অর্ধেক রাতটা তবুও চোখ বুজতে পারে কিন্তু একটু আতঙ্ক নিয়ে এ-ইয়ারকি।" "আতঙ্ক কেন? আতঙ্ক কীসের?" "তোমার ভেতরও যে অনেক গুজব-অপরাজনীতি-কূটনীতি দিয়ে ভরা। তার উপর একেকজন ভিন্ন মতাদর্শের অনুসারী

তোমার। এটা অবশ্য ভালো ব্যাপার। সবার তো আর কোরাসে গান গাওয়া সাজে না। তবে, আতঙ্ক লাগে ফাগুনে ফাগুনে তারা দ্বিগুণের বদলে যেন খণ্ড খণ্ড না হয়ে যায়। অপশক্তিরই তো খেল বেশি এ সমাজে। এটা তো তুমি আমার থেকে কম জানো না। তার উপর তারা সবাই অনেক মেধাবী। তুমি কি জান? তুমি কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে অনেককেই বেশ অহংকারী আর অনমনীয় করে গড়ে তুলেছ। কিন্তু পণ্ডিত বোকারা তো বোঝে না যে, আমার সাথে সাথে সব পরিবর্তন হতে থাকে। যদিও তুমি এই পরিবর্তনে সঠিক পথ দেখাতে আমাকে সাহায্য করো, এটা অস্বীকার করছি না।" "ধন্যবাদ, তোমার এই স্বীকারোক্তির জন্য।" "তোমার এই মেকিমার্কা পোশাকি কথা আমাকে বলতে এসো না, বুঝলে। তোমাকে পরিচালনা করতে গিয়ে, অন্যদের মানাতে গিয়ে, তেলবাজি করার গুণটা খুব ভালোই আত্মস্থ করতে পেরেছে তোমার অনুসারীরা। এখনো কিছুজন কার্য ব্যতীত ফল লাভে মরিয়া। আবার এরাই নাকি চাঁদে রকেট পাঠাতে চায়! সমালোচনাতে কিন্তু বিদ্যান্বেষীরা সব থেকে বেশি সিদ্ধহস্ত। অধ্যাবসায়ে একনিষ্ঠ থাকুক আর নাই থাকুক। বিপ্লব, তুমি সমাজের পরিবর্তন করতে পারলেও কিছু ম্যামালিয়াদের মন ও মস্তিষ্কের পরিবর্তন ঘটাতে পারোনি, পারছো না। অনেকেই এখনও অ্যাকাডেমিক উন্নতির আশায় নানা অন্যায় দেখেও মুখে কুলুপ এঁটে থাকছে। এদের জন্য কী কিছুই করার নেই তোমার?" "দেখো, তারা কিন্তু শান্তি-প্রিয়, বিনয়ী। ইচ্ছা থাকলেও হয়তো উপায় থাকে না, তাদের। আর একশ শতাংশকেই কি আমি জাগ্রত করতে পারি? তবে তো আমাকে খুনি হতে হবে। যারাই অন্যায় করছে, তেলবাজি করছে, নিজের ক্ষমতা জাহির করছে, অন্যের সুযোগ নিচ্ছে, সুযোগ-সন্ধানীর মতো আচরণ করছে, ভাব দেখিয়ে চলছে, গলার জোরে অন্যকে ডমিনেট করছে সবাইকেই আমাকে ধরে ধরে কতল করতে হবে। এটা কিন্তু তবে শুধু 'জেন-জি' নয় এখন 'মিললেননিয়াল'-দের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হবে। তুমি দয়া করে আমার গায়ে গুরুজন খুনের দাগ লাগিও না। তুমি তোমার ফাঁদে তাদেরকে ফেলে দাও। তারা যেন এক গোলক ধাঁধাঁয় আঁটকে যায়। তাদেরকে অ্যামনেসিয়ার রোগী বানিয়ে দাও।" "তা করা যায়, তুমি তো জানোই, দুখু মিয়াও স্বয়ং বলেছেন-'যুগের ধর্ম এই-পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।" "তুমি মনে হয় আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলে প্রথমে। তোমার কি আর সেই প্রশ্নের কোনো উত্তর লাগবে?" "আমি বুঝে গেছি, তুমি নেতাদের মতনই ডিপ্লোমেটিক উত্তর দিবে। তাই তোমার উত্তর তোমার কাছেই রাখো। আমি শুধু চাই, তুমি শুধু বাহ্যিকভাবে জাগ্রত না হয়ে, প্রত্যেকের মন-মস্তিষ্কেও সঞ্চার হও। জানি তুমি বারবার ফিরে ফিরে আসবে, তোমাকে আমি দমাতেও চাচ্ছি না। কিন্তু তুমি পারো না, ভিন্ন রূপে আসতে? তোমার রূপ কেন সবসময় কঠোরই হতে হবে? যেমন উত্তাপ তুমি রাজপথে ছড়াও তেমন উত্তাপ অন্তরে জাগ্রত করে আবার শীতলতার চাদরে মুড়িয়ে বিনয়ী করতে পারো না তোমার অনুসারীদের? ঠিক 'বিগব্যাঙ তত্ত্ব'-এর মতন। সবকিছু

না হয়, নতুনভাবেই শুরু হোক। তোমার অনুসারীরা যদি তোমার এইরূপ আত্মস্থ করতে পারে, না জানি, তারা কত কিছু আবিষ্কার করে ফেলবে! তাদের যে স্পৃহা।" "তবে তোমাকে ইবলিশদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ কেন, নিশ্চিহ্ন করে দিলেই বেশি খুশি হব।" "তবে কি আর সমাজ, সমাজ থাকল রে? অন্ধকার না থাকলে আলোর কি দাম? তাদের দমাতেও ঐ মেধার অস্ত্রই লাগবে। যার অধিকার চেয়ে চেয়ে একযুগ আগেও তুমি ভোকাল কর্ড ছিঁড়ে ফেলেছিলে। নিজের হৃদস্পন্দন দান করলে, অন্যরা আবার তা নিয়েও ব্যাবসা শুরু করবে! শুধু 'কথা' দিয়েই তোমার মৃত অনুসারীরা জীবন লাভ করে কাঠগড়াতে উঠবে ! তুমি কী সেটাই চাও? তুমি কী চাও-'মরলে শহিদ, বাঁচলে গাজি'-এই এক ফরমুলাতে নিজেদের বিলিয়ে দিক? তুমি কী চাও না, ' মাতৃভূমি' পূর্ণরাত শান্তিতে ঘুমাক!" "আমাকে এত কথা বলে তোমার লাভটা কী হলো, বুঝছি না। আমার সাথে চেতনাবোধ, মমত্ববোধ, নৈতিকতা একযোগে কাজ না করলে, আমার সত্যিই কিচ্ছু করার নেই।" "বুঝলাম, হয় তারা শুধরাবে, নইতো মরণ ফোঁড় বিশেষ কায়দায় আমাকেই দিতে হবে।" "দেখো সময়, তুমি যেটা ভালো মনে করো।" "আমার মনে হচ্ছে এই গোবেচারা ম্যামালিয়ার মস্তিষ্ক থেকে আমাদের এবার বের হওয়া উচিত, বুঝলে বিপ্লব। ওকে দূরদর্শিতা বানাতে গিয়ে ওর পড়ার টেবিলকে মূর্ছা যেতে দেওয়া যাবে না। পরে না হয় আবার ওর মাথায় ভর করা যাবে। আমরা তো আবার বেশি উচ্চ-মস্তিষ্কওয়ালা মাথায় সর্বদা প্রবেশ করতে পারি না। তাদের তো আবার নানা দায়-বদ্ধতার ভিতর দিয়ে যেতে হয়। আবার নির্ভেজালদের মাথায় প্রবেশ করাও বিপদ। তাদের অপ্রয়োজনীয় লম্ফ-ঝম্পতে আমরাই নাস্তানাবুদ হয়ে যাব। তাই এই মধ্যম-মস্তিষ্কের মাথায় আমাদের জন্য উপযুক্ত।" "এই বেচারা আবার পুরো দেশকে এক হাঁড়ি ভাত ভেবে বসে আছে, দেখেছ? শুধু একটি ভাত রূপী রাজশাহীর পরিবেশ টিপে দেখে পুরো দেশের খবর অনুমান করা শুরু করেছে। অবশ্য এটা করতে আমিই উসকাচ্ছি তাকে, এটা বলতে পারো। 'কতটা ননসেন্স ডেটা কালেকশন' হচ্ছে, বুঝতে পারছ?" "থাক, বেচারার মস্তিষ্ক আজকের মতো ছেড়ে দি আমরা। তার থেকে বরং, চলো আমরা সুভ্যেনির শপের সামনে তোমার অনুসারীদের মিটিং পর্যবেক্ষণ করি, সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখি, অপেক্ষা করি-মুখোশধারী ম্যামালিয়াদের প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবার"। "তবে তো, অন্য দেশ আমাদের নিয়ে ঈর্ষা করবে, সময়!" "দেখা যাক, কী হয়।"

ফারজানা ইসলাম হিয়া, ৩য় বর্ষ, ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, মন্নুজান হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রক্তের তেজ

মাহাথির আরাফাত

মাঝরাত। বাইরের শোরগোলে ঘুম ভেঙে গেল আজিমের। ধীরে ধীরে শোরগোলটা কাছে আসছে। এখন তার রাতগুলো কাটছে ভয় আর দুশ্চিন্তায়। একাত্তরের ভয়াল রাতের মতো যেন। এই বুঝি মিলিটারি এসে ধরে নিয়ে যাবে। পাকিস্তানি মিলিটারির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এখন পুলিশ বাহিনী। আন্দোলনে গুলি করছে, ছাত্রদের হলে ও মেসে টহল দিচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদে জর্জরিত না করে ছাড়ছে না। গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে মিলিটারি কায়দায়। রংপুরের আবু সাঈদ গুলি খেয়ে শহিদ হওয়ার পর আন্দোলন আরো বেগবান হয়েছে। পৃথিবীর সব শাসকই এই ভুলটা করে। জনগণের ক্ষোভ আর ঘৃণা বেড়ে লেগে গদি থেকে না নামানো পর্যন্ত নিস্তার নেই।

আজিম বোতল থেকে ঢকঢক করে পানি খায়। শরীর ঘামতে থাকে তার। দূরে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। ভাবল কালকেই বাড়ি ফেরা উচিত। মেসের মালিক সকালে তাগদা দিয়েছে মেস ছাড়তে। বাড়ি চলে যেতে একপ্রকার শাসানিই দিলেন। সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো অঘটন ঘটলে সেই ভার নিতে পারবেন না তিনি। মেসের অনেক ভাই বাড়ি চলে গেছে একে একে। এদিকে মেসের খালাও আসছে না। মিল বন্ধ। বাইরে খেতে বেশ ঝামেলাই হচ্ছে।

হঠাৎ ঘুম ভাঙার কারণটা স্পষ্ট হলো। শব্দটা আরো কাছে এসেছে। ভেসে আসছে মানুষের চ্যাঁচামেচি। আজিম বেলকনিতে গিয়ে দাঁড়ায়। ছোটখাটো একটা দল দেখতে পায়। মোড়ের চায়ের স্টলে জড়ো হয়েছে সবাই। তিন-চারজনকে সে চিনতে পারল। যদিও কখনো আন্দোলনে যায়নি সে। ফেসবুকে দেখেছে, আন্দোলনে এই মানুষগুলোই প্রথম সারিতে থাকে। সমন্বয়ক। এত এত ছাত্রজনতা মারা যাচ্ছে প্রতিদিন, তাও তার ভাবোদয় হয় না। শরীরে যেন তেজ নেই, মনে সাহস নেই, রক্তে নেই প্রতিবাদী চেতনা। আন্দোলনে তার ভূমিকা শুধু ফেসবুকে বিভিন্ন পোস্ট শেয়ার করায় কোথায় পুলিশ গুলি করেছে, কোথায় কত জন মারা গেছে। আর মৃত্যু দেখে আফসোস করে আহা রে! এত ছোট ছেলেটা মারা গেল।

আজিম তিন তলা থেকে নেমে রাস্তায় আসে। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলেরা দলে দলে আসছে বিভিন্ন মেস থেকে। চেহারা দেখে মনে হয়, বেশিরভাগই ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। সরকার পতনের আন্দোলনে এদের উৎসাহই বেশি। অথচ এরা সবাই আওয়ামী ইতিহাস পড়ে বড় হয়েছে। গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে আওয়ামী ইতিহাস মুখস্থ করে। শেখ মুজিব, মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া এরা কোনো ইতিহাস জানে না। এরাই কিনা চায় সরকার হটাতে। এতদিন দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষল শেখের বেটি।

ফাঁকা বেঞ্চে আজিমকে বসতে দেখে চা স্টলের মিজান মামা বলল, 'এহনই সুযোগ। পরে আর পারবেন না। তাওয়া গরম থাকতেই লাইগা পড়েন আপনেরা।'

পান চিবুতে চিবুতে আবার বলল, 'দেশটারে এক্কেবারে শেষ কইরা দিছে। আপনেরাই এইবার পারবেন চুল ধইরা গদি থেইক্যা নামাইতে।'

কালকের আন্দোলন কী রকম হবে সেটা নিয়ে এক ঘণ্টার ওপর আলোচনা হলো মিজান মামার চা স্টলে। আলোচনার প্রতিটি কথা যেন একেকটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সমন্বয়ক আম্মার ভাই তো কাফনের কাপড় জড়িয়ে রাখেন শরীরে। কোটা সংস্কার থেকে সরকার সংস্কারে চলে গেছে সবাই। ব্যথা যেখানে, মলম লাগাতে হবে সেখানেই। কোটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না এখন। নয় দফা থেকে এক দফা।

মাসুদ রানা ভাই বলল যে, কালকে কেউ যেন লাঠি ছাড়া আন্দোলনে না যায়। ছাত্রলীগের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা। খালি হাতে যাওয়া যাবে না। তাছাড়া হাতে একটা লাঠি থাকলে শরীরে ভীষণ জোস আসে। আজিম আন্দোলনে যাবে কি না সেটা নিয়ে দ্বিধান্বিত। যদিও ভাইদের কথা শুনে অন্তরটা তার ভরে উঠল। দেশ নিয়ে এভাবে ভাবে সবাই! তার মনে হলো আন্দোলনে যাওয়া উচিত। আর কত কাপুরুষ হয়ে থাকবে। ভীরুরা মরার আগে বহুবার মৃত্যুবরণ করে শেক্সপিয়ারের এই কথাটা অবশ্য আজিমের জানা।

কিছুক্ষণ পরেই সবার মধ্যে কেমন অস্থির ভাব দেখা গেল। কানাঘুষা শোনা গেল পুলিশ আর ছাত্রলীগ এক হয়ে নাকি বের হয়েছে। ছাত্রলীগের হাতে দেশীয় অস্ত্র, রামদা, লাঠিসোঁটা। চারদিক থেকে গাড়ি ভরে লীগের পোলাপান আসছে। আন্দোলনের শুরুতেই এরকম নানান গুজব রটিয়ে আন্দোলনটা ছত্রভঙ্গ করতে চেয়েছিল। এখন ইন্টারনেট বন্ধ। যখন ইন্টারনেট ছিল, তখন তো রাতে ফেসবুকে চলত লাইলাতুল গুজব। কখনো ভারতের র' বাহিনীর অ্যাটাকের খবর, কখনো দেখা যেত সমন্বয়করা কোটি কোটি টাকা নিয়ে দেশ থেকে পালিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন হল ছাড়তে বলেছে। হলে ও মেসে পুলিশ তল্লাশি চালায়। ছাত্র আছে শুনলেই নাক সিটকায়। বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলে বাড়ি চলে যাওয়ার জন্য।

এখন যেকোনো কিছুই হতে পারে। ছাত্রলীগকে ক্যাম্পাস থেকে উৎখাত করা হয়েছে। ওদের ভয়ংকর রূপে ফিরে আসাটা বিস্ময়কর কিছু না। আস্তে আস্তে কেটে পড়ল সবাই। একটা আসন্ন মহাবিপদের আশঙ্কা যেন পাথরের মতো সবার মনে চেপে বসেছে, গুজবের বর্ণনা শুনে শিউরে উঠছে। বেশি ভয় অবশ্য আজিমই পেয়েছে। সে তড়িঘড়ি করে মেসে ফিরে গেল। ভীরুরা মরার আগে বহুবার মৃত্যুবরণ করে।

সকালবেলা। দেরিতে ঘুম ভাঙল আজিমের। ঘুম ভাঙল ফোনকলের শব্দে। বাড়ি থেকে কল এসেছে। ওপাশ থেকে আজিমের বাবা বললেন, 'আন্দোলনে যাওয়ার দরকার নাই। ঘর থেকে বের হবি না। পারলে বাড়ি চলে আয়। আর তুই নাকি ফেসবুকে আন্দোলনের ছবি-ভিডিয়ো শেয়ার দিয়েছিলি? ডিলিট করে দিস। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমার ছেলে হয়ে তুই আন্দোলন করিস?'

আজিমের বাবা শুধু মুক্তিযোদ্ধাই নন। নিজ উপজেলায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। উপজেলা পর্যায়ের আন্দোলন তিনি লীগের পোলাপান দিয়ে দমন করেছেন। মার খেয়ে আট-দশ জন কলেজ-ছাত্র হাসপাতালে ভর্তি। তার ছেলে কিনা ফেসবুকে আন্দোলন করে! মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আজিম বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছিল। যদিও এলাকায় কানাঘুষা আছে তার বাবা ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা। ক্ষমতার দাপটের কারণে কেউ মুখ খোলে না। সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকতে এজন্যই আজিমের এত কাপুরুষতা। শুরু থেকেই আন্দোলনে কখনো যেত না সে। বন্ধুদের সাথে তর্কও করেছে আন্দোলনের বিপক্ষে। গণজোয়ারের পর অবশ্য চুপসে গেছে সে।

ওর মা ফোন হাতে নিয়ে কান্না করে দিলেন, 'আব্বা, তুই চলে আয়। যেভাবে পারিস চলে আয় বাড়িতে। অবস্থা আরোও খারাপ হইতাছে। আজকেই চলে আয়।'

বাবা-মার এত জোরাজুরির পর আজিম হার মানল। ইদানীং তার ভয়টাও বেড়েছে। বন্ধুদের কটাক্ষ পোহাতে হবে বলে ফেসবুকে কিছু শেয়ার-টেয়ার দিয়েছিল।

তার মাকে বলল, 'ঠিক আছে। বাস চললে চলে আসব আজই।'

সকাল এগারোটার পর মিছিল বের হয়েছে। চারদিকে গগনবিদারী স্লোগানে কাঁপছে ধরণী। আন্দোলনের শুরুতে ছিলড় 'কোটা না মেধা? মেধা, মেধা' কিংবা 'আমার সোনার বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই'-এর মতো স্লোগান। ১৫ জুলাই রাতে শেখ হাসিনা যখন আন্দোলনকারীদের রাজাকারের বাচ্চাদের সঙ্গে তুলনা করলেন, তখন কিছুক্ষণের মধ্যে মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা প্রতিক্রিয়া দেখায়। তারা স্লোগান দেয় 'তুমি কে? আমি কে? রাজাকার, রাজাকার/ কে বলেছে? কে বলেছে? স্বৈরাচার, স্বৈরাচার'। কিংবা 'চাইলাম অধিকার, হয়ে গেলাম রাজাকার!' সারাদেশে বাষ্পের মতো ছড়িয়ে পড়ে এসব স্লোগান। রুমের ভেতর থেকে আজিম সহ্য করতে পারে না স্লোগান। দুই কানে হাত দিয়ে চেপে ধরতে চায়।

লোহার গেটে ঝনঝন শব্দ হচ্ছে। ধাক্কা দিচ্ছে কেউ। অনবরত শব্দটা বাড়ছে। আজিম ভাবল গেট খুলছে না কেন কেউ! নিচের তলার ছেলেগুলো ঘুমিয়ে আছে নাকি? আজিম ব্যাগ গোছাচ্ছিল বাড়ি যাওয়ার জন্য। একরাশ বিরক্তি নিয়ে নিচে নামে। পুরো মেস

খালি। আন্দোলনে চলে গেছে সবাই। তিনটা ছেলে গেইট ঝাঁকাচ্ছে জোরে। অনুনয়-বিনয় করতে লাগল গেইট খুলে দেওয়ার জন্য। বাইরে গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। একটা ছেলে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'ভাই, গেটটা খুলেন প্লিজ, ও ভাই।'

আজিম গেট খুলে ওদের ভেতরে আসতে দিল। ছেলে তিনটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন। সবার হাতে প্লাস্টিকের ছোট ছোট পাইপ। বাইরে গোলাগুলির আওয়াজ তীব্র হচ্ছে। কার মায়ের বুক খালি হচ্ছে আল্লাহই ভালো জানেন। ওরা বলল, পুলিশের ধাওয়া খেয়ে ওরা এসেছে। হুটহাট গুলি চালায় পুলিশ। প্রথমে ফাঁকা ফায়ার করলে ছাত্রজনতা খ্যাপে যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে পুলিশ গুলি চালায় সরাসরি। যে যেভাবে পারে ছুটে এসেছে।

গোলাগুলির শব্দ কমলে ছেলে তিনটা চলে যায় আজিমের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে। আজিমও পরে মনোযোগ দেয় ব্যাগ গোছানোয়। দুইটায় একটা বাস ছাড়বে ময়মনসিংহের উদ্দেশে। বাস কাউন্টারে ফোন দিয়ে জেনেছে সে। কোনোমতে বাস পর্যন্ত পৌঁছালেই কেল্লা ফতে।

দেড়টার দিকে সে বেরিয়ে পড়ে। পরিবেশটা থমথমে। মিছিলের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। যাওয়ার সময় মেস মালিকের সাথে দেখা। লোকটা কেমন নির্জীব আর বেরসিক। গম্ভীর গলায় বললেন, 'ডাইরেক্ট গাড়ি না পেলে ভেঙে ভেঙে যেয়ো। আর থেকো না। যেমনে পারো চলে যাও।'

আজিম বলল, 'সমস্যা নেই। টিকিট পেয়েছি। যাই। দোয়া করবেন।'

রাস্তায় নেমে সে রিকশা নিল। রিকশাওয়ালার কাঁচা-পাকা চুল, রোদে জ্বলে যাওয়া খসখসে চামড়া, চোখে ভরসাহারা দৃষ্টি। রিকশা চালাচ্ছে ক্লান্তির ভঙ্গিতে। মনে হচ্ছে বিছানায় শুইলে এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বে।

'আন্দোলন করেন না, মামা?' রিকশাওয়ালা জিজ্ঞেস করল আজিমকে।

'করি তো। আজ বাড়ি চলে যাচ্ছি।' আজিম অপ্রস্তুত হয়ে বলল।

'শুনেন মামা, সবাই যদি এমনে চইলা যায় তাইলে আন্দোলনটা কিন্তু থাইমা যাইবে। শেষ না দেইখা ছাইড়া দিয়েন না।'

আজিমের লজ্জা লাগল কথাটা শোনে। রিকশাওয়ালা মামাও তাকে জ্ঞান দিচ্ছে। লজ্জায় মরে যাওয়া উচিত তার। আজ সে যেন যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া ভীরু সৈনিক। পুলিশের ধাওয়া খেয়ে তিনটা ছেলে মেসে উঠেছিল যখন, যাওয়ার সময় ওরা বলেছিল ভাই, ঘরে বসে থাকবেন না। আমাদের এখন অনেক মানুষ দরকার। এখন ঘরে বসে থাকার সময় না। এই ষোলো বছরের অপশাসনের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করেনি কেউ। এখন সময় ও সুযোগ এসেছে। আমরা হেরে গেলে পুরো বাংলাদেশ হেরে যাবে।

আজিম কথাগুলো ভাবে আর অবাক হয়। মৃত্যু হাতে নিয়ে পুলিশের গুলি উপেক্ষা করে মিছিলে যায় সবাই। আর সে কিনা ঘরে বসে থাকে। হৃদয়ে একটা উথাল পাতাল ঢেউ খেলে যায় তার।

হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে শোরগোল ভেসে আসে। পুলিশ ধাওয়া করেছে ছাত্রদের। এলোপাতাড়ি গুলি ছুটে আসছে। আজিম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। রিকশাওয়ালা মামা রিকশা থামাল। ছুটে আসছে অগণিত মানুষ। মিছিলে ছাত্রসহ সর্বস্তরের জনগণ। গোলাগুলির শব্দে আকাশ ফেটে যাচ্ছে যেন। আচমকা রিকশাওয়ালা মামা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রক্তে ভেসে গেল রাস্তা। আজিম এই প্রথম স্বচক্ষে রক্ত দেখল। গলগল করে রক্ত বেরোতে লাগল রিকশাওয়ালা মামার বুক থেকে। রক্তে লাল হয়ে গেছে রাস্তা। পড়ে থাকা নিথর দেহটা ভয়ংকর লাগছে আজিমের। তার ভেতরটা নাড়িয়ে দিলো এই টলটলে রক্ত।

মাঝ রাস্তা থেকে লাশটা টেনে নিয়ে রাস্তার এক ধারে রাখল সে। আজিম ছুটল তার মেসের দিকে। ব্যাগটা মেঝেতে ছুঁড়ে একটা রড নিয়ে বেরিয়ে পড়ল মিছিলে। তার আজ বাড়ি যাওয়া হবে না। বাড়ি চলে গেলে নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারবে না সে। রিকশাওয়ালার রোদে পোড়া মুখটা ভেসে উঠবে আজীবন। তার হাতে রক্ত লেগে আছে। রক্তের তেজ তার পুরো শরীরে ঢুকে গেছে। এখন মরতে হলে একবারই মরবে, বহুবার মৃত্যুবরণ করতে চায় না সে।

মাহাথির আরাফাত, আইন বিভাগ, সৈয়দ আমীর আলী হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাইয়ের প্রতিধ্বনি

মো. জসিম উদ্দিন

দেখো ক্ষণে ক্ষণে, সূর্য কত ক্ষীণ হয়
চারিদিকে তমসা কুয়াশা যেন পথ ভোলায়।

পলাশির প্রান্ত আজ রক্তে রঞ্জিত হয়ে,
বাংলার সূর্য অস্ত যায় দীর্ঘকাল পরে।
আমার স্বাধীনতা চলে যায় দূর সেই পরহস্তে।

কত বিপ্লব কত বিদ্রোহ কত আন্দোলন,
এ যেন শতাব্দীদ্বয়ের মাঝে সাহারার মরীচিকা,
সিপাহি সব এক হলো তবু মিটলো না মুক্তির তৃষ্ণা,
যুগের পর যুগ লালিত হয় অমর আকাঙ্ক্ষা,
হয় বারবার বিনষ্ট মুক্তির সেই দুর্লভ ঐক্যের ঝান্ডা,
দেশভাগ হয় স্বাধীনতার সেই অমৃত নিয়ে,
তবুও প্রাপ্তি হয় না, শকুনের দুষ্ট দৃষ্টি থাকে।
পাক তেইশ বছরের বৈষম্যের বেড়ি পড়ে,
লক্ষ প্রাণের রক্তের বিনিময়ে নতুন সূর্যের দেখা মেলে,
তব দিগন্তে মেঘের ঘনঘটা, এতো ঝড়ের স্পষ্ট পূর্বাভাস।

অর্ধশত বছর সূর্যের লুকোচুরি শাসকের দুষ্ট বুদ্ধি,
কখনো মেঘ কখনো গ্রহণ কখনও বা কুয়াশায়,
সেই কাঙ্ক্ষিত মুক্তি, আর চোখে পড়ে না সদায়।

স্বৈরাচার যখন বারবার আঘাত করে অস্থিমজ্জায়,
তার বাহু শক্ত করে জাতির মুখ চেপে ধরে,
হাজার হাজার তরুণ শিশু জনগণ তাজা রক্ত দেয়,
বুক পেতে দাঁড়ায় দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রসমাজ,
সকল শ্রেণি পেশা যখন এক হয় মুক্তির নেশায়,
তখন এক স্নিগ্ধ বায়ুর ধাক্কা আসে জুলাইয়ের প্রতিধ্বনিতে,
ধীরে ধীরে সেই শক্তি মেঘ সরিয়ে দেয়।

অতঃপর,
নতুন সূর্য হাসে খিলখিলিয়ে যেন নবাগত শিশুর মতো,
আবার স্বপ্ন আশা আকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত করে,
নতুন করে দেখা দেয় এই সোনার বাংলায়।

মো. জসিম উদ্দিন, ৪র্থ বর্ষ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, শহীদ শামসুজ্জোহা হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ফিরলাম একাত্তরে

মো. আরশাদ আলী

আমি বিজয় উল্লাস দেখিনি একাত্তরে,
দেখিনি লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগ!
আজ ২৪ ফিরে এলো ৭১ হয়ে ।
আজ মনে হয়,
ফিরে এলো কি ৭১,;
ফিরে এলো কি দানবীয় ট্যাংক;
ফিরে এলো কি স্বৈরাচার;
নাকি ফিরে এলো হানাদার?
২৪শের লাল যেন রক্তে ভরা ৭১,
আজ আকাশে বাতাসে মৃত্যুর শমন,
হাজারো মুগ্ধ কথা কয় মিছিলে।
২৪ এ মানুষের কী ক্ষোভ!
ফিরে এলো কি ১৯৭১?
কী উল্লাস মানুষের!
ছাত্র-জনতার লাল চোখগুলো,
যেন এক একটি কৃষ্ণচূড়া,
আমি দেখেছি ছেলেহারা মায়ের দুটি চোখ।
এক চোখে অগ্নিভরা ক্ষোভ-আক্ষেপ, কান্না ...
যেন সে সিংহী তীব্র বেগে নিতে চায় প্রতিশোধ।
আর অন্য চোখে যেন লেগে আছে মায়া,
আমি দেখেছি রিকশাচালক, মুজুরমুটে, কুলি...
অগ্নিভরা চোখে মুখ ভরা হাসি -
মনে হয়,
ফিরে গেলাম গর্বিত একাত্তরে
২৪ যেন ৭১-এর প্রতিচ্ছবি।

মো. আরশাদ আলী, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আবু সাঈদের বুক

মেছবাহুল হাছান

একটি দুঃস্বপ্নের ঘোর নেশা কেটে গেলে-
ভরা তিস্তার উত্তাল স্রোতে পাল তুলে
বুকে টেনে নিবে উদ্দাম প্রেমের প্রিয়তমা প্রেমিকাকে।
জনসমুদ্রের মুহুর্মুহু সংবর্ধনা ছড়িয়ে যাবে
সুরভি উদ্যান থেকে পার্কের মোড়ের থমথমে কোলাহলে।
বুকে তার প্রিয়তমা বিজয়ের উল্লাসে
ঝরবে পুষ্প বৃষ্টি প্রিয় ভার্সিটি-গেট-চত্বরে।
ভাই-বোন, বন্ধু-স্বজন মাথা ছুঁয়ে করবে আশীর্বাদ
পিতা-মাতা কেঁদে কেঁদে লাল করে চোখ,
চিরায়ত নক্ষত্রপতনের শঙ্কিত সাইরেনে।
ভরা জনসম্মুখে, লোকে লোকারণ্য প্রান্তরে,
দাঁড়াবে দুই হাত ছাড়িয়ে
দাঁড়াবে সিরাজুদ্দৌলা কোটি মানুষের ম্যান্ডেটে;
লালগালিচায় ধীরলয়ে হেঁটে হেঁটে
বুকে এসে সেঁটে যাবে প্রিয়তমা
কাঙ্ক্ষিত হৃদয়ে উষ্ণ আলিঙ্গনে।
অতঃপর বুক তার বুলেটের অতন্দ্র প্রহরী,
জেগে থাকে রংপুরে রক্তের কণিকায়;
বুকে ধরে এই কণা তারুণ্যের শিরা-উপশিরা।
ছড়িয়েছে শহরে শহরে,
ছড়াবে আবারো অক্ষরে অক্ষরে,
সাক্ষর জনতার প্রত্যেক ধমনিতে।

মেছবাহুল হাছান, ২য় বর্ষ, বাংলা বিভাগ, শাহ্ মখদুম হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এই পথ

সামিউল ইসলাম সামি

এই সেই পথ
যে পথে হেঁটেছে ইতিহাস, মুক্তিকামী লাখো বীর।
এ পথের আনাচে-কানাচে হাজার বীর লড়েছে,
লড়েছে মুক্তির জন্য।
শত্রুর লাল চোখ, ভারী অস্ত্রে ভয় করে না এই পথের বীররা।
এ পথে শত্রুরা চালিয়েছে গুলি, তুলেছে হায়েনার মতো ডাক।
এ পথ রঞ্জিত হয় রক্তে, পায় হাজার বীরের আত্মত্যাগের স্বাদ।

তবুও থেমে নেই এ পথ; এ পথ কখনো হার দেখেনি।
দেখেছে অন্যায়ের মুখোমুখি প্রতিবাদ।
আজও থেমে নেই এই পথ,
যেখানেই অন্যায় সেখানেই প্রতিবাদের প্রতীক এই পথ।

জানি, এ পথ কখনো থামবে না, কখনো পরাজিত হবে না।
এ পথে হেঁটেছে ইতিহাস,
এ পথে হাঁটছি আমরা,
এ পথে হাঁটবে ভবিষ্যৎ।

সামিউল ইসলাম সামি, ১ম বর্ষ, রসায়ন বিভাগ, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই

তুহিন চাকমা

জুলাই তোমাকে নিয়ে ভাবতে গেলেই দেখি-
এলোপাতাড়ি গুলি, এর বিপরীতে নিরস্ত্র তরুণের মুষ্টিবদ্ধ হাত;
যেন মুহূর্তেই ছিঁড়ে নেবে, উপড়ে দেবে স্বৈরাচারের কালো দাঁত।

জুলাই তোমাকে নিয়ে ভাবতে গেলেই দেখি-
আবু সাঈদের পেতে দেয়া বুকে স্বৈরাচারের গুলি,
বাসার ছাদে বাবার কোলে ঢলে পড়া ছোট্ট রিয়ামণি,
টিয়ার গ্যাসের তপ্ত ঝাঁজে তবুও কেউ আপস করেনি।

জুলাই তোমাকে নিয়ে ভাবতে গেলেই দেখি-
বিস্ফোরণের জ্বালা বুকে নিয়ে ছুটে চলা লক্ষ তরুণ,
পানি হাতে মুগ্ধর বুকে দগদগে বুলেটের ক্ষত,
যেন রক্তের বন্যায় ভেসে যাবে, আছে অন্যায় যত।

জুলাই তোমাকে নিয়ে ভাবতে গেলেই দেখি-
সন্তানের প্রিজন ভ্যানের পিছু নেয়া নিঃস্ব দম্পতি,
বন্ধুর লাশ কাঁধে নিয়ে ফেরা সেই বিভীষিকাময় রাত,
সাউন্ড গ্রেনেডের ধোঁয়ায়ও ভাসে মানুষের আর্তনাদ!
জুলাই তোমাকে নিয়ে ভাবতে গেলেই দেখি-
জুলুমের বিরুদ্ধে তোলা হাজার তরুণের হাত,
মাকে দুটো মিথ্যে বলে মিছিলে যাওয়া প্রেমিক যুগল,
বুলেটের বিরুদ্ধে বুক পেতে দেয়া, রাজপথজুড়ে মানুষের ঢল।

জুলাই তোমার কথা মনে হলেই দেখি-
রাজপথজুড়ে বুলেটবিদ্ধ মানুষ, হাসপাতালের মর্গে লাশের মিছিল ও একরাশ হাহাকার,
প্রিজন ভ্যানের পিছু নেয় রক্ত চোখ, ঘুমের পিছু নেয় রক্তস্নাত স্মৃতি,
জুলাই তোমার কথা মনে হলেই- আমি ঘুমুতে পারি না আর,
মনের কানে বাজতে থাকে- "একজনকে মারতে কয়টি গুলি লাগে, স্যার?"

তুহিন চাকমা, ২য় বর্ষ, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ, মাদার বখ্‌শ হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

ইমরান লস্কর

আমার খুব মন চায়–
সফেদ নিশিবকের মতো গভীর রাইতে শব্দ কইরা স্লোগান তুলতে।
কলাবাদুড় যেমন সন্ধ্যারাইতে গোরস্তানের জারুল গাছে ডানা ঝাপটায়–
আমার কলাবাদুড়ের মতো ডানা ঝাপটিয়ে ঝাপটিয়ে আন্দোলনে যাইতে–
ফের ইচ্ছে করে।
গোধূলিলগ্নে শালিক, চড়ুই, বাবুই, কাক পক্ষিকুল যেমন–
বাঁশঝাড়ের বাসায় সঙ্গীনির খোঁজে চ্যাঁচামেচি করে
আমার খুব ইচ্ছা করে, পাখিদের মতো বেপরোয়া কিচিরমিচির কইরা–
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে।

মন চায়, জুলাই বিপ্লবের বিপ্লবী বীর আবু সাঈদের
আব্বা-আম্মার মতো কাইন্দা কাইন্দা বুক ভাসাইতে
অজ্ঞান হইয়া যাইতে মন চায়, ভাইয়ের প্রতি বোন সুমির–
ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ দেইখ্যা।
মন চায়, চব্বিশের ফ্যাসিবাদ পতনের বিপ্লবে বিপ্লবী বীর মুগ্ধ'র মতো–
আওয়াজ তুলতে, অ্যাই পানি, পানি। পানি লাগবে ভাই পানি?
মুগ্ধের পানি বিলানোর সেই আওয়াজ আমার কানে–
ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে নিয়মিত।
সে আওয়াজ ঘুমাতে দেয় না আমায়, আঘাত প্রতিঘাতে–
তৃষ্ণার্ত মন বিপ্লবের পানে আরও পিপাসিত হয়ে যায়।
আমার খুব ইচ্ছে করে, মুগ্ধ হইয়্যা–
চব্বিশের ফ্যাসিবাদ পতনের অভ্যুত্থানে যাই দৌড়ে–
বিলাই পানি, লাগবে ভাই আর পানি?
হঠাৎ, সাদা ধোঁয়া ভেসে আসবে,
চারদিক কাশ্মিরি বরফের ন্যায় শুভ্র হয়ে যাবে।
পাশে থাকা বন্ধুটা টিয়ার্শেল, সাউন্ড গ্রেনেডের শব্দে
প্রাণরক্ষার্থে দৌড়ানোর সময় বলবে–
মুগ্ধ, চল, চল মুগ্ধ চল।
সামনে চেয়ে পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখবো কেউ নেই আমার পাশে।

সবাই যাচ্ছে পশ্চাৎপদে দ্বিগুণ গতিতে ফের ফিরবে বলে।
কোনো এক অজানা গুলি এসে বিঁধবে আমার বুকের পাঁজরে
শক্তিহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ে যাবো শহীদ আবু সাঈদের জমিনে।
আমার খুব স্মরণ হয়, নূতন বাংলাদেশের জন্মে
কত শত মায়ের কোল হলো খালি
ঝরে গেল কত প্রাণ, ফ্যাসিস্টের গুলির আঘাতে
যেমন ঝরে যায় শিউলিফুল অন্ধকার রাতের গভীরে।

আমার খুব ইচ্ছে করে, ফ্যাসিবাদের পতনের অভ্যুত্থান যাই চলে–
শাহাদতের পেয়াল হাতে নিয়ে। যেমন শাহাদত বরণ করেছে
ফায়াজ, ওয়াসিম স্বৈরাচার পতনের বিপ্লবে।
আমি খুব স্বপ্ন দেখি, দুদণ্ড আনমনে ভাবি
আমাদের আগামীর প্রজন্মের সন্তান হবে কি
ফায়াজ, আহাদুন, নাইমা সুলতানাদের মতো?
যে নবজাতক বড় হয়ে মেনে নিবে না কোনো বৈষম্য
গড়তে দিবে না নব্য বাকশাল কিংবা ফ্যাসিবাদ।
ইস্রাফিলের শিঙার মতো হুঙ্কারে হুঙ্কার দিবে–
নিপাত যাক ফ্যাসিবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

আমি খুব স্বপ্ন দেখি, দুদণ্ড ভাবি আমাদের সন্তান হবে নাফিজদের মতো।
যে বড় হয়ে নিবে না কোনো অন্যায় মাতে পেতে
দিবে না গড়তে বাকশাল, স্বৈরাচার এ দেশের বুকে।
ইস্রাফিলের শিঙ্গার মতো দিবে হুঙ্কার
নয় ফ্যাসিবাদ, নয় বাকশাল
নিপাত যাক, নিপাত যাক, ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

ইমরান লস্কর, পরিসংখ্যান বিভাগ, শহীদ হবিবুর রহমান হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাইয়ের সূর্য

মো. আসিফ

সেদিনও তো সূর্য উঠেছিল
যেদিন স্বৈরাচার আমাদের রাজাকার আখ্যা দিল
আমাদের কোমল হৃদয়গুলো ব্যথিত হলো
জনগণ প্রতিবাদী হয়ে উঠলো
কিন্তু, সূর্য ডোবার আগেই স্বৈরাচার হামলা চালালো।

সেদিনও তো সূর্য উঠেছিল
যেদিন আকাশটা কালো ধোঁয়ায় ঢাকা ছিল
যেদিন বৃষ্টির মতো গুলি চলেছিল
আমার ভাইয়েরা বুক পেতে দিল
সূর্য ডোবার আগেই তাদের তাজা প্রাণগুলো ঝড়ে গেল।

সেদিনও তো সূর্য উঠেছিল
যেদিন আমার ভাই পানি খাওয়াতে গিয়ে জীবন দিল
যেদিন নিরীহ শিশুগুলো মাটিতে লুটিয়ে পড়লো
স্বৈরাচার অট্ট হাসিতে ফেটে পড়লো
বাংলার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠলো।

আজও তো সূর্য উঠেছে
আমাদের কত ভাই-বোন হারিয়ে গেছে
কতজন পঙ্গুত্ব বয়ে বেড়াচ্ছে
সময় তার আপন গতিতে ছুটে চলছে
কয়েকজনই বা জুলাইয়ের সূর্যটা কেমনে রেখেছে?

মো. আসিফ, ৩য় বর্ষ, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, মতিহার হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কালো মেঘে ঢাকা বাংলাদেশের আকাশ

তানজিনা ইসলাম

যদি এ অন্ধকার কেটে নতুন সূর্য উদয় না হয়
যদি আজও অধিকার চেয়ে মার খেতে হয়,
যদি স্বাধীন দেশে থেকে ও পরাধীন থাকতে হয়,
যদি আমাদের আবারও লড়াই করতে হয়।
তবে তুমি মনে রেখো বাঙালি বীরের জাতি
বীর কখনো অন্যায়ে পিছপা হয় না।
বায়ান্ন একাত্তর যেন নেমে এসেছে চব্বিশে
তাই বিজয় নিশ্চিত আসবেই আমাদের।
অন্যায় যারা শুরু করেছে তাদের পতন অতি নিকটে,
যারা নিজেদের ক্ষমতাকে পুঁজি করে দেশের ক্ষতি করতেও পিছপা হয় না,
তাদের বিবেকবোধ, নৈতিক বোধ বা ধর্মবোধ কোনটিই নেই।
তাহলে স্বাধীনতা আর কতদিন তুমি শিকলবন্দি হয়ে রবে?
যদি আবারও রক্ত দিতে হয়, যদি আরেকটি মায়ের বুক খালি হয়।
তাহলে এদেশের দৃঢ়প্রাণদীপ্ত, তেজোদীপ্ত প্রাণগুলো আর ছেড়ে কথা বলবে না
তখন এই দুঃসময় যতই গভীর আর প্রকট হোকনা কেন সুদিন আসবেই।
বাঙালিদের কেউ দাবায়ে রাখতে পারেনি, আর পারবেও না,
তাই বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত আসবেই।

তানজিনা ইসলাম, ইংরেজি বিভাগ, রোকেয়া হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাইয়ের অঙ্গীকার

রেদওয়ান ইসলাম রিদয়

জুলাই আসে বিপ্লবের আহ্বান নিয়ে
চোখে ঝলমল আগুনের আভা,
হৃদয়ে বাঁধে প্রতিবাদের সুর,
মাটিকাঁপে, কাঁপে স্বৈরাচারের অট্টালিকা

এই মাসে বাঁচে মানুষের স্বপ্ন,
ঘুমিয়ে থাকা ইচ্ছেরা খুঁজে পায় পথ
নির্যাতিতর কণ্ঠে গর্জে ওঠে বজ্রধ্বনি
স্বাধীনতার চেয়ে বড় আছে কি কিছু দামি?

জুলাই বলে, ভয় পেয়ো না তুমি,
স্বৈরাচারের বাধা ভাঙতে শিখো।
নির্বিকার রাত ভেঙে ফিরিয়ে আনো সমতা
আকাশে তোলো বিপ্লবের জয়ধ্বনি

এই মাস কেবল তারিখ নয়,
এ মাস আবু সাঈদ, ওয়াসিম, মুগ্ধ এবং
ছোট্ট রিয়া গোপসহ সকল
শহীদদের চেতনার অমর গান।
জুলাই জাগায় প্রতিশ্রুতি নতুন,
মানুষের মুক্তি, মানবতার বিজয়

রেদওয়ান ইসলাম রিদয়, ৩য় বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, শহীদ শামসুজ্জোহা হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জেগে ওঠো বাংলা

মো. সবুজ আহমেদ

হায়েনারা দিয়েছে হানা
নেমেছে ঘোর আঁধার,
চারিদিকে হাহাকার শুনি
রাজপথ রক্তাক্ত বাংলার।

রক্ত দিল আবু সাঈদ
ওয়াসিম-মুগ্ধ আরো,
আর দেবো না তাজা প্রাণ
শক্ত হাতে এবার লাঠি ধরো।

হিসেব নেবো কড়ায়গন্ডায়
সংগ্রামী চেতনা জনতার
রুখে দেবো বৈষম্য-স্বৈরাচার
সময় এখন দাঁড়াবার।

যুগ-যুগান্তের অধীনতা
মানি না আর মানবো না,
অস্ত্র ধরো যুদ্ধ করো
মুক্ত কর দুর্বৃত্ত-হায়েনা।

আর হবে না আপস কোনো
চলছে, চলবে লাগাতার,
করবো আদায় রাজপথে
যত আছে ন্যায্য অধিকার।

নূতনেরে করতে বাস
নির্মূল হোক নাশকতার,
জেগে ওঠো বাংলা তুমি
সংগ্রামী চেতনা জনতার।

মো. সবুজ আহমেদ, ৩য় বর্ষ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, শেরে বাংলা ফজলুল হক হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

অবিস্মৃত আখ্যান

মাহাইর ইসলাম

আমাদের ট্যাক্সের টাকায় চলা পুলিশ কীভাবে আমাদের বুকগুলোকে বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে,
আমরা তা বিস্মৃত হইনি
আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হবো না।

অধিকার চাইতে গেলে কীভাবে আমাদের ভাই আবু সাঈদকে প্রকাশ্য রাজপথে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে,
আমরা তা বিস্মৃত হইনি
আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হবো না।

পিপাসার্ত সহপাঠীদের মাঝে পানি বিতরণ করতে গিয়ে স্বৈরাচারের গেস্টাপো বাহিনীর হাতে কীভাবে খুন হয়েছে মীর মুগ্ধ,

পুলিশের বেপরোয়া গুলিতে কীভাবে বাসার বারান্দায়, ছাদে, শয়নকক্ষে থাকা নারী ও শিশুরাও মুহূর্তের ব্যবধানেই লাশ হয়ে গেছে,
আমরা তা বিস্মৃত হইনি
আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হবো না।

হেলিকপ্টার থেকে ছোঁড়া গুলিতে কীভাবে 'ফুল হয়ে ফোটার আগেই ঝরে পড়লো আহাদ, রিয়া, সামির ও তাহমিদের মতো সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের পাপড়িগুলো,
আমরা তা বিস্মৃত হইনি
আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হবো না।

মায়ের সাথে বিজয় উদ্‌যাপন করতে গিয়ে পরাজিত ঘাতকের গুলি কীভাবে নিঃশেষ করে দিল ৫ বছরের শিশু ইফাতের প্রাণ
মামার বাড়িতে বেড়াতে এসে কীভাবে চিরদিনের জন্য পৃথিবীকে বিদায় জানাতে হলো এইচএসসি পরীক্ষার ফলপ্রত্যাশী নাফিসাকে,
আমরা তা বিস্মৃত হইনি
আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হবো না।

আমরা বিস্মৃত হইনি-
রিকশার পাদানিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝুলে থাকা শহিদ নাফিজের নিথর রক্তাক্ত লাশের কথা।
আমরা বিস্মৃত হইনি-

দিনে-দুপুরে খুন করে আগুনে পুড়িয়ে কালো ভস্মে পরিণত করা লাশগুলোর কথা।
বিস্মৃত হইনি- পুলিশের গাড়ির ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলা ইয়ামিনের নিথর মরদেহের কথা।

আমরা বিস্মৃত হইনি
পুলিশ উপকমিশনারের "গুলি করি, মরে একটা, আহত হয় একটা, একটাই যায়, স্যার, বাকিডি যায় না।"র মতো রক্ত বরফ করা মন্তব্যের কথা।
আমরা বিস্মৃত হইনি
'একজনকে মারতে বুকে কয়ডা গুলি করতে হয়, স্যার?' বলে ছুঁড়ে দেওয়া শহিদের পিতার প্রশ্নের কথা।
বিস্মৃত হইনি 'মা, আমি মিছিলে যাচ্ছি। আমি নিজেকে আর আটকিয়ে রাখতে পারলাম না' বলে মিছিলে গিয়ে শাহাদত বরণ করা কিশোর শাহরিয়ার আনাসের কথা।

আমরা বিস্মৃত হইনি
ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়ে পৃথিবীর নিকৃষ্ট এক গণহত্যায় মেতে ওঠা ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারের কথা।
আমরা বিস্মৃত হইনি
ক্ষমতার নেশায় উন্মাদ হয়ে ছাত্র হত্যার জন্য দলীয় সন্ত্রাসীদেরকে শাসক কর্তৃক 'শুট অ্যাট সাইট' নির্দেশ দেওয়ার কথা।
বিস্মৃত হইনি দীর্ঘ ১৬টি বছর ধরে গোটা দেশটাকে এক মূর্তিমান বন্য জানোয়ারের অভয়ারণ্যে পরিণত করার ইতিহাস।

আমরা বিস্মৃত হইনি
আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হবো না।
পৃথিবীর মানচিত্রে যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, মানব সভ্যতায় যতদিন মহাপ্রলয়ের আগমন না হবে, আমরা এইসব ইতিহাস কাউকেই বিস্মৃত হতে দিব না।

শহিদেরা আমাদের জামিনদার।
তাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা বন্ধক পেয়েছি এই দেশ।
শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকু থাকতে, রুহের শেষ প্রশ্বাসটুকু থাকতে শহিদের লাশের সাথে আমরা কোনো আপস বরদাস্ত করতে পারি না এবং কিছুতেই পারবো না।

আমরা বিস্মৃত হইনি।
আমরা কিছুতেই বিস্মৃত হবো না।

মাহাইর ইসলাম, আরবি বিভাগ, শহীদ জিয়াউর রহমান হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই নয় চেতনা

এমরান হোসেন

যখন স্বৈরাচারে বুঁদ হয়েছিল, আমার এই দেশ মাতৃকা।
যখন দাগ লেগেছিল, এই দেশের স্বাধীন পতাকায়।
যখন রক্ষক হয়ে গেল ভক্ষক, ছিড়ে খাচ্ছিলো দেশের মানচিত্র।
উন্নয়ন উন্নয়ন বলে কেড়ে নিলো, বাঙালি জাতির সর্বস্ব।
হঠাৎ একদিন জেগে উঠলো,বাংলা মায়ের প্রাণ।
সব অন্যায় রুখে দিলো, বাংলা মায়ের সন্তান।
আজ আমি ধ্রুব নক্ষত্রের মতো, সত্যের কথা বলছি।
আজ আমি অবিস্মরণীয়, জুলাই বিপ্লবের কথা বলছি।
সেদিন রাস্তায় নেমেছিল, হাজারো বাংলা মায়ের সন্তান।
স্বৈরাচারী কেড়ে নিলো অগণিত প্রাণ, তারা হলো বলিদান।
আজ আমি শহীদের কথা বলছি।
সেদিন দেশ মাতৃকার বুকে, পড়েছিল শকুনির থাবা।
রক্ষা পায়নি অবুঝ শিশুও দিশেহারা তার বাবা।
শুদ্ধ রক্তে ভেসেছিলো সেদিন রাস্তা-উদ্যান।
আজ আমি স্বাধীনতার পুণর্জন্মের কথা বলছি।
সেদিন দেশ মাতৃকা রক্ষায়, রাস্তায় নামলো হাজারো তরুণ প্রাণ।
বন্দুকের নলে বুক ঠেকিয়ে দিলো, আবু সাঈদ, মুগ্ধের মতো বলবান।
আজ আমি কিছু চিরঞ্জীবীর কথা বলছি।
সেদিন হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, সমস্বরে গেয়েছে মাতৃভূমির জয়গান।
মিছিলে নগরী, উত্তাল জনপদ, রাজপথ হলো শ্মশান।
আজ আমি অসাম্প্রদায়িক বাংলার কথা বলছি।
সেদিন অস্ত্রবিহীন জনতা, উপড়ে দিয়েছে স্বৈরাচারীর মসনদ।
চারদিক থেকে বেজে উঠলো বিপ্লব বিপ্লব।
অবশেষে ছাত্র-জনতা করলো বিজয়ের অভ্যুত্থান, ঘটালো স্বৈরাচারীর অবসান।
আজ আমি জুলাই বিপ্লবের বীরগাথা বলছি।
রাখবে তো বুকে এই চেতনা?
বাংলাদেশ আমি তোমাকে বলছি।

এমরান হোসেন, ১ম বর্ষ, সমাজকর্ম বিভাগ, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

তিপ্পান্ন বছর পেরিয়ে

তন্ময় গোস্বামী

তিপ্পান্ন বছর পেরিয়ে রাজপথে দাঁড়িয়ে
কী চেয়েছি? কী পেয়েছি?
চেয়েছি সাম্য পেয়েছি বৈষম্য।
চেয়েছি অধিকার পেয়েছি অন্ধকার
তিপ্পান্ন বছর পেরিয়ে রাজপথে দাঁড়িয়ে
রক্তের আলপনায় কেন হলো সন্ধ্যায়?
আমরা তো সাধারণ তবে কেন রক্তক্ষরণ?
তিপ্পান্ন বছর পেরিয়ে রাজপথে দাঁড়িয়ে
ছিলোনা তো কোনো ভুল তবে কেন দিতে হলো মাশুল?
যায় কি দিনকাল চিরদিন চিরকাল।
তিপ্পান্ন বছর পেরিয়ে রাজপথে দাঁড়িয়ে
আবার জ্বলছে আগুন আসবে নাকি আরেক ফাগুন?
আবার এসেছে বান যদিও নিয়ে যাক প্রাণ।
তিপ্পান্ন বছর পেরিয়ে চব্বিশে দাঁড়িয়ে
পেয়েছি আমি পেয়েছি যা আমি চেয়েছি।

তন্ময় গোস্বামী, ২য় বর্ষ, সমাজকর্ম বিভাগ, বিজয়-২৪ হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইনকিলাব

মো. মেহেদী হাসান

যাঁদের ত্যাগে পেয়েছো আজ
মুক্ত স্বাধীন ভূমি,
তাঁদের রক্ত কেমন করে
বৃথা যেতে দেবে তুমি?
তুমি না হয় পারোনি আজ
তাঁদের সমান হতে,
তাঁদের স্মৃতি মনে রেখো
জন্মান্তর ধরে।
বুকে যাঁদের বিদ্ধ হলো
ছররা গুলির আঘাত,
স্বৈরাচারের পতন ঘটলো
ক্ষমতা হলো বেহাত।
স্বাধীনতা পেয়েছ বলেই
চলবে নিজের মতো,
তোমার ভাই না মরলে
ভেবেছ কী হতো?
রুদ্ধ থাকত কণ্ঠ তোমার
কেড়ে নিত তারা বুলি,
চক্ষু থাকলেও দেখতে পেতে না
চোখে থাকত ঠুলি।
যাঁদের রক্তে পেলে তুমি
এমন স্বাধীনতা,
বিবেক থাকলে বুঝবে ঠিকই
এখনো বেঁচে আছে মানবতা।
স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাইলে
জেগে ওঠো বীর বেশে,
বিশ্ব মিডিয়ায় চোখ রেখে দেখো
আজ কী বিক্ষোভ চলছে দেশে দেশে!
তোমার ভাইদের আদর্শ মেনে তারা

উদ্ধত হয়েছে নিজ প্রাণ দিতে,
তুমি কেন ঘুমিয়ে আছো?
ক্ষণে ক্ষণে দাঁড়াচ্ছ তাঁদের বিপরীতে।
জেগে ওঠার এখনি সময়
প্রস্তুত হও বীর সৈনিক,
অক্ষুণ্ন রাখতেই হবে এই স্বাধীনতা
প্রয়োজনে মৃত্যুর স্বপ্ন দেখো দৈনিক।

মো. মেহেদী হাসান, ২য় বর্ষ, ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, নবাব আব্দুল লতিফ হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ইতি জুলাই আখ্যান

মো. রায়হান আলী

পশ্চিম আকাশে একবার তাকিয়ে দেখো তো!
কী দেখতে পাও?
লাল আভা! ওটা লাল আভা নয়।
ওটা আবু সাঈদের বুকের রক্ত।
তুমি উত্তর থেকে তাকে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিলে
সেই ঠাঁই নিয়েছে পশ্চিমে
তুমি তাকে জমি থেকে উৎখাত করতে চেয়েছিলে
সে জায়গা করে নিয়েছে তোমার মাথার ওপরে।
আজ তাকে সকলেই উপরে তাকিয়ে দেখে
আর তোমাকে ধিক্কার জানায়।
পশ্চিমের আকাশে যতগুলো লাল আভা দেখতে পাও,
তার সকলি তোমাকে জানানো ধিক্কার।
খুন, গুম, হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে
রক্ত গঙ্গায় গা ভাসিয়ে তুমি যখন
স্নান করতে যাও জলে
জল তখন কথা বলে "পানি লাগবে! পানি লাগবে!"
তখন তোমার বুক কেঁপে ওঠে না?
তখন তোমার হৃদয়ে অনুশোচনার বান ডাকে না!
তখন তোমার মনে হয় না! তুমিও একজন মা?
তোমারও সন্তান আছে!
মিটিং-এ মিছিলে-সভাতে যে অশ্রু ঝরানোর অপচেষ্টা তুমি চালাও-তখন সে অশ্রু
তোমাকে অভিশাপ দেয়;
তা কি তুমি জান? তা কি তুমি বোঝ?
যদি জানতে, যদি তুমি বুঝতে তাহলে হয়ত এত বড়
পাপ তুমি করতে যেতে না।
শোন শোষক, তুমি যতবার তোমার নির্যাতনের হুল ফোঁটাতে আসবে; আমরা ততবার
তোমাকে উপড়ে ফেলব।
আবু সাঈদ, মুগ্ধ এরা তোমাকে দুমড়ে মুচড়ে ফেলবে জনতার ভাগাড়ে।

ক্রোশ-আক্রোশ, ক্ষোভের ইটগুলো দিয়ে তোমাকে ভাড়তে থাকবে। তোমার স্বৈরাচারিতার ঘরে প্রতিবাদের আগুন লাগিয়ে উন্মোচিত করবে গণতন্ত্রের। গণতন্ত্র ভক্ষণকারী তুমি; পেট চিরে বের করে আনবে তারা গণতন্ত্র।
প্রাণনাশ, হুমকি, ধামকি দিয়ে তুমি হয়ত প্রতিহত করতে চাইবে। কিন্তু তুমি হয়ত ভুলে গেছ আমরা এখন প্রাণ দিতে শিখে গেছি।
আর একবার যারা প্রাণ দিতে শিখে যায়
তাদেরকে আর দমিয়ে রাখা যায় না।
তারা ইতিহাস হয়ে ফিরে আসে বারবার।

মো. রায়হান আলী, ৩য় বর্ষ, ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, শহীদ শামসুজ্জোহা হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

স্ফুলিঙ্গ

মির্জা আহমাদ সাদী, মো. জায়িদ হাসান

দ্রষ্টব্যঃ এই নাটকের সকল চরিত্র এবং ঘটনা বাস্তবিক। ব্যক্তিভেদে দৃষ্টিকোণের ভিন্নতার জন্য সংলাপ এবং অভিব্যক্তি খানিক পরিবির্তন হতে পারে। ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রেক্ষাপটঃ কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সরকারের বিরূপ মন্তব্যে সারাদেশের ছাত্রসমাজ ক্ষেপে উঠেছে। ১৪ই জুলাই সন্ধ্যায় সরকার শিক্ষার্থীদের 'রাজাকার' বলায় সেদিন রাতেই ঢাবি, রাবি, জাবিসহ দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্লোগান উঠে- 'তুমি কে, আমি কে? রাজাকার রাজাকার! কে বলেছে, কে বলেছে? স্বৈরাচার সরকার!' সরকার তার পোষা সন্ত্রাসী বাহিনী ছাত্রলীগকে সাধারণ ছাত্রদের উপর লেলিয়ে দেয়। সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর সশস্ত্র হামলা করে।

সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ক্রমে সারাদেশে প্রতিরোধ গড়ে উঠে। এরই খুবই ছোট্ট এক অংশ দেশের একপ্রান্তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষার্থীর দৃষ্টিতে জুলাই আন্দোলনের একটা দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

চরিত্র বর্ণনাঃ

১। অমিত-সেশন ১৯-২০, মাদার বখ্শ হল (প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগ)
২। পূরক -সেশন ১৯-২০, শহীদ শামসুজ্জোহা হল (প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগ)
৩। রাতুল-সেশন ১৭-১৮, মাদার বখ্শ হল (আইন ও ভূমি প্রশাসন বিভাগ)
৪। সাকিব-সেশন ১৯-২০, শহীদ শামসুজ্জোহা হল (পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)
৫। তানভীর-সেশন ২০-২১, মাদার বখ্শ হল (সমাজকর্ম বিভাগ)
৬। খালিদ-সেশন ১৯-২০, মাদার বখ্শ হল (পপুলেশন সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট বিভাগ)
৭। নির্জন-সেশন ১৯-২০, শামসুজ্জোহা হল (আইন বিভাগ)
৮। সামিহা-সেশন ১৭-১৮, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগ
৯। আহাদ-সেশন ১৮-১৯, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগ
১০। ছাত্রলীগ-রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ এবং তাদের সাথে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালানো রাজশাহী অঞ্চলের ছাত্রলীগের কর্মী সমর্থক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য-

সময় ১৫ জুলাই, ২০২৪, সন্ধ্যাবেলা।

[মাদার বখ্‌শ হলের সামনের চায়ের দোকানে বসে আছে রাতুল, অমিত, তানভীর, খালিদ, মেরাজুল। ১৫ তারিখ ভোর বেলা থেকে সারাদিন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ২০/২৫টা বাইক নিয়ে সারাদিন ক্যাম্পাস টহল দিচ্ছে। ক্যাম্পাসে থমথমে অবস্থা, সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা, কিন্তু কেউ প্রকাশ্যে কিছু বলার বা করার সাহস করে উঠতে পারছে না। সারাদেশে ছোটখাটো কর্মসূচি থাকলেও রাবি ক্যাম্পাসে কিছু হয়নি। ১৬ তারিখে সব ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে। ১০-১২টা বাইকে লাঠিসোঁটা হাতে ছাত্রলীগের কর্মীরা এসে চেচিয়ে চেচিয়ে সবাইকে উদ্দেশ করে বলছে যে, সবাই রুমে থাকবি। কাল কাউরে যেন বাইরে না দেখি।]

তানভীরঃ অমিত ভাই, এইডা কোনো কথা? (উত্তেজিত স্বরে)

অমিতঃ ভাবা যায়? এমনে কইরা ভয় দেখাইয়া সবাইরে থামাইয়া রাখবে? কিছু একটা করা দরকার। (কণ্ঠে উদ্‌বেগ, চোখে মুখে ক্ষোভ)

রাতুলঃ কী করা যায়? কীভাবে করবি? আমরা তো অল্প কয়জন। লোকজন আসবে?

অমিতঃ ভাই, আজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা হইছে। সারাদেশে সাধারণ ছাত্ররা মাইর খাইতেছে। আমার বিশ্বাস যদি আমরা ৫০-১০০ জন জড়ো হইয়া মিছিল নিয়ে বের হইতে পারি তাইলে সবাই জয়েন দেবে।

মেরাজুলঃ ওরা (ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা) অস্ত্র সস্ত্র নিয়ে ঘুরতেছে। বের হবার কয়েক মিনিটের মধ্যে বড়সড় হামলা হবে।

অমিতঃ হামলা তো হবেই, কিন্তু যদি আমরা শুরুতে মাইর খাইয়াও টিকে থাকতে পারি, তাইলে বাকিরা শীঘ্রই আমাদের সাথে যোগ দিবে। ৩৬ হাজার শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয় তিন-চারশো মানুষ তো আসবেই।

রাতুলঃ টিকে থাকা যাবে। প্রস্তুতি নিয়ে বের হতে হবে। ওরা মারলে যাতে আমরাও প্রতিরোধ গড়তে পারি। সবার বন্ধু বান্ধবরে ফোন দে। হলের পরিচিত মানুষদের সাথে কথা বল।

খালিদঃ ভাই, সত্যিই বের হবেন? প্রায় রাত, অন্ধকার হয়ে আসছে। এখন বের হলে ছাত্রলীগের মার খেয়ে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে।

রাতুলঃ আগে সবাইরে ফোন দে, মানুষ কীরকম হয়। কিছু একটা করা লাগবেই।

অমিতঃ তানভীর, কারে কারে বলা যায় বল। রফিকরে ডাক। আরো যে যে আছে। আমি দেখি আমার ডেপ্টের বন্ধু বান্ধবদের ফোন দিয়ে , আর হলের প্রথম ব্লকে আমার বেশ পরিচিত মানুষ আছে উনাদের সাথে কথা বলব।

তানভীরঃ আচ্ছা ভাই, দেখতেছি।

রাতুলঃ আমাদের দীপ্ত আর ডেপ্ট-এর ওরা আসতেছে। তাইলে তোরা ২০ মিনিটে হলের পূর্ব পাশের ২ তলার ছাদে আয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য-

মাদার বখ্শ হলের পূর্ব পাশের দ্বিতীয় তলার ছাদ।

[ইতোমধ্যে পূরক, নির্জন, তুফান, রফিক, অজয়, তন্ময়, রাতুল, পারভেজসহ অন্তত আরো ১৩-১৪ জন জড়ো হয়েছে]

রাতুলঃ কী রে মানুষ তো খুব বেশি হলো না। এত কম মানুষ নিয়ে বের হলে তো খুন হয়ে যাব। (হতাশ সুরে)

অমিতঃ ভাই আরেকটু সময় লাগবে।

তানভীরঃ কালকে ৩টায় প্যারিস রোডে জমায়েত। কালকের জন্য অপেক্ষা করবেন? (আশাহত ভঙ্গিতে)

অমিতঃ আজকে ওরা ঢাবিতে, জাবিতে হামলা করছে। আমাদের ক্যাম্পাসে সবাইরে শাসাইতেছে। আজকেই কিছু একটা করতে হবে।

পূরকঃ বের হওয়া যায় কিন্তু এই সময়ে বের হওয়া বেশ ঝুঁকিপূর্ণ।

রাতুলঃ তো কিছু তো করতে হবে। এভাবে নিজের মতো বসে থাকলে তো হবে না।

পূরকঃ বের হওয়া যায় কিন্তু দুইটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে। রাতের বেলা বের হইলে ওরা খুব মারাত্মক হামলা করলেও সেটা অনেকে জানতেও পারবে না, আর আমাদের সবাইকে একসাথে থাকতে হবে। নাহলে বের হওয়া খুব একটা ফ্রুটফুল হবে না।

খালিদঃ এভাবে নিজেরা চিন্তা করতে থাকলে তো কোনো লাভ হবে না।

পূরকঃ হুর বেটা, যা করে করুগগা। বের হইলে চল বের হই। (উত্তেজিত হয়ে)

নির্জনঃ হ, মাইরা ফেলে মাইরা ফেলুক আমারে। (চেচিয়ে)

[এভাবে, আরো কিছুক্ষণ নানা কথা বার্তা শেষে সিদ্ধান্ত হয় আরো একটু সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে]

রাতুলঃ এভাবে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। চল একটু হেঁটে আসি বাইরে থেকে।

মেরাজুলঃ আমি যামু না, তোরা যা। (করুণ সুরে)

অমিতঃ তুই না একটু আগে কইলি যাবি? (ক্ষেপা কণ্ঠে)

মেরাজুলঃ একবার যামু কইছি তাই যাওয়া লাগবে, আমি যামু না। (রেগে গিয়ে)

রাতুলঃ কী রে, তোরা এমনে করলে কেমনে?

[তারপর সবাই একে একে প্রস্থান করে, শেষে মেরাজুলও পেছনে পেছনে যায়]

তৃতীয় দৃশ্য-

[স্টেশন বাজারের চায়ের দোকানের সামনে ওরা গোল হয়ে বসে আছে, চায়ের কাপ হাতে আলোচনা করছে।]

রাতুলঃ অমিত, তাহলে বের হবি না?

অমিতঃ ভাই, বুঝতেছি না। জাইদ, তানভীর, খালিদ? কী কস কী করমু? সবাই তো কইতেছে আজ বের হইলে বিশাল গ্যাঞ্জাম হয়ে যাবে। ফোনে যাদের সাথে কথা কইলাম ওরা কইতেছে কাল সবাই বের হবে।

নির্জনঃ করমু গ্যাঞ্জাম, গ্যাঞ্জাম করমু না তো চুড়ি পইরা বইয়া থাকুম?

পূরকঃ আমি আছি, বের হইলে চল। বইসা থাকার চাইতে বের হইয়া মাইর খাওয়া ভালো। তবে বের হইলে সবাইকে একসাথে থাকতে হবে। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে মারা পরতে হবে।

রাতুলঃ এক কাজ করি চল, আমরা সবাই মিলে হলে গিয়ে স্লোগান তুলি। হলে যারা আছে তারাও অনেকে যোগ দিবে।

পূরকঃ তিন ভাগে ভাগ হয়ে তিন ব্লকে চলে যেতে হবে, তারপর একসাথে স্লোগান শুরু করব। কয়েকজন স্লোগান ধরলে বাকিরাও জয়েন দিবে।

অমিতঃ করিডোরের লাইট অফ করতে হইব। আর স্লোগান তুলবে কে? তানভীর পারবি না?

তানভীরঃ পারব ভাই। কী কী স্লোগান হবে ঠিক করেন।

অমিতঃ প্যারা নাই, স্লোগান ঠিক করে দিচ্ছি সবাই মিলে। রাতুল ভাই, কে কোথায় থাকবে?

রাতুলঃ আমি, মেরাজুল, তুফান, অজয় সেকেন্ড ব্লকের সেকেন্ড ফ্লোরে থাকব। অমিত তুই পূরক, নির্জন ওদের নিয়ে সেকেন্ড ব্লকের তিন তলায় থাকবি, তোর রুমের সামনে। আর দীপ্তরা যাবি থার্ড ব্লকে।

অমিতঃ তানভীররা তাইলে ফার্স্ট ব্লকের চার তলায় যাক, অইখানে মোশারফ ভাইরা আছে, ভালো সাপোর্ট পাবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য-

[মাদার বখ্শ হলের প্রায় সব করিডোরের লাইট অফ। রাত সাড়ে দশটার মতো। অনেকেই নিজের রুমে। সবাই গ্রুপ করে নিজেদের ঠিক করা ব্লকে, ফ্লোরে চলে গেছে।]

পূরক (দ্বিতীয় ব্লকের তিনতলায় সরণ ভাইয়ের রুমে উঁকি দিয়ে): ভাই কেমন আছেন, কী করেন?

সরণ: এই তো আছি রে। ক্যাম্পাসে আজকে কী হলো? সারাদিন দেখলাম বাইক নিয়ে ছাত্রলীগ ঘুরছে।

পূরক: হ্যাঁ, ভাই, কিছু হয়নি আজকে। এখন করব।

সরণ ভাই (অবাক হয়ে): এখন মানে? হলে করবি?

পূরক: হ্যাঁ, ভাই এখনই (বলতে বলতে প্রস্থান..)

তানভীর (প্রথম ব্লক থেকে): কোটা না মেধা?

পূরক (দ্বিতীয় ব্লক থেকে): মেধা, মেধা!

তানভীর (প্রথম ব্লক থেকে): অ্যাকশন অ্যাকশন..

পূরক, অমিত: ডাইরেক্ট অ্যাকশন!

রাতুল (দ্বিতীয় ব্লক থেকে): আপস না সংগ্রাম?

প্রথম ব্লক থেকে: সংগ্রাম সংগ্রাম!!

দ্বিতীয় ব্লক থেকে: জেগেছে রে জেগেছে..

তৃতীয় ব্লক থেকে: ছাত্রসমাজ জেগেছে।।

প্রথম ব্লক থেকে: লেগেছে রে লেগেছে..

দ্বিতীয় ব্লক থেকে: রক্তে আগুন লেগেছে।।

--কোটা না মেধা? মেধা, মেধা!!
--আপস না সংগ্রাম? সংগ্রাম, সংগ্রাম!!
--দালালি না রাজপথ? রাজপথ, রাজপথ!!
--আমার সোনার বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই।
--অ্যাকশন অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন!
--জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্রসমাজ জেগেছে!
--লেগেছে রে লেগেছে, রক্তে আগুন লেগেছে!
- হইই.., কোটা না মেধা? মেধা, মেধা!!...

[সবাই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, ইতোমধ্যে রুম থেকে বেরিয়ে অনেকেই স্লোগানে অংশগ্রহণ করেছে। অনেকে রুম থেকে বের হয়ে প্লেট বাটি নিয়ে শব্দ করছে। স্লোগানের আওয়াজ হলের আশেপাশে ছড়িয়ে পরছে। প্রায় আধাঘণ্টার মতো স্লোগান চলে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য-

[টের পাওয়া মাত্রই, সারা ক্যাম্পাস হতে ছাত্রলীগের দেড়/দুশো কর্মী রড আর চাপাতি হাতে মাদার বখ্শ হলে এসে হাজির। এতক্ষণে ওরা (আন্দোলনকারী) রুমে ঢুকে পরেছে। লাইট অফ থাকায় কে স্লোগান দিচ্ছিল স্পষ্ট করে কেউ চিনতে পারেনি। ছাত্রলীগ এমন কিছু আশা করেনি, এত স্পর্ধা কে দেখাল তা খোজার জন্য হলের রুমে রুমে যাচ্ছে। ওদিকে কিছু নিউজ মিডিয়ায় সব লাইভ হচ্ছে।]

জনৈক ছাত্রলীগ কর্মী (প্রথম ব্লকের কোনো এক রুমের দরজায় নক করে): দরজা খোলেন।

রুমের শিক্ষার্থী: কে?

ছা.ক.: আমি গালিব ভাইয়ের লোক, দরজা খোলেন। ভাই আপনাদের কথা বলবে।

[ছাত্রলীগ রুমে রুমে গিয়ে তল্লাশি চালাতে থাকে। যারা স্লোগান দিয়েছে তাদের ধরার জন্য। এদিকে তানভীর নিরাপত্তার জন্য পূরক আর নাঈমের সাথে আশ্রয় নিয়েছে জোহা হলে।]

[অমিত দরজা খোলে উঁকি দিয়ে বারে বারে দেখছে সামনের প্রথম ব্লকে ছাত্রলীগ কী করছে। রাতুল ভাই-এর পাশের রুমে মেরাজুল ভয়ে কাঠ, আর তুফান টেবিলের নিচে বসে আছে। ছাত্রলীগ এক রুম এর দরজা খোলে কয়েকজনকে বকাঝকা করে ওদের ভাষায় কালপ্রিট খোজার চেষ্টা করছে। (সব লাইভে দেখানো হচ্ছে)।]

তৃতীয় দৃশ্য-

[প্রায় ৫০ জনের মতো ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী হলের গেটে অবস্থান নেয়, ভীতি প্রদর্শনের জন্য। রাতুল আর অমিত হলের বাইরে বের হয়েছে পরিস্থিতি দেখার জন্য।]

অমিত: ভাই, হুদাই বের হইলেন। এহন যদি জিজ্ঞেস করে কিছু ওরা। আমার গলা ভাঙা ধরা খাইয়া যামু।

রাতুল: থাম, ওদের দিকে তাকাবি না। একটু হাটাহাটি করে আসি অন্যদিকে চল।

[এরপরে বাকি যারা অন্য হলের ছিল তারা ঘণ্টা খানেক পরে হল ত্যাগ করে, রাতুল ভাই সবাই কে কোথায় আছে খোঁজ নিতে থাকে। এভাবেই ভয়ে, আতঙ্কে ওদের রাত শেষ হয়। খুব ভোরে হল ত্যাগ করে চারুকলার পাশে বন্ধুর বাসা মেহেরচন্ডীতে আশ্রয় নেয় অমিত।]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

১৬ জুলাই, দুপুর ১টা।

[মাদার বখ্‌শ-এর পাশের চায়ের দোকান। প্ল্যান মাফিক রাতুল, পারভেজ, খালিদ, অমিত, অজয়, তানভীর, নির্জন, রিমন, কাদের, আবুবকর, নিলয়, জয়, রিয়াদ, সবুজ, সঞ্জয়, রেজওয়ানসহ আরো অনেকেই এদিকে সেদিক বসে আছে। সামনেই মাদার বখ্‌শ হলের গেটে জড়ো হয়ে হলের গেট বন্ধ করে দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে ছাত্রলীগের চ্যালারা (যাতে ছাত্ররা বের হতে না পারে)।]

পারভেজঃ শেখ হাসিনা যে জোর করে ক্ষমতায় আছে সেটা পাগলেও বুঝে, কিন্তু রাজাকার স্লোগান দেওয়া ঠিক হয়নি।

রাতুলঃ মানুষের এতদিনের পোষা রাগ ক্ষোভের প্রতিবাদের ভাষা এত কিছু হিসাব করে তো হয় না।

পারভেজঃ তবুও রাজাকার বলার পক্ষে নাই আমি।

খালিদঃ কিন্তু ভাই, প্রধানমন্ত্রীর মতো এমন চেয়ারে বসা একজন মানুষ এরকম মন্তব্য করলে মানুষ চুপ থাকবে কীভাবে?

পারভেজঃ আন্দোলন করা উচিত না বলছি না কিন্তু এমন ভাষাপ্রয়োগের পক্ষে না আমি।

অমিতঃ এখন কার কী মনে হয় এত ভেবে কী হবে। কিছু তো করা দরকার। এভাবে আর কত? রাতুল ভাই চলেন বের হই।

রাতুলঃ মিছিল জিয়া হল থেকে আসলে আমরা যোগ দিব, জোহা হল ও সোহ্‌রাওয়ার্দী হলও আমাদের সাথে যোগ দিবে, একটু পরিস্থিতি বুঝি। অপেক্ষা কর।

অমিতঃ কিন্তু ওরা জিয়া হল থেকে বের হতে পারবে?

রাতুলঃ এখনো তো ৩টা বাজে নাই, সময় আছে। অপেক্ষা করে দেখি।

[সাকিব, পূরক, নির্জন জোহা হলের দিক থেকে এসে পৌঁছায়]

পূরকঃ রাতুল ভাই, চলেন এখন বের হই। আর ভালো লাগতেছে না। আর দেরি করা যাবে না।

সাকিবঃ জিয়া হল থেকে আমার ডিপার্টমেন্টের ফ্রেন্ডরা মিছিল বের করবে। ওখানে যাই?

পূরকঃ আমি ফাহিমের সাথে কথা বললাম সকালে। আজকে ক্যাম্পাসে বড় সমাবেশ করার পরিকল্পনা করছে ওরা। আজকে আমি রুমে বসে থাকতে পারব না।

রাতুল: এদিকে পরিস্থিতি বুঝে নেই রে! এত তাড়াহুড়া করা ঠিক হবে না।

সাকিব: রাতুল ভাই! তাহলে আমি, পূরক, অমিত একটু জিয়া হলের সামনে থেকে অবস্থা দেখে আসি।

রাতুল: যা, ফোনে খবর দিস।

অজয়: অমিত, দাড়া আমিও যাব।

[এরপর ওরা চারজন জিয়া হলের দিকে অগ্রসর হয়।]

দ্বিতীয় দৃশ্য-

[জিয়া হলের সামনে ছাত্রলীগের অনেকে অবস্থান করছে, আন্দোলনকারীরা এখনো বের হতে পারেনি।

অবস্থা সুবিধার না। ছাত্রলীগ যথারীতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাইকে পুরো ক্যাম্পাস টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।]

জনৈক ছাত্রলীগ কর্মী: (চিৎকার করে) এই হল থেকে যদি কোনো মিছিল বের হতে দেখি খবর আছে।

পূরক: (সাকিবকে উদ্দেশ করে নিচু স্বরে) কিরে তোর ফ্রেন্ডদের কী অবস্থা? মনে তো হয় না বের হতে পারবে এই সিচুয়েশনে।

সাকিব: তাই তো মনে হচ্ছে। এখন কী করবি? আবার মাদার বখ্শ হলের দিকে যাব?

অমিত: অইদিকে আর যাইতে ইচ্ছা করতেছে না।

পূরক: আয় তো প্যারিস রোডেই যাই। ওখানে আজকে মানুষ হবে। না হলে তখন দেখা যাবে।

সাকিব: (ইতস্তত করে) যাবি? যাওয়া যায়।

অমিত: সবাই একসাথে গ্রুপ করে যাওয়া ওয়াইজ হবে না। এমনভাবে যেতে হবে যেন দেখে মনে হয় এমনিই যাচ্ছি।

সাকিব: আমি ছাতা নিয়ে আসছি। রাম্তার একপাশ দিয়ে আমি ছাতা নিয়ে যাই, তোরা দুইজন অন্যপাশ দিয়ে যা।

পূরক: তাই করি চল। সামনে যা হয় দেখা যাবে।

[দুইজন করে বের হয়ে গেল ওরা। একপাশে অমিত, পূরক। আরেক পাশে সাকিব আর অজয় কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে হাটছে।]

তৃতীয় দৃশ্য-

[দুইজন করে হেটে ওরা হবিবুর মাঠ হয়ে দ্বিতীয় বিজ্ঞান ভবনের পূর্ব পাশের রাস্তা দিয়ে টিএসসিসির সামনে হয়ে যাচ্ছে। অমিত আর পূরক কিছুটা সামনে, সাকিব আর অজয়

কিছুটা পিছনে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে। এদিকে ছাত্রলীগের বাইকের মহড়া পরিবহণ মার্কেট হয়ে প্রথম বিজ্ঞান ভবনের সামনে দিয়ে আসছে টিএসসিসির সামনের রাস্তার দিকে টার্ন নিবে।]

ছাত্রলীগ কর্মী ১: (দুইজনকে একসাথে হেটে যেতে দেখে) এই শুয়োরের বাচ্চারা, কই যাস? হলে যা।

ছা.ক. ২: এই মাদারচোদ এইদিকে কী করস? হলে যা নাইলে গোয়া দিয়া আন্দোলন ভইরা দিমু।

[পূরক আর অমিত কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে আস্তে আস্তে প্রথম বিজ্ঞান ভবনের সামনে দিয়ে কোনাকুনি হাটতে থাকে। সামনের কয়েকটা বাইক রানিং এ চলে যায় তবে শেষের দিকের কয়েকটা বাইক তাদের দিকে আসতে থাকে।]

ছা.ক. ৩: (বাইক থেকে চিৎকার করতে করতে) বাইঞ্চোদগুলারে ধর তো। এরা এদিকে কী করে!

[মুহূর্তেই ৬-৭ জন ছাত্রলীগ কর্মী (খুব সম্ভবত বহিরাগত, কারণ তাদের বয়স সাধারণ ছাত্রদের তুলনায় অনেক বেশি মনে হচ্ছিল) পূরক আর অমিতকে ঘিরে ধরে। সাকিব কোনোরকমে ছাতা নিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। ওকে লক্ষ করেনি ছাত্রলীগ।]

ছা.ক. ৪: (দুইজনকে উদ্দেশ করে) হলের দিকে যা মাদারচোদ, দৌড়া! ক্যাম্পাস কী কাজ তোদের?

পূরক: ভাই, এমনিই ক্যাম্পাসে বের হয়েছি একটু ওদিকে যাব।

অমিত: আমরা ক্যাম্পাসে হাটতেছি, একটু পরিবহণে যাব, ল্যাবের জন্য গ্লাভস কিনতে হবে।

ছা.ক. ৩: ধুর নাটকির পোলা তোর ল্যাব পুটকি দিয়া হান্দাই দিমু।

পূরক: আরে আপনারা এমন করতেছেন কেন? আমাদের ক্যাম্পাসে আমরা..

[জায়িদের কথা শেষ হবার আগেই বাইক থেকে দুই-তিন জন নেমে এসে পূরককে বড় ডান্ডা দিয়ে আঘাত এলোপাতাড়ি গায়ের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে আঘাত করতে শুরু করে। পূরক চেচায় না, দৌড়ায় না। এইটুকুতে এভাবে আঘাত করতে পারে বিশ্বাস হচ্ছে না। একটু সরে যায় পাশে। অমিত জায়িদের থেকে একটু দূরে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের দিকে অগ্নিচোখে তাকিয়ে আছে।]

ছা.ক. ৪: এই খানকির পোলায় এমনে চাইয়া আছে ক্যান, ওরেও মার।

[দুইজন এসে অমিতরেও মারতে শুরু করে একইভাবে। ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খায়। তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা অনুভব করে না কেউ। এক আধটু মার আটকানোর চেষ্টা ব্যতীত একটা আও, ইউ শব্দও ওরা করে না, বুঝে উঠতে পারছে না।]

ছা.ক. ৫: মাদারচোদেরা দৌড়া!!

[ওরা দৌড়ায় না, আসলে ঠিক কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। মারের প্রকোপ বাড়তে থাকে, পূরক- অমিত রাস্তা পার হয়ে টিএসসিসির পেছনের ঝোপের দিকে হাটা শুরু করে। ২/৩ জন ডান্ডা নিয়ে পিছনে তাড়া করলে ওরা দৌড়াতে বাধ্য হয়।]

ছা.ক. ৬: (দূর থেকে চিৎকারের শব্দ ভেসে আসছে) ভাগ শুয়োরের বাচ্চারা।

[এদিকে সাকিব বন্ধুদের মার খেতে দেখে হতভম্ব হয়ে যায়। নিজেকে প্রথম বিজ্ঞান ভবনের উত্তর পাশের সরু রাস্তায় সরিয়ে নিয়ে আত্মরক্ষা করে। অজয় চলে যায় টিএসসিসির দিকে কোথাও।]

চতুর্থ দৃশ্য-

[পূরক আর অমিত কোনোক্রমেই হাপাতে হাপাতে সিলসিলা রেস্তোরাঁ যাবার রাস্তার দিকে কুরিয়ারের দোকানের সামনে পৌঁছায়।]

পূরক: নিজের দেশে পরবাসী হয়ে গেছি। নিজের ক্যাম্পাসে ও বের হতে পারব না? এখন কী করবি অমিত? (খুবই উত্তেজিত আর রাগের সুরে)

অমিত: যা আছে কপালে, এহন আর কী? আপাতত এইদিকে বইসা থাকি, রাস্তায় তো আর বের হইতে পারতেছি না। (হতাশা আর ক্ষোভের সুরে)

[এদিকে সামিহা, আহাদ, মনি সিলসিলা থেকে বের হয়ে দ্বিতীয় বিজ্ঞান ভবনের দিকে যাচ্ছিল। ওরা ল্যাবে কাজের ফাঁকে দুপুরের খাবার খেতে গিয়েছিল। ওদের সামনে পরে অমিত আর পূরক। জায়িদের হাত ইতোমধ্যেই ফুলে উঠেছে, হাতে ও পায়ের ব্যাথায় ও যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। অমিত বেশি ব্যাথা পেয়েছে পায়ে।]

সামিহা: (জায়িদের ফোলা হাত দেখে আঁতকে উঠে) কীরে, তোদের এই অবস্থা কেন? কী হইছে?

[আহাদ, মনি ও ওদের অবস্থা দেখে আতকে উঠেছে।]

পূরক: আপু, ছাত্রলীগ অইপাশের রাস্তায় ধইরা পিটাইছে।

আহাদ: সিরিয়াসলি? কখন? কোথায় ছিলা তোমরা?

অমিত: ফার্স্ট সাইন্সের সামনে দিয়ে হাইটা যাচ্ছিলাম, ভাই।

সামিহা: আহাদ, দ্রুত বরফ নিয়ে আয়।

[পরক্ষণে সামিহা নিজেই গিয়ে সিলসিলাতে যায়। বরফ না পেয়ে থেকে জুস আর ঠান্ডা পানি নিয়ে আসে।]

সামিহা: অমিত, জায়িদের হাতে বরফ ধর।

[অমিত, নিজেও হাতে ব্যাথা পেয়েছে, হাত নাড়াতে পারছে না।]

অমিত: আপু, আমার হাত ব্যাথায় নাড়াইতে পারতেছি না। আর আপনি আমারে এই কথা কইতেছেন।

পূরক: হায়রে অমিত! (সজোরে হেসে উঠে)

অমিত: আপু, মারতো আমিও খাইলাম আর আপনি সব অ্যাটেনশন পূরণ করে দিতেছেন। বাহ...

[এই করুণ সময়েও সিলসিলায় ওদের একটু হাসি তামাশা হয়, নিজেদের সিনিয়রদের পেয়ে অমিত- পূরক আবারো সাহস আর শক্তি ফিরে পায় অনেকটা]

আহাদ: তোমরা ডিপার্টমেন্টে আসো আমাদের সাথে।

সামিহা: হ্যাঁ, তোরা ডিপার্টমেন্টে আয়। এখন বাইরে থেকে কী করবি?

পূরক: আপু, অপেক্ষা করি এদিকে। দেখি কী করা যায়।

অমিত: আপু আপনারা সাবধানে যান। আমরা দেখতেছি কি করা যায়।

সামিহা: ঠিক আছে। তোরা সাবধানে থাকিস।

[সামিহা, আহাদ, মনি দ্বিতীয় বিজ্ঞান ভবনের দিকে চলে যায়। অমিত, পূরক সিলসিলা রেস্তোরাঁর সামনে বেঞ্চের কোনায় গিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে।]

চতুর্থ অঙ্ক

সময় ২:৩০ মিনিট থেকে ৩টার মাঝামাঝি হবে।
[থমথমে পরিবেশ। অনিশ্চয়তার মধ্যে আহত হয়ে পূরক, অমিত বসে আছে।]

প্রথম দৃশ্য-

[হল থেকে একসাথে বের হবার পরে নির্জন কোথায় গেল খোঁজ নেওয়া হয়নি। হলের দিকে কিছু হচ্ছে কিনা জানার জন্য নির্জনকে কল দিচ্ছে পূরক।]

পূরক: নির্জন, কই তুমি? হলের দিকের কী অবস্থা?

ফোনের অপর প্রান্তে নির্জন: আমি তো হলের দিকে না। জিয়া হলের দিকে আসছিলাম। এখানে নাকি হলের কয়েকজনকে ছাত্রলীগ মারছে শুনছিলাম। এখন আবার যাচ্ছি হলের দিকে। ওদিক থেকে মিছিল হবে খবর পাইলাম। তোমরা কোথায়?

পূরক: কী বলো! জিয়া হলেও মারছে? আমি আর অমিত তো ছাত্রলীগের মাইর খাইলাম অলরেডি!

নির্জন: হায়হায়, কী বলো! কোথায় আছ তোমরা? আসতে হবে তোমাদের কাছে? জানোয়ারগুলার কত বড় সাহস!

পূরক: আমরা আপাতত সিলসিলাতে। এদিকে আপাতত আসতে হবে না। দেখ হলের দিক থেকে কিছু করা যায় কিনা। এদিকে মিছিল আসবে শুনেছি। সেখানে জয়েন দিব। রাখি আপাতত।

নির্জন: ঠিক আছে, সাবধানে থাকো।

অমিত: এখানে কতক্ষণ বসে থাকব? চল আবার বাইর হই। মারলে মরে যাব সাথে একটা নিয়ে মরব।

পূরক: একটু সিচুয়েশন বুঝি। একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে।

[আবার জায়িদের ফোন বেজে উঠে। সাকিব কল করেছে।]

পূরক: হ্যালো! কীরে সাকিব, কী অবস্থা তোর, কোনদিকে তুই?

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে সাকিব: (কান্নাজড়িত কণ্ঠে) আমার চোখের সামনে তোদের এমনে মারল কিছু করতে পারলাম না রে। তোরা মাইর খাইলি আর আমি পালাইয়া গেছি।

পূরক: ধুর! তুই ভালো কাজ করছিস। তিনজন মাইর খাওয়ার চেয়ে দুইজন মাইর খাওয়া কম খারাপ।

সাকিব: এখন কী অবস্থা তোদের, কোথায় তোরা?

পূরক: আমরা সিলসিলাতে আছি। অবস্থা বুঝতেছি না। কোনো মিছিল দেখলেই জয়েন দিব।

সাকিব: সিরাজির সামনে দিয়া নাকি মিছিল আসতেছে। আমি ওদিকে জয়েন দিতাছি। তোরা সাবধানে থাক ওদিকে।

পূরক: ঠিক আছে।

[ফোন কেটে দিলো।]

অমিত: মিছিল আসতেছে?

পূরক: এমনই শুনলাম। একটু অপেক্ষা কর।

অমিত: আচ্ছা।

[হঠাৎ দূর থেকে স্লোগান শোনা যায়। প্রথম বিজ্ঞান ভবনের সামনের পাশের রাস্তা দিয়েই টিএসসিসির সামনে দিয়ে শত শত আন্দোলনকারী লাঠি হাতে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছে।]

পূরক আর অমিতঃ (আনন্দে, রাগে, ক্ষোভে চেচিয়ে উঠে- সমস্বরে) আপস না সংগ্রাম? সংগ্রাম সংগ্রাম।

দালালি না রাজপথ? রাজপথ, রাজপথ।

[ওরা আবারও যন্ত্রণা ভুলে যায়। পূরক হাতে একটা ইটের টুকরা নিয়ে সজোরে মিছিলের দিকে দৌড় দেয়।]

পূরকঃ অমিত তাড়াতাড়ি আয়।

[অমিতও পেছনে পেছনে দৌড়ে যায়।]

দ্বিতীয় দৃশ্য-

[পূরক, অমিত মিছিলে প্রবেশ করল। শতশত মানুষের মিছিল না। হাজার হাজার মানুষের মিছিল।]

পূরকঃ (সজোরে চিৎকার করে) অই শুয়রের বাচ্চারা, এখন আয়। কই গেলি, কাপুরুষের দল? আয় পুরুষ হয়ে থাকলে।..

[অমিত আর সজীবের ফোনে কথোপকথন।]

অমিতঃ রাতুল ভাই, কই আছেন? অনেক মানুষ মিছিল নিয়ে ঢুকছে, তাড়াতাড়ি আসেন।

রাতুলঃ আমি আর খালিদ, দৌড়ানি খাইয়া বোটানিক্যাল গার্ডেনের সামনে চলে আসছি। তোরা কই?

অমিতঃ আমরা হবিবুর মাঠ হয়ে স্টেডিয়ামের দিকে যাচ্ছি।

রাতুলঃ আমরাও আসতেছি।

[রাতুল, খালিদ, তানভীর, নির্জন, রেজুয়ান, রিয়াদ, তন্ময়, নিলয়, শুভ্র একে একে সবার সাথেই দেখা হচ্ছে। অমিত একটা বড় বাঁশের খণ্ড হাতে নিয়ে মিছিলের এক পাশে গিয়ে আত্মরক্ষা ও প্রতি আক্রমণের বার কয়েক অনুশীলন করে নেয়।]

অমিতঃ আয় হালারপু, আরেকবার সামনে আয়।

[তানভীর এগিয়ে আসে অমিতকে দেখে।]

তানভীরঃ অমিত ভাই, এই ন্যান আপনার পতাকা। বড়টা আনতে পারি নাই, পকেটে টাকা ছিল না, এইটা মাথায় বান্ধেন।

[অমিত মাথায় পতাকা বেধে মিছিলে মিলিয়ে যায়, মিছিল এসে থামে শেখ মুজিব হলের সামনে। আস্তে আস্তে আরও পরিচিত মানুষের সাথে দেখা হতে থাকে। যেই বাইক দিয়ে টহল দিচ্ছিল তার কয়েকটা বাইক হলের ভিতরে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তীব্র বেগে স্লোগান চলতে থাকে--]

:তুমি কে, আমি কে?
:রাজাকার, রাজাকার!
:তুমি কে, আমি কে?
:রাজাকার, রাজাকার!!
:কে বলেছে, কে বলেছে?
:স্বৈরাচার, স্বৈরাচার!!
:কোটা না মেধা?
:মেধা মেধা!
:কোটা না মেধা?
:মেধা মেধা!
:দালালি না রাজপথ,
:রাজপথ রাজপথ!
:দালালি না রাজপথ,
:রাজপথ রাজপথ!
:আপস না সংগ্রাম?
:সংগ্রাম, সংগ্রাম!
:আমার সোনার বাংলায়..
:বৈষম্যের ঠাঁই নাই।
:চেয়েছিলাম অধিকার..
:হয়ে গেলাম রাজাকার!
:চেয়েছিলাম অধিকার..
:হয়ে গেলাম রাজাকার!
:লেগেছে রে লেগেছে..
:রক্তে আগুন লেগেছে।
:জেগেছে রে, জেগেছে..
:ছাত্রসমাজ জেগেছে!
:অ্যাকশন, অ্যাকশন
:ডাইরেক্ট অ্যাকশন!
:ছাত্রসমাজের অ্যাকশন,
:ডাইরেক্ট অ্যাকশন!
:দিয়েছি তো রক্ত,
:আরও দেবো রক্ত!

:রক্তের বন্যায়,
:ভেসে যাবে অন্যায়!
[নিরবচ্ছিন্নভাবে স্লোগান চলতে থাকে।]

রাসেল অমিতকে দেখতে পেয়েঃ কীরে তোদের নাকি ছাত্রলীগ মারছে? আকিবের পোস্ট দেখলাম।

অমিতঃ হ, মারছে। দেখ ওর হাত এখনো ফোলা। (জায়িদের হাতের দিকে ইঙ্গিত করে।)

পূরকঃ এসব বাদ দে। (রাসেলের হাতে স্টিলের রডের উপর পতাকা বাঁধা দেখে) এটা আমাকে দে। আজকে সামনে পাইলে খবর আছে শুয়োরদের।)

রাসেলঃ (পতাকা এগিয়ে দিয়ে) ধর এটা। আমি আরেকটা রড নিয়ে আসছি। তুই ইট নিয়ে কিছু করতে পারবি না।

[আকিবের সাথে পূরক আর অমিতের আবারও দেখা।]

সাকিবঃ অনেক বেশি ব্যাথা পাইছস? তগো কইলাম প্যারিস রোডের দিকে যাওয়া লাগবে না...

অমিতঃ পূরক বেশি মাইর খাইছে।

পূরকঃ আরে প্যারা নাই। মাইর খাইছি এখন আর বলে কী হবে। (ওর হাত এখনো ফুলে আছে, পা ঠিক মতো নাড়াতে পারছে না)

[মিছিল শেরে বাংলা হলের সামনে দিয়ে শহিদ মিনারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সবাই সাথে যাচ্ছে।]

তৃতীয় দৃশ্য-

[ইতোমধ্যে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাস থেকে পেছনের গেট দিয়ে পালিয়েছে। ক্যাম্পাস এখন সাধারণ ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে। এদিকে মিছিল শহিদ মিনার, সেন্ট্রাল মসজিদ পার হয়ে জোহা চত্বরের দিকে যায়। প্যারিস রোডে মেয়েদের হলের মিছিলও এসে যুক্ত হয়। কয়েকটা ছেলেদের হলের মিছিলও এসে যুক্ত হয়। বাইরে মেসে থাকা ছাত্রছাত্রীরা, স্কুল কলেজের বাচ্চারা, শ্রমজীবী, পেশাজীবী মানুষেরা সবাই রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে। চারদিক থেকে স্লোগানের পরে স্লোগান। অন্তত ১৫/২০ হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জমায়েত। কারো চোখে কোনো ভয় নাই, মুহুর্মুহু স্লোগানে চারপাশ মুখরিত। ওদের মাথায় বাঁধা বাংলাদেশের পতাকা, গায়ে জড়ানো লাল সবুজ আর মুখে দেশপ্রীতির স্লোগান। রক্তে আগুন, হৃদয়ে তুফান। অমিতর সাথে সোহান আর তপুর দেখা।]

সোহানঃ কী রে, মাইর খাইছস বলে? তোরা আসলে বেশি বুঝস। এত আগে বের হইতে হবে ক্যান?

অমিতঃ এক আধটু মাইর না খাইলে কীসের বিপ্লবী।

তপুঃ যা করলা মিয়া!

[মিছিল ইবলিশ চত্বর হয়ে মেয়েদের হলগুলোর দিকে এগিয়ে যায়। যে দুই একজন হলে ছিল তারাও হলে চলে আসে মিছিলে। মিছিল নির্মাণাধীন মেয়েদের হলের পাশে গেলে আবার দেখা হয় আহাদ ভাইদের সাথে। ওরা ল্যাব থেকে মিছিলে চলে এসেছে।]

পূরকঃ আহাদ ভাই আপনার হাতে লাঠি কই?

আহাদঃ হুর মিয়া, এই দ্যাখ কী নিয়া আসছি।

[আহাদ ব্যাগ থেকে অ্যাসিডের বোতল বের করে দেখায়, বোতলের মুখে স্প্রেয়ার লাগানো।]

পূরকঃ হায়হায় ভাই, এটা আসলেই অ্যাসিড?

আহাদঃ এতগুলা মেয়েরে নিয়ে বের হইছি, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা লাগবে না? ওরা আইলে আজকে খবর আছে।

[মিছিল হবিবুর মাঠের মাঝ দিয়ে মাদার বখ্শ হলের দিকে অগ্রসর হয়। অমিত এদিকে দেখতে পায়, রেজওয়ান ভাই, রিয়াদ, সবুজ ভাই লাঠি হাতে বসে আছে। সবাই মার খাওয়ার খবর নেয়। ইতোমধ্যে পূরক- অমিতের মার খাওয়ার খবর রাষ্ট্র হয়ে গেছে সব জায়গায়। একটু বিব্রতবোধ হয়, অনেক রাগ লাগে, সাহস কাজ করে, আর একটু একটু গর্ববোধ ও হয়। মিছিল লতিফ হল, শাহ মখ্দুম হল হয়ে মেডিকেলের পাশ দিয়ে বিনোদপুর বের হয়ে মেনগেটে চলে আসে। অনেকে জোহা চত্বরের আশেপাশে ঘুরাফেরা করছে। দেখা হয় সোহেল রানার সাথে। সোহেল রানা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে!! (সোহেল রানা আন্দোলনে আসব এ যে কল্পনার অতীত, সে সচরাচর ঝামেলা পছন্দ করে না, বিশাল ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার) সাথে আবির, সোহানুর, তানভীর, রতন, রাতুল, সবুজ, বিপ্লব, আখতার, মাছুম, শুভ্র, রাতুল, বাপ্পি, আশরাফুল আরো অনেকে। দেখা হয় মঈনুল, মোসাইব, তিথিলা, মাহীন, অনুরাগ, শয়ন, শিহাবদের সাথে।]

সোহেল রানাঃ অই অমিতই। (চেঁচিয়ে তার চিরচেনা ভঙ্গিতে)

অমিতঃ আরে! এবার বিজয় হবেই। এবার আর কেউ আটকাইতে পারবে না।

আবিরঃ পূরক ক, মাইর খাইছস বলে তোরা?

[অমিত আবারো ঘটনার বর্ণনা দেয় সবাইকে। মাইকে আওয়াজ শোনা যায়, সব তার পরিচিত কণ্ঠস্বর। সবার মধ্যে কী আগুন, কী উন্মত্ততা, কী সুগভীর দেশপ্রেম, ন্যায়ের জন্য কী আকুল ব্যাকুলতা। তার কানে বেজে উঠে অমীয় সুর--

ভয় নাই ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।
সে যখন প্যারিস রোড থেকে সরে শাবাশ বাংলা মাঠের ঘাসের উপর শুয়ে থাকে। পাশেই বসে আছে, রাতুল ভাই, ছোট ভাই তানভীর আর খালিদ।
আবারো হাতে পায়ের ব্যাথাটার একটু আঁচ পায়, কিন্তু কয়েক। মুহূর্তের জন্য কানে বাজতে শুরু করে-
আরে তোরা ভয় দেখাস বাংলার সন্তানে।
লাঠি, চাপাতি, বন্দুক বারুদ।
আছে তোর যা নিয়ে আয়।
মোরা এক হয়েছি, দেশ মাতারই কল্যাণে।
যদি হিম্মত থাকে
বুক পেতেছি কর আঘাত।
রক্ত দিব, রক্ত নিব দেখাব তোদের প্রতিঘাত।]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মতো সব ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাসীদের সেদিন তাড়িয়ে দেওয়া যায়নি। বিভিন্ন ক্যাম্পাস রক্তাক্ত হয় স্বৈরাচারের অত্যাচারে। রংপুরে বুক চিতিয়ে গুলির সামনে দাঁড়িয়ে যায় আবু সাঈদ-

বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর। পূরক, অমিত বা রাবি ক্যাম্পাসের অন্যরা বেঁচে গেলেও আবু সাঈদরা বাঁচতে পারেনি। অধিকারের সাম্যের আন্দোলন ভাইয়ের হত্যার বদলা নেওয়ার আন্দোলনে রূপ নেয়। সারাদেশ রণক্ষেত্র করে আসে আমাদের ৫ই আগস্ট।

এতটুকু ছিল দুইজন অতি সাধারণ শিক্ষার্থীর চোখে উত্তাল জুলাইয়ের দুইটি দিন। এরকম হাজারো ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গ থেকে যে দাবানলের সূচনা হয়, তাতে পুড়ে ছাই হয়ে যায় স্বৈরাচারের ইস্পাতের কুরসি। মাঝখান থেকে যারা চলে গেলেন চিরদিনের মতো, তারা অভাগা জাতিটাকে চিরঋণী করে গেলেন।

মির্জা আহমাদ সাদী ও মো. জায়িদ হাসান, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

দিনলিপিঃ জুলাই '২৪

মো. তানভীর খান

২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে ছাত্রজনতার ঐতিহাসিক বিপ্লবে ঘাতকের বুলেটের আঘাতে শহিদ হন রাজশাহী কলেজ শিক্ষার্থী আলী রায়হান। তার পরিবারের বিস্তর সাক্ষাৎকার নিয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা আমার এই নাটকটি। শহিদ আলী রায়হানের আত্মত্যাগ ও পরিবারের কান্না তুলে ধরতে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

নাটকের চরিত্রঃ নাটকটিতে অনেকগুলো চরিত্র রয়েছে। আলী রায়হান, নাটকের মূল চরিত্র। মো. মোসলেম উদ্দিন, যিনি আলী রায়হানের পিতা। মোছাঃ রুকসানা বিবি, রায়হানের মাতা। রানা ইসলাম, আলী রায়হানের ছোট ভাই, যার বয়স ১৮ বছর। সালাউদ্দিন আম্মার, যিনি আন্দোলনে রায়হানের সহযোদ্ধা। রাশেদ রাজন, রাজশাহীর আন্দোলন বেগবান করতে রায়হানের সঙ্গে পরামর্শকারী। কাউসার, যিনি রাজশাহী কলেজ শিক্ষার্থী ও রায়হানের পূর্বপরিচিত। রায়হানের সহযোদ্ধা, যারা আন্দোলনে রায়হানের পাশে থাকতো। ডাক্তার, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের। ডাবলু সরকার, আওয়ামী লীগ নেতা।

৫ জুন ২০২৪

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর কোটা নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের জারি করা পরিপত্রকে অবৈধ ঘোষণা। বাদ মাগরিব পূর্বপরিচিত কাউসারকে ফোন করে আলী রায়হান..

আলী রায়হানঃ আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছ, কাউসার?

কাউসারঃ ওয়ালাইকুম আসসালাম, জি, ভাই।

রায়হানঃ খবরে তো দেখেছ আদালত কোটা ব্যবস্থা আবার পুনর্বহাল করল।

কাউসারঃ হ্যাঁ, ভাই, দেখলাম। এই বিষয়ে আমাদের বসে থাকলে চলবে না ভাই, কিছু একটা করতেই হবে।

রায়হানঃ সেটাই ভাবছি...। আচ্ছা, এশার নামাজ পরে একটু তালাইমারি শহিদ মিনারে এসো, এই বিষয়ে আলোচনা করব। আর হ্যাঁ, সাথে তোমার মেসের ছোট ভাইদেরও নিয়ে আসবে।

কাউসারঃ ঠিক আছে, ভাই।

বাদ এশা, স্থানঃ তালাইমারি শহিদ মিনার

আলী রায়হান: আপনারা যদি সুযোগ দেন, তাহলে আমি কথা শুরু করি?

কাউসার: জি, ভাই, অবশ্যই।

রায়হান: এই কোটাব্যবস্থা পুনরায় আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো, অথচ প্রধানমন্ত্রী নিজে ঘোষণা দিয়েছিলেন কোটা থাকবে না। একজন সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধা ৫৩ বছর আগে যুদ্ধ করেছেন। তাঁরা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন, তাদের সম্মানিস্বরূপ সরকার মাসিক ভাতা দেন। তাঁদের সন্তানদের জন্য স্বল্প পরিসরে কোটার ব্যবস্থা থাকলে আমাদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু সন্তান ও নাতিনাতনিদের জন্যও কোটা রয়েছে, যেটা ৩০ শতাংশ! এটা জাতির সাথে পুরোপুরি অন্যায়।

কাউসার: জি, ভাই, এটা মেনে নেওয়ার মতো নয়, কিছু একটা করতেই হবে, ভাই।

রায়হান: হ্যাঁ, আচ্ছা সবাই ইদের ছুটি শেষে দ্রুত রাজশাহীতে চলে আসবেন। ততদিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও কিছু একটা করবে, আমরা আমাদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তাদের সাথে সমন্বয় করেই মাঠে নামব।

জুলাইয়ের ৭ তারিখ

আলী রায়হান: কাউসার, আর বসে থাকার সময় নেই। কাল থেকেই সবাইকে সংগঠিত করে মাঠে নামতে হবে। তুমি কলেজের গ্রুপগুলোতে সবাইকে আন্দোলনের পক্ষে লেখালেখি করতে বলো, এতে জনমত গড়ে উঠবে। আজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বড় আন্দোলন করল। আমরাও কালকে থেকে শুরু করছি, প্রস্তুত হও সবাই।

২০ জুলাই, শনিবার

দেশজুড়ে কারফিউ, সেনা মোতায়েন

আলী রায়হান: এতদিন তো আন্দোলন করলাম কাউসার। এবার পরিস্থিতি আরও কঠিন হতে যাচ্ছে। ঢাকায় অনেক ভাই গুলিতে শহিদ হয়েছেন। আজ আবার দেশজুড়ে কারফিউ জারি করল সরকার, পরিস্থিতি অনেক কঠিন হতে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের পিছু হটলে চলবে না। আমরা চূড়ান্ত মুক্তির লক্ষ্যে অন্য কিছু ভাবছি কাউসার।

২১ জুলাই, রোববার

মেধার ভিত্তিতে ৯৩% নিয়োগের বিধান রেখে আদালতের রায়।

কাউসার: এবার কি তাহলে আমাদের মুক্তির স্বপ্ন এখানেই থেমে যাবে রায়হান, ভাই?

আলী রায়হান: হতাশ হইয়ো না কাউসার। আল্লাহ উপরে আছেন, নিশ্চয়ই তিনি এই জাতিকে বার বার হতাশ করবেন না। ধৈর্য হারিয়ো না। আল্লাহ ভরসা।

২৬ জুলাই, শুক্রবার

এলাকা ভাগ করে চলছে 'ব্লক রেইড'। সারাদেশে অভিযান, অন্তত ৫৫৫টি মামলা।

রাশেদ রাজনঃ রায়হান ভাই, দেশে তো ব্যাপক অভিযান চলছে, কখন কীভাবে গ্রেফতার হয়ে যাই, বলা যায় না। ইতোমধ্যে নাহিদ ইসলাম ভাই, আসিফ মাহমুদ ও আবু বাকের মজুমদারকে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল থেকে ডিবি হেফাজতে নিয়েছে। দেশে ইন্টারনেটও বন্ধ, আমি ইন্ডিয়ান সিমকার্ড ব্যবহার করছি। তবে যাহোক, আমরা এ লড়াই থামাব না, আমাদের ভাইদের হত্যার বিচার নিশ্চিত করেই ঘরে ফিরব।

৫ আগস্ট, সোমবার, বাদ ফজর মোনাজাত, অজ্ঞাত স্থান

আলী রায়হানঃ হে আল্লাহ! আমাকে মৃত্যু দিলে শহিদি মৃত্যু দিয়ো। জালিমের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার চূড়ান্ত লড়াইয়ে নামছি আল্লাহ। আমার ইমানি শক্তি বৃদ্ধি করে দাও। এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য কিছু করার তাওফিক দাও। আমার কিছু হয়ে গেলে আব্বা আম্মাকে ধৈর্যধারণ করার তাওফিক দিয়ো আল্লাহ।

বেলা ১১টা, তালাইমারি মোড়

সালাউদ্দিন আম্মারঃ রায়হান ভাই, আমরা সাহেব বাজারের দিকে অগ্রসর হব, আপনি মিছিলের সামনের দলকে নেতৃত্ব দেবেন। যেকোনো বিপদে আপনার দলকেই সবথেকে বেশি ভূমিকা রাখতে হবে, ভাই।

আলী রায়হানঃ আল্লাহ ভরসা, আমি ও আমার সহযোদ্ধারা আমাদের সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করব।

বেলা ১২টা, আলুপট্টি

ডাবলু সরকারঃ এই তোরা রাজাকারের বাচ্চাদের কচুকাটা করবি। গুলি করে ঝাঁঝরা করে দে সবগুলোকে।

আলী রায়হানঃ ভাই, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, পিছু হটবেন না। শত্রুর বুলেটের আঘাত আমাদের কিচ্ছু করতে পারবে না। আমরা হেরে গেলে হেরে যাবে বাংলাদেশ। আজ আমাদের শেষ লড়াই হতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ। সবাই এগিয়ে আসুন, ঢিল ছুড়ুন, শত্রুর মনোবল দুর্বল হয়ে গেছে। আরেকটু পরেই আমাদের বিজয়।

চারপাশ থেকে একাধিক সহযোদ্ধা ঘিরে ধরল আলী রায়হানকে

সহযোদ্ধারাঃ রায়হান ভাই, ভাই আপনার কিচ্ছু হবে না ভাই, এই তোরা ধর, ভাইয়ের মাথায় গুলি লেগেছে। এই তুই কপালটা পতাকা দিয়ে বেঁধে দে, অনেক রক্ত বের হচ্ছে কপাল দিয়ে। হাসপাতালে নিতে হবে, তোরা ভাইকে ধর.....

৫ আগস্ট সকাল, পুঠিয়ার মঙ্গলপাড়া গ্রাম, রায়হানের পরিবার

মো. মোসলেম উদ্দিনঃ রুকসানা, ও রুকসানা। আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে, কী করি বলো তো? আমার রায়হান তো আজ কল করল না? দেশের যা অবস্থা, চিন্তা হয় অনেক।

রুকসানা বিবিঃ আরে কল করবে, তুমি চিন্তা করো না তো, কেবল সকাল হলো, একটু পরেই কল করবে। আমার ছেলে বেখেয়ালি নাকি? ঠিকই কল করবে।

বেলা সাড়ে ১২টা

মোসলেম উদ্দিনঃ হ্যালো, কে বলছেন?

রায়হানের সহযোদ্ধাঃ আপনি কী রায়হানের বাবা?

মোসলেম উদ্দিনঃ হ্যাঁ, কেন বাবা? কী হয়েছে? আমার রায়হানের কিছু হয়নি তো? বলো বাবা, চুপ করে আছ কেন?

রায়হানের সহযোদ্ধাঃ চাচা, আপনাকে একটু রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আসতে হবে, রায়হান ভাইকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মোসলেম উদ্দিনঃ রায়হানের মা, ও রায়হানের মা, তাড়াতাড়ি চলো, তোমার ছেলে নাকি হাসপাতালে ভর্তি।

রুকসানা বিবিঃ ওরে আমার বেটা রে, তোর কী হলো রে, ওরে আমার রায়হান।

মোসলেম উদ্দিনঃ রাস্তায় গাড়ি নাই কেন? রাস্তা এত ফাঁকা কেন?

দুপুর আড়াইটা, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

মোসলেম উদ্দিনঃ বেটা আমার রায়হান কোথায়?

রায়হানের সহযোদ্ধাঃ চাচা, রায়হান ভাই আইসিইউ'র মধ্যে। মাথায় গুলি লেগেছে।

মোসলেম উদ্দিনঃ ডাক্তার, আমার ছেলের অবস্থা কেমন? আমার রায়হান কেমন আছে? আমার মানিক আমার বুকে ফিরে আসবে তো ডাক্তার?

ডাক্তারঃ অপারেশন সফল হয়েছে, আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, ২৪ ঘণ্টা না গেলে কিছু বলা যাচ্ছে না।

৬ আগস্ট সকাল

রুকসানা বিবিঃ রায়হানের আব্বা! রায়হান হাত নাড়াচ্ছে।

মোসলেম উদ্দিনঃ আল্লাহ! এ যেন তুমি মরুভূমির বুকে এক ফোঁটা পানি দিলে। আল্লাহ আমার ছেলেকে তুমি সুস্থ করে দাও।

৭ আগস্ট

মোসলেম উদ্দিনঃ আমার রায়হান কিছু বলে না কেন? ও তো আর হাতটাও নাড়াচ্ছে না।

সহযোদ্ধারাঃ চাচা, আমরা রায়হান ভাইয়ের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিয়ে যাব বিমানে করে।

ডাক্তারঃ এই অবস্থায় কোথাও নেওয়া যাবে না। অবস্থা খুবই ক্রিটিক্যাল।

৮ আগস্ট

মোসলেম উদ্দিনঃ রায়হানের মা, আমার রায়হানের তো আর সাড়া পাচ্ছি না। আমার মানিককে কী আমরা আর পাব না?

রুকসানা বিবিঃ এমন কিছু হবে না, আল্লাহর কাছে দোয়া করো রায়হানের আব্বা, আল্লাহ আবার আমাদের মাঝে আমাদের কলিজার টুকরাকে ফিরিয়ে দেবেন।

৮ আগস্ট সন্ধ্যা

মোসলেম উদ্দিনঃ ডাক্তার, ও ডাক্তার। কী হয়েছে আমার রায়হানের?

ডাক্তারঃ আমরা দুঃখিত, আমাদের সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করেছি, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছে, আপনার ছেলে আর বেঁচে নেই।

মোসলেম উদ্দিনঃ ওরে আমার বেটা, ও রায়হান। ও কলিজার টুকরা, তুই আমাদের ছেড়ে চলে গেলি। আমার কোনো মেয়ে ছিল না, কিন্তু আমার রায়হান শহর থেকে বাড়িতে গেলেই আমার হাতের নখ কেটে দিত, আমার জামাকাপড় ধুয়ে দিত। আজ আমার বেটা চলে গেল। ও রায়হান....।

রুকসানা বিবিঃ রায়হান রে, ও বেটা, আমার সোনার টুকরাকে ওরা মেরে ফেলেছে রে। আমার রায়হান যেদিন বাড়িতে আসতে চাইতো সেদিন সকাল থেকে আমি রান্না করে বসে থাকতাম রে বেটা। প্রতিদিন কল করে আর কে আমার খোঁজ নিবে রে বেটা, ও রায়হান। তুই ছিলি আমার শান্তি রে, তুই বাড়িতে আসলে আমার আত্মা ঠান্ডা হতো রে বেটা। ও রায়হান...।

রানাঃ আর কে কল করে আমার খোঁজ নেবে, ভাই? আর কাকে আমি ভাই বলে ডাকব?

মো. তানভীর খান, ২য় বর্ষ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, সৈয়দ আমীর আলী হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

Red Shadows of July

মো. তাশহাদুল ইসলাম তারেক

ক.

[মঞ্চের মাঝখানে একটা তিনস্তরের বেদি রাখা। যেটাকে ব্যবহার করে পারফরম্যান্স তৈরি হবে। এই বেদি কখনো রাজপথ, কখনো বুদ্ধিজীবী চত্বরের প্ল্যাটফরম, কখনো রাজু ভাস্কর্য, কখনো প্রতিবাদের মঞ্চ আবার কখনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল ফটকের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হবে]

তরুণ-১: আমাদের রাতগুলো, রাতের নিঃশ্বাসগুলো কেড়ে নেয় কারা? কারা পকেটস্থ করে আমাদের গৌরবময় দিনগুলোর ইতিহাস?

তরুণ-৫: আমাকে বলো শান্তি, স্বস্তি, স্থিরতা আর নিরাপত্তার শ্বাস রুদ্ধ করে কারা লুটে নেয় আমাদের সম্ভাব্য আগামী?

তরুণ-২: অথচ দেখো, তারাই আবার চোখে স্বপ্নের ধোঁয়া তোলে, ভোরের আলো বলে অন্ধকারের পথ দেখায়!

তরুণ-৩: তবে কি পরাজিত আমাদের বিপ্লব! তবে কি খুন হলো আমাদের অভ্যুত্থান!

তরুণ-৪: অসম্ভব, কখখোনো না! আমাদের বিপ্লব পরাজিত নয়, আমাদের এ অভ্যুত্থান খুন হবার নয়। আমরা তো রক্তের ওপর রক্ত ঢেলে মিটিয়ে দিয়েছি স্বৈরাচারের রক্ত পিপাসা।

তরুণ-১: জীবনের ওপর জীবন রেখে বাজি ধরেছি মৃত্যুর সাথে। গুম, খুন, হত্যা, আয়নাঘর আর ক্রসফায়ার কিছুই আমাদের সাহস ভাঙতে পারেনি।

তরুণ-৫: আমরা নত হইনি শাসকের রক্তখেকো হুংকারে, নুয়ে পড়িনি বারুদের গন্ধে, রাবার বুলেট, স্নাইপার ও বন্দুকের গুলিতে! আগ্নেয়াস্ত্র পরাজিত হয়েছে আমাদের অটল বিশ্বাসের কাছে, আর ইতিহাস সাক্ষী শোষকের রাজ্য চিরদিন টেকে না!

তরুণ-২: আমরা তো মৃত্যুকে টেনে এনেছি জীবনের মঞ্চে, গলা উঁচিয়ে বলেছি মৃত্যু ভয় কোনোদিন বিশ্বাসীদের পথ রুদ্ধ করতে পারেনি! আমরাও থামব না, পিছিয়ে যাব না।

তরুণ-৩: মানুষ হিসেবে মানুষের মর্যাদা রক্ষার এই চূড়ান্ত লড়াইয়ে আমরা দাঁড়িয়েছি বুক চিতিয়ে, দুহাত প্রসারিত করে। আর ইতিহাস বলছে আমরাই বিজয়ী হব, কারণ অন্যায়কে রুখতে যারা প্রাণ দেয়, তারা কখনো পরাজিত হয় না!

তরুণ-২: আমাদের সমস্ত লড়াই, সংগ্রাম, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ সবই ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য, মানুষের ওপর মানুষের আধিপত্য ও প্রভুত্বের বিরুদ্ধে!

তরুণ-৪: আমরা চেয়েছি নাগরিক অধিকার, চেয়েছি মর্যাদার নিশ্চয়তা, যাতে কেউ ফ্যাসিস্ট হয়ে না ওঠে, কেউ শোষিত না হয়। আমাদের সাহস এখন আর শুধু প্রতিরোধ নয়, আমাদের বিপ্লব আজ এক বিস্ময়, এ বিপ্লব অন্যায়ের ভিত কাঁপিয়ে দিয়ে বলে- আপস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম, দালালি না রাজপথ রাজপথ রাজপথ, গোলামি না আজাদি আজাদি আজাদি, ইনকিলাব ইনকিলাব জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!

তরুণ-১: আমাদের জনপদ এবং রাজপথ এখন বিপ্লব, প্রতিটি তারুণ্যের চোখ এখন বিপ্লব, প্রতিটি চোখের রাজত্ব এখন বিপ্লব, বিপ্লব এখন সমগ্র বাংলাদেশে!

তরুণ-১: এই মাটি কেবল ধান-নদী-খাল-বিলের জন্য নয়, এই মাটি আমাদের রক্তে কেনা! তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা, নূরলদীনের হাঁক, ক্ষুদিরামের ফাঁসি, মুক্তিযোদ্ধার রক্তমাখা বেয়নেট, পোড়া গ্রাম, ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে ওঠা প্রতিরোধ, নূর হোসেনের বুকের লেখা, আর জুলাই অভ্যুত্থানের রক্তাক্ত রাজপথ সব একসঙ্গে মিশে আছে আমাদের লড়াইয়ের ইতিহাসে! শোষকের বন্দুক আমাদের দমাতে পারেনি, আয়নাঘরের অন্ধকার আমাদের মনোবল ভাঙতে পারেনি, ফাঁসির মঞ্চ আমাদের থামাতে পারেনি! আমরা দাঁড়িয়েছি অন্যায়ের দেওয়াল ভেঙে, মাথা উঁচু করে, মুক্তির দাবিতে গর্জে উঠেছি!

খ.

[একদল মিছিল নিয়ে বেদির দিকে আগাতে থাকে। হাতে প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন ও ব্যানার নিয়ে অগ্রসর হয় যেগুলোতে লেখা থাকে জুলাইয়ের নানা স্লোগান। চারদিক থেকে তরুণরা মিছিলে যুক্ত হতে থাকে। ক্রমান্বয়ের জুলাই অভ্যুত্থানের স্লোগানগুলো চলতে থাকে। পুলিশ আন্দোলন বন্ধে অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে। আন্দোলন থামে না আরো বেগবান হতে থাকে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বর্বরতাও চলতে থাকে। তবুও ছাত্র-জনতা নত হয় না। আন্দোলনের স্পিড বাড়তে থাকে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কয়েকজনকে আটক চরম নির্যাতন চালায়। আন্দোলনকারী একজনকে চারদিক থেকে ঘিরে নিয়ে গুলি চালিয়ে হত্যা করে। তরুণদের আর্তনাদ বাড়তে থাকে। আন্দোলনের প্রতিটি ঘটনা বিভিন্ন কম্পোজিশন ও কোরিওগ্রাফির মাধ্যমে তুলে ধরা হবে]

তরুণ-১: আসমান জমিনের মাঝে যে শূন্য জায়গা সেখানে চারদিক থেকে ওঠা আওয়াজগুলো ভাসতে থাকে। এক কান থেকে আরেক কানে পৌঁছাতে থাকে একটার পর একটা ঘটনা। দাবানলের মতো মানুষ ছুটতে থাকে তার অধিকার ফিরে পেতে, ছুটতে থাকে স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে বাঁচতে, ছুটতে থাকে তার সাথে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের বিচার পেতে, ছুটতে থাকে আয়না ঘরে বন্দি থাকা স্বজনদের ফিরে পেতে, ছুটতে থাকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর লাগামহীন মূল্যের লাগাম টানতে, ছুটতে থাকে ন্যায় বিচার পেতে, ছুটতে থাকে স্বাধীনভাবে যার যার ধর্ম সে সে পালন করার

স্বাধীনতা পেতে, ছুটতে থাকে নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনতা পেতে, ছুটতে থাকে ভোট দিতে না পারার যন্ত্রণা নিয়ে, ছুটতে থাকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, ছুটতে থাকে বৈষম্যহীন এক নতুন বাংলাদেশ গড়তে।

[যখন সকল শ্রেণি পেশার মানুষ যুক্ত হয়ে আন্দোলন তীব্রতর করে তখন সবাইকে জালের মধ্যে আটকে ফেলা হয়। পুরো মঞ্চ ব্ল্যাক আউট করে দেওয়া হয়। একদম নিঃশব্দ। যার মাধ্যমে ইন্টারনেট শাটডাউন ও কারফিউ বোঝানো হবে। কয়েক সেকেন্ড নিরবতা ভেঙ্গে ছাত্র-জনতা জাল ছিঁড়ে বের হয়ে আবারো আন্দোলনের ডাক দেয়। পুলিশ আবারো গুলি চালিয়ে আন্দোলন বন্ধ করতে চায়]

গ.

তরুণ-১: তবুও মানুষের এই দীনতার বুঝি শেষ নেই.... শেষ নেই মৃত্যুরও। বিবেকের কণ্ঠ রুদ্ধ করে, রক্তের স্রোতে মুছে দেয় সহমর্মিতার প্রতিটি দাগ। কী করে মানুষ এই রক্তের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়?

তরুণ-২: কারণ মানুষ ভাসতে চায়। তাদের পা মাটিতে থাকার ভার সইতে পারে না। তাই তারা রক্তের ঢেউ তৈরি করে, নিজেই সেই ঢেউয়ের ওপর ভেসে থাকে।

তরুণ-৩: কিন্তু এই ঢেউ কি তাদের বিবেককে ধুয়ে নিয়ে যায়? তাদের সহমর্মিতার প্রতিটি দাগ মুছে দেয়?

তরুণ-১: সহমর্মিতা? ওটা তো একটা আরামদায়ক শব্দ। মানুষ তাকে যত্ন করে বুকে রাখে, কিন্তু প্রয়োজন পড়লে তা ছুঁড়ে ফেলে। রক্তের স্রোত সব মুছে দেয় বিবেক, দয়া, মায়া, প্রেম, ভালোবাসা সবকিছু... সব! সব! সবকিছু!

তরুণ-২: তাহলে মানুষ কি শুধুই একটা শূন্য খোলস? তাদের ভেতর কি কিছুই নেই?

তরুণ-৪: কী বলছো তুমি! সব মানুষ নয়, বলো কিছু কিছু মানুষ। শুধু মানুষ বললে অনেকেই ক্ষেপে যেতে পারে!

তরুণ-১: ঠিক! শুধু মানুষ বললে অনেকেই ক্ষেপে যেতে পারে! যাহোক মানুষের ভেতর আছে লোভ, হিংসা, অহংকার, ক্রোধ, ক্ষমতার নেশা, ভয়। আর আছে এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা! কে কত বড় শূন্যতার অধিকারী হতে পারে।

তরুণ-৫: শূন্যে উড়াল দিয়ে খামচে ধরো সব। গিলে নাও সবকিছু।

তরুণ-১: এভাবেই পৃথিবী চলে। এভাবেই ক্ষমতা জন্ম নেয়। আমি শূন্যে পৌঁছেছি। এখন তোমাদের দেখতে পিঁপড়ার মতো লাগছে। অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষুদ্র! তোমাদেরকে পিষে ফেলতে ইচ্ছে করছে! আমার পায়ের নিচে তোমাদের চিড়চিড় শব্দ শোনা যাক তোমাদের হাহাকার বাতাসে ছড়িয়ে পড়ুক আর আমি উপভোগ করব! হা.. হা... হা...

তরুণ-৩: কিন্তু দয়া!

তরুণ-১: দয়া? সে তো দুর্বলদের বিলাসিতা! আমি দয়ার প্রয়োজন ফুরিয়ে ফেলেছি।

তরুণ-৪: আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের কষ্ট হয়!

তরুণ-১: মানুষ? তোমরা কেবল খাদ্য, কেবল শোষণের উপকরণ। তোমাদের যন্ত্রণা, তোমাদের কান্না আমার বিনোদন! [উপর থেকে জাল ফেলে দিয়ে সবাইকে জালে আবদ্ধ করা হবে। জালের মধ্যে সবাই আটকে গিয়ে ছটফট করবে। মই থেকে তরুণ-১ নেমে আসবে, জালের দড়ি ধরে টানতে থাকবে আর উন্মাদের মতো হাসতে থাকবে]। আমি অনুভব করি না, আমি কাঁদি না, আমি ভালোবাসি না কারণ আমি শূন্যতার অধিকারী। আমি একা, আমি সকল ক্ষমতার উৎস।

তরুণ-৪: আচ্ছা! তাহলে কি এগুলোর কিছুই বদলাবে না?

তরুণ-২: বদলাবে। হয়তো সময়ের সঙ্গে রক্তের রঙ বদলাবে। মৃত্যুর কণ্ঠস্বর বদলাবে। কিন্তু দীনতা? তার কোনো শেষ নেই।

তরুণ-৩: অনেক সময়ই মনে হতো, এই পৃথিবীটা যেন একটা বিশাল গর্ত। সবাই তাতে পড়ে যাচ্ছে, আর কেউ হাত বাড়িয়ে তুলছে না।

তরুণ-৫: হাত বাড়ানোর সময় কারও নেই। সবাই শুধু নিজেকে গর্তের কিনারায় ধরে রাখার লড়াইয়ে ব্যস্ত।

তরুণ-৬: এভাবে আর কতদিন? রক্ত, মৃত্যু, দীনতা এগুলো কি কোনোদিন থামবে না?

তরুণ-২: থামবে। তবে শুধু তখনই, যখন মানুষ আর কিছু চাইবে না। কিন্তু মানুষ তো লোভের দাস। তাই থামা কখনো সম্ভব নয়।

তরুণ-৩: আহ্ আবার একই ভুল করছ! সব মানুষ নয় বলো কিছু কিছু মানুষ লোভের দাস।

তরুণ-৬: আচ্ছা! এই যে প্রতিদিন সহমর্মিতার দাগ মুছে যাচ্ছে এর দায়ভার কে নেবে?

তরুণ-১: দায়ভার? কেউ না। মানুষ নিজের দীনতার কাছে মাথা নত করে থাকে। বিবেক হয় রুদ্ধ, নয়তো নির্বাক।

তরুণ-৫: তবুও... আমি একদিন এই দীনতাকে ছুঁড়ে ফেলব। সহমর্মিতার দাগগুলো আবার তুলে আনব।

তরুণ-৩: এতেও লাভ হবে না, দেখবে তবুও মানুষ মানুষকে হত্যা করবে।

তরুণ-৫: হত্যা!

তরুণ-২: অবশ্যই! হত্যা করবে ধর্মের নামে, বর্ণের নামে, জাতীয়তার নামে, সংস্কৃতির নামে, রাজনীতির নামে। [একই সংলাপ হলো হয়ে বিকৃত ভয়েসে শোনা যাবে। রিপিট হতে থাকবে। লাশগুলো ভয় পেয়ে জীর্ণ হবে। সংলাপের গতি বাড়তে থাকবে]

তরুণ-৩: হত্যার এই বর্বরতাই অনাদিকাল ধরে আমাদের এই পৃথিবীর শান্তিকে বিপন্ন করেছে। ঘৃণার আঁধারে ঢেকে দিয়েছে ভালোবাসার সূর্য। [লাশগুলো সব আতঙ্কে এক জায়গায় জড়োসড়ো হবে]

তরুণ-৫: স্বার্থপরতার কৃপাণে ছিন্নভিন্ন হয় মানবতার অঙ্গীকার। তবুও কেউ শিখে না অতীতের দগ্ধ স্মৃতিগুলো থেকে, শিখে না যে প্রতিটি মৃত্যু আমাদের আরও বিভক্ত করছে।

তরুণ-১: ক্ষমতার লোভে তারা যুগে যুগে নির্মমভাবে হত্যা করেছে মানবসন্তানকে। আচ্ছা যারা হত্যা করেছে! তারা কি ঘুমোতে পারে! খেতে পারে! নিজের সন্তানের দিকে তাঁকাতে পারে!

সবাই: না! জীবনকে জানবার আগে, বুঝবার আগে, উপভোগ করার আগে, ঘৃণার আগুনে নিঃশেষ করেছে অসংখ্য প্রাণ।

তরুণ-২: এই হত্যার মধ্য দিয়ে আমরা হারাই নিজেদেরই একটি অংশ।

তরুণ-৩: তবু কেন এমন অন্ধকারে আমরা পথ খুঁজে ফিরি?

তরুণ-৬: মানুষের এই নিষ্ঠুর চক্রের কি কোনো অবসান নেই?

তরুণ-১: তোমরা বোঝ না! তুমি তোমাকে দিয়ে উপলব্ধি করতে পারো না? মানুষ মরতে চায় না, মানুষ বাঁচতেই চায়।

সবাই: হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানুষ মরতে চায় না, মানুষ বাঁচতে চায়।

তরুণ-৩: হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানুষ মরতে চায় না মানুষ বাঁচতে চায়! আবার এমন কিছু সময় আসে যখন মানুষ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। অস্ত্রের সামনে বুক পেতে দেয় দু হাত প্রসারিত করে। হয়তো সে বিশ্বাস করে না তার মৃত্যু হবে ঐ অস্ত্র দ্বারা। তবুও তার মৃত্যু হয় তার বিশ্বাসকে তুচ্ছ করা হয়।

[তবুও তার মৃত্যু হয় তার বিশ্বাসকে তুচ্ছ করা হয়। তবুও তার মৃত্যু হয় তার বিশ্বাসকে তুচ্ছ করা হয়। এক এক করে প্রত্যেকটা লাশ নিজ নিজ জায়গা থেকে দু হাত প্রসারিত করে বুক পেতে দাঁড়াবে। এক সাথে সবাই বলে উঠবে তবুও তার মৃত্যু হয় বিশ্বাসকে তুচ্ছ করা হয়। গুলির শব্দ ভেসে আসবে। তরুণ-৩ মাটিতে লুটিয়ে পরবে। সবাই এসে তাকে ধরবে। চারদিক থেকে গুলির আওয়াজ বাড়তে থাকবে সবাই প্রতিবাদী হয়ে উঠবে]

তরুণ-৩: ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ওরা শূন্যতায় পৌঁছে গেছে। ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে, তীব্র অথচ শীতল নিষ্ঠুরতায় আমাদেরকে হত্যা করে।

তরুণ-১: যারা ক্ষমতার লোভে ফ্যাসিস্ট হয়ে যায় প্রথমে মুছে যায় তাদের চোখের নরম দীপ্তি, তারপর হাসির উষ্ণতা। তারপর হারিয়ে যায় প্রেম, মায়া, ভালোবাসার কোমলতা। তাদের ভেতর থেকে সব মুছে গিয়ে তারা শূন্য হয়ে যায়।

তরুণ-২: ওরা শূন্যতায় পৌঁছে যায় আর আমাদের বুকগুলো গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়! একটা, দুটো নয় শত শত, হাজার হাজার বুক ঝাঁঝরা হয়ে যায়!

তরুণ-৪: রক্ত ঝরে, রক্ত শুকিয়ে যায়, রক্তে লেখা হয় এক অসমাপ্ত কাব্য। আমাদের কান্না, আমাদের চিৎকার, আমাদের আর্তনাদ সব মিলিয়ে তৈরি হয় সেই কাব্য!

সবাই: একটা ভয়াবহ, হিংস্রতার কাব্য!

তরুণ-১: আমরা লিখতে থাকি তাদের হিংস্রতার কাব্য, আমাদের দেহ দিয়ে, আমাদের রক্ত দিয়ে, আমাদের নীরবতা দিয়ে।

তরুণ-৩: আমরা লিখতে থাকি তবুও, জানি না কে পড়বে এই কাব্য! লিখতে থাকি কারণ এই লেখার মধ্য দিয়েই তোমাদের সবকিছু মনে রাখা হবে।

ঘ.

[একঝাঁক পুলিশ মঞ্চের মাঝখান দিয়া অ্যাকশন নিয়ে প্রবেশ করে। চারদিক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে। অস্ত্র নিয়ে টহল দিতে থাকে মঞ্চে প্রবেশ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। মন্ত্রীকে স্যালুট দিয়ে পুলিশ বাহিনী এগিয়ে আসে। একজন পুলিশ অফিসার ফোন বের করে একটি ভিডিও দেখায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে]

পুলিশ অফিসার: গুলি করে করে লাশ নামানো লাগছে, স্যার। গুলি করলে, মরে একটা, আহত হয় একটা। একটাই যায়, স্যার, বাকিডি যায় না। এটাই হলো স্যার সবচেয়ে বড় আতঙ্কের এবং দুশ্চিন্তার।

মন্ত্রী: গুলি করো। গুলি করে করে আন্দোলন বন্ধ করো।

পুলিশ: ইয়েস, স্যার!

পুলিশ-১: মুভ।

ঙ.

[মঞ্চে রাখা বেদি দিয়ে কফিন তৈরি করা হয়। পুলিশ প্রথমে কাঁধে করে একটা লাশ কফিনের মধ্যে রেখে দেয়। তারপর এক এক করে টেনে হিঁচড়ে লাশ নিয়ে এসে বিভিন্ন স্থানে রাখে]

লাশ-১: আমরা মৃত্যু পেরিয়ে এক অনন্ত জীবনে এসে পৌঁছেছি।

লাশ-৩: আমরা সত্যের চেয়ে আর কিছুকেই সুন্দর বলে গণ্য করি না।

লাশ-৪: রাতের বুক চিড়ে আমরা তুলে এনেছি নব-সূর্যের দিন।

সবাই: আমাদের মন এখন বিপ্লবের নদী।

সবাই: আমরা বয়ে যাই প্রতিটি মানুষের বুকের ভেতর।

সবাই: আমাদের নিঃশ্বাস এখন বিপ্লবের হাওয়া।

সবাই: আমরা প্রতিটি মানুষের প্রশান্তির শ্বাস।

সবাই: আমরা এখন প্রতিটি মানুষের চোখের আরাম।

লাশ-১: মাফিয়া ও স্বৈরতন্ত্রের জাল ছিন্নভিন্ন করে, আমরা বিশ্বাস ও সম্প্রীতির মানচিত্র বিছিয়ে দিয়েছি।

লাশ-২: তবুও ভয় হয়, আর যেন কোনো ফ্যাসিবাদের জন্ম না হয়। এত বছরেও আমার দেশের মানুষ তার ভাগ্য ফিরে পায়নায় এখনও। খালি ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে। এবার আমার দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হোক।

লাশ-১: অবশ্যই! তবে এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এদের এই আনন্দগুলোই ভরিয়ে তোলে আমাদের এই বিরানভূমি।

লাশ-২: আচ্ছা! আমরা কি অনন্তকাল এখানে থেকে যাব? আর কখনো কি এখান থেকে বের হতে পারব না? আমাদের না বলা কথাগুলো কি আর বলতে পারব না?

লাশ-১: আমাদের শরীরগুলো আজ মাটির নিচে চাপা পড়েছে। কিন্তু আমাদের আওয়াজগুলো আজও মাটি ভেদ করে বেরিয়ে যায়।

লাশ-২: সত্যি কি বেরিয়ে যায়?

লাশ-১: হ্যাঁ, যায়। রক্তের দাগ এখনও শুকায়নি, চারদিকে এখনও মৃতের আর্তনাদ। সন্তানহারা মায়ের আহাজারিতে আসমান ভারী হয়ে আছে। গভীর ষড়যন্ত্রের ভিড়ে হারিয়ে যেতে পারে বন্দুকের সামনে বুক পেতে দেওয়ার দুঃসাহস। বিলিন হতে পারে সুন্দর বৈষম্যহীন সম্প্রীতির বাংলাদেশ প্রত্যাশার আকাঙ্ক্ষা।

লাশ-২: আশা হারাইনি এখনও।

লাশ-১: আমারা তোমাদের চারদিকে এখনও ঘুরি ফিরি, তাঁকিয়ে থাকি, অদৃশ্য হয়ে কত কথা বলি- আমাদের কথা আর তোমাদের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না। তবুও বলি আল্লায় যদি সহায় হয় আমি দেখার অপেক্ষায় আছি– সবার অন্তরে আমার অন্তরের আগুন জ্বলছে। মানুষ মানুষের সহযোগিতায় কাছে আসছে। সকল ষড়যন্ত্র বন্ধ হয়েছে।

লাশ-২: এদেশ থেকে সকল বৈষম্য দূর হয়ে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দেখার অপেক্ষায় আছি, সীমান্তে পাখির মতো গুলি বন্ধ হয়েছে। ফেলানির মতো আর কোনো লাশ কাঁটাতারে ঝুলে নেই।

এদেশে আর নতুন কোনো আয়না ঘরের জন্ম হয়নি।

ইলিয়াস আলী, ওয়ালিউল্লাহ, মুকাদ্‌দাসের মতো আর কোনো ভাই গুম হয়নি।

আমার ছেলে মেয়ের হাতে সুন্দর ভবিষ্যৎ আছে।

সকলের চোখে সুন্দর স্বপ্ন আছে।

আমার ভাই-বোনের ঘর নিরাপদ আছে।

সুখে-দুঃখে অনুপানে সবাই একসঙ্গে আছে।

দেশের স্বার্থে জাতীয় ঐক্য আছে,

শত ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে সকলেই বলছে-

মাতৃভূমি অথবা মৃত্যু

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

[নাটকটি রচনায় কাজী আবু জাফরের *বিপ্লব এবং বিপ্লব* কবিতা, সৈয়দ শামসুল হক *নূরল দীনের সারাজীবন* নাটক এবং জহির রায়হানের *আর কত দিন* উপন্যাসের কয়েকটি লাইনের কাছে ভীষণভাবে ঋণী]

মো. তাশহাদুল ইসলাম তারেক, পিএইচডি গবেষক, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিবিম্ব-ই-অধিকার

মো. সাহেদ ইসলাম

(নেপথ্যে হাততালি আর চিৎকার চেচামেচি দিয়ে প্রবেশ করবে প্রথম উপস্থাপক)

উপস্থাপক ১ : Ladies & gentleman আপনাদের সুস্বাগতম আমাদের আজকের প্রতিবিম্ব অনুষ্ঠানে। আজকের আলোচনার বিষয় বিশ্ব পরিচয় ও অপসংস্কৃতি, দুঃখিত মানে অ অ অ অ আ আ আ আ মানে অধিকার নিয়ে। বর্তমান বিশ্ব পরিচয় মানে যারা মানে যে দেশ মানে অ অ আ আ মানে যারা মানে যে দেশ মানে যে সমাজ তাদের অধিকার নিয়ে দুঃশ্চিন্তায় ভুগছে মানে এটা তাদের রোগ মানে একটা ব্যাধি যা তাদের দুমড়ে মুচড়ে উচ্ছেদ করছে। মানে এটা দেখানো দরকার, তাদের নিয়ে আসা হয়েছে মানে তাদের এখানে আপনাদের সামনে উপস্থিত করে তাদের অ অ আ আ মানে।

উপস্থাপক ২ : অ অ আ আ মানে তাদের অধিকারের কথা শোনা হবে মানে তারা কী বিষয়ে আজকের প্রতিবিম্বে অংশগ্রহণ করবে ও আমরা তাদের কীভাবে উপস্থাপন করব...

অ অ অ অ আ আ আ আ... (দুই উপস্থাপকের অট্টহাসি)

উপস্থাপক ১ : মানে আমরা তাদের নিয়ে আসব, মানে দেখাব, মানে কীভাবে উপস্থাপন করব? মানে অ অ অ অ আ আ আ আ মানে অধিকার নিয়ে কথা বলবেওও

উপস্থাপক ২ : মানে অধিকার, অধিকার, অধিকার।

উপস্থাপক ১ : কিন্তু তাদেরকে উপস্থাপন করবে কে ?

উপস্থাপক ২ : আমি

উপস্থাপক ১ : তুমি? কিন্তু এটা তো অবিচার, অন্যায়।

উপস্থাপক ২ : ও তাই?

উপস্থাপক ১ : এই বিশ্ব পরিচয় ও অ আ অধিকার, এই প্রতিবিম্ব মানে আজকের আয়োজনে কে প্রথমে এসেছে? এই আমি।

আমি মানে আমি তাদের নিয়ে আসব।

(মঞ্চের মাঝ বরাবর দুজনের লড়াই চলমান

আমি না আমি নিয়ে আসব, না আমি, না আমি নিয়ে আসব, না আমি নিয়ে আসব।)

এরই মধ্যে মঞ্চে প্রবেশ করে জাদুকর

জাদুকর : এই আপনারা অযথা আবেগে আপ্লুত হচ্ছেন যা পুরোই বৃথা এবং পুরোই বিরক্তিকর ও হাস্যকর।

উপস্থাপক ১ : আপনি কে?

উপস্থাপক ২ : উনি মনে হয় তোমাকে ওঠাতে এসেছেন। যাও ওনার সঙ্গে গায়েব হয়ে যাও। আমি সঠিক বলেছি তো?

জাদুকর : আহ্

উপস্থাপক ১ : আমি আঁচ করতে পারছি মানে আমার মনে হচ্ছে উনিই তিনি যার জন্য আমরা এখানে, মানে আজকের প্রতিবিম্ব অনুষ্ঠানে জায়গা করতে পেরেছি।

উপস্থাপক ২ : সত্যি দুঃখিত। মানে আমরা আপনাকে সরাসরি পেয়ে সত্যি আপ্লুত মানে এতদিন আপনার জন্য আমরা অপেক্ষায় ছিলাম।

জাদুকর : তাই?

উপস্থাপক ১ : মানে আমরা আপনার কথা শুনেছি, আপনার ক্ষমতা সম্পর্কে জেনেছি।

উপস্থাপক ২ : মানে আপনি না থাকলে আজ আমরা থাকতাম না, সত্যি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।

জাদুকর : হা হা হা, চলুন জাদু দেখে আসা যাক, মজাদার সব জাদু, সমাজতন্ত্রের জাদু।

উপস্থাপক ১ : জাদু, কীসের জাদু?

জাদুকর : পুরো বিশ্ব পরিচয় মানে অ আ মানে অধিকার বিষয়ক জাদু। আমি গোটা বিশ্ব ঘুড়ে যেই জাদুবিদ্যা শিখেছি তাই আজ এই মঞ্চে দর্শকদের দেখাব।

উপস্থাপক ২ : তো জাদুবিদ্যা আপনি?

উপস্থাপক ১ : সে জাদুবিদ্যা জানে এবং আমাদের আজকের প্রতিবিম্ব অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান রূপরেখা দানকারী। যিনি দেশ ও বিদেশের হাজারো সূক্ষ্ম থেকে বৃহৎ, মানুষ থেকে জড়, প্রিয়জন থেকে স্বজন হারানো এরকম হাজারো, হাজারো, হাজারো তন্ত্র মন্ত্র নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসেছেন। তার হাতের জাদু এই গোটা সমাজতন্ত্র ও বিশ্ব পরিচয়ের মুখ্য উপজীব্য।

উপস্থাপন ২ : সত্যি, আমি আপনার ক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক অবগত। আমি দুঃখিত, আমাকে ক্ষমা করবেন।

উপস্থাপক ১ : চুপ, চুপ, জি আপনি বলুন।

জাদুকর : আপনি সঠিক জেনেছেন। এই সমাজতন্ত্র ও এই বিশ্ব পরিচয়ের জাদু আমি দেশ ও বিশ্ব ঘুড়ে তটস্থ করেছি। মানে দর্শকের মনে ভ্রম তৈরি করতে ও উদ্রেকগুলোকে নিজের আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়েছি।

উপস্থাপক ২ : সু স্বাগতম মি. জাদুকর।
Ladies & Gentelman আপনারা দেখছেন সমাজ নিয়ন্ত্রণের এক দক্ষ জাদুকরকে, তো মি. জাদুকর আপনার থেকে আমরা এই প্রতিবিম্ব অনুষ্ঠানে সমাজতন্ত্রের মুখ্য, বেশ গভীর, উদ্রেকজনক ও ভয়ংকর সব জাদু দেখব।

জাদুকর : অবশ্যই, অবশ্যই।

উপস্থাপক ১ : এই মহান জাদুগুলো দেখার লোভ সামলানো বড্ড দুষ্কর, তাই দেরি নয় চলুন।

উপস্থাপক ২ : তবে আজকের আলোচ্য বিষয় হলো সমাজতন্ত্রের অতল গহ্বরে ডুবে থাকা মহামূল্যবান এবং মুখ্য উপস্থপনার বিষয়বস্তুগুলো মানে।

উপস্থাপক ১ : মানে আমাদের মহামূল্যবান জিনিসগুলো (দুজনে একসাথে বারবার একই উক্তি)।

জাদুকর : মানে বিশ্ব পরিচয়?

উপস্থাপক ১ : মানে অ অ আ আ অধিকার!

উপস্থাপক ২ : মানে আমাদের আজকের মহামূল্যবান জিনিসগুলো

জাদুকর : তবে এই নাও সমাজতন্ত্রের মহামূল্যবান জাদু (হাত উত্তোলন করে আর মন্ত্র পড়তে থাকে, এরই মধ্যে সমস্ত এলাকা জুড়ে মানুষের দৌড়ের শব্দ কিন্তু কোনো মুখে শব্দ নেই, সবাই ছুটে আসছে একেক জন একেক দিক থেকে ক্রমাগত ছুটছে, বিষ যেন দগ্ধ করছে তাদের পুরো শ্বাসনালী।)

উপস্থাপক ২ : কী মনোমুগ্ধকর হস্তশিল্প মানে হাতের জাদু, কিন্তু বাহবা দিচ্ছি না কারণ আরো আরো গভীর, উদ্রেকজনক, ভয়ংকর সব জাদু দেখব।

উপস্থাপক ১ : Ladies & Gentleman দেখুন, দেখুন তাদের দেখুন, আজকে আমার মঞ্চে তাদের বিশ্ব পরিচয় মানে তাদের অ আ অধিকার আমাকে আকৃষ্ট করছে ক্রমাগত উদ্দীপনায় প্রস্ফুটিত করছে।

উপস্থাপক ২ : তোমার মঞ্চ? মুর্খ কোথাকার।

উপস্থাপক ১ : যার কোনো নিজস্বতা নেই, যোগ্যতা নেই সে বলে মূর্খ হা হা হা।

জাদুকর : এই মরে যাওয়া প্রাণী দুটি বার বার প্রাণ ফিরে পাচ্ছে, ওহ্ হো! এতে আমার জাদুবিদ্যা ক্রমশ বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে, আপনারা সুস্থিতি বজায় রেখে মনযোগ দিন।

দেখুন (হাতের খেল শুরু ও মুখে মন্ত্র বলবে...শ্বাসকষ্ট শুরু হয় সকলের)

উপস্থাপক ২ : ওই যে দেখো অতল গহ্বরে ডুবে থাকা ওই মহামানব একটু বেশি আনন্দিত, সে তো আজন্মকাল চিৎকার করে যাবে সে ধুঁকছে, ওই যে ওই হা হা হো হা হু হু।

উপস্থাপক ১ : কিন্তু নয়, সে আবার মরবার আগে কী যেন বলতে চাচ্ছে মানে অ আ অধিকার বিষয়ক কোনো কিছু, তাই না?

১ম ব্যক্তি : অ আ নয় অধিকার, অধিকার।

সকলে : অধিকার, অধিকার, অধিকার, অধিকার, অধিকার, অধিকার, অধিকার, অধিকার, অধিকার, অধিকার, অধিকার, অধিকার। (সব দিক থেকে ধ্বনিত হবে)

জাদুকর : ওরে সর্বনাশ অ আ অধিকার। বেশ বেদনার কথা, কত আবেগ কত অনুভূতি এই শব্দে। এটি শুধু আমিই বুঝতে পারি কারণ, আমি দেশ বিদেশ থেকে সমাজতন্ত্র থেকে বিশ্ব থেকে এসব আবেগ, বেদনা আর তন্ত্র মন্ত্র তটস্থ করেছি।

উপস্থাপক দুজনেই: অ আ

জাদুকর : এই যে সোনামণিরা আজকের এই বিশ্ব মঞ্চে এই প্রতিবিম্ব আয়োজনে তোমাদের বিশ্ব পরিচয় বলো খুব আরাম করে আর চেতনা নিয়ে।

চুপ কেন? বলো? বলো?

(আবার হাত তুলে মন্ত্র পড়তে থাকে সকলের শ্বাসকষ্ট শুরু হয় ও কাতরাতে থাকে)

উপস্থাপক দুজনে : চেতনা, চেতনা, চেতনা নিয়ে বলো চেতনা, চেতনা, চেতনা নিয়ে বলো।

সকলে : চেতনা, চেতনা, চেতনা।

১ম ব্যক্তি : আমাদের বিশ্ব পরিচয়?

২য় ব্যক্তি : আমাদের বিশ্ব পরিচয়?

৩য় ব্যক্তি : আমাদের বিশ্ব পরিচয়?

৪র্থ ব্যক্তি : আমাদের বিশ্ব পরিচয়?

১ম ব্যক্তি : আমাদের বিশ্ব পরিচয় হলো সুদীর্ঘ।

২য় ব্যক্তি : আমাদের বিশ্ব পরিচয় হলো আমাদের পূর্ব পুরুষ চাষা।

৩য় ব্যক্তি : আমাদের বিশ্ব পরিচয় হলো আমরা তিতুমীরের আন্দোলন।
৪র্থ ব্যক্তি : আমাদের বিশ্ব পরিচয় হলো আমরা নীল বিদ্রোহ।
১ম ব্যক্তি : আমাদের বিশ্ব পরিচয় হলো আমরা ভাষা আন্দোলন।
২য় ব্যক্তি : আমাদের বিশ্ব পরিচয় হলো আমরা মুক্তিযুদ্ধ।
৩য় ব্যক্তি : আমাদের বিশ্ব পরিচয় হলো আমরা অধিকার আদায়ের প্রতীক আমরা জুলাই বিপ্লব।
উপস্থাপক দুজনে : তোমরা অ আ অধিকার আদায়, হা হা হা হো হো হো
সকলের মধ্য থেকে-
১ম ব্যক্তি : খুব, খুব কষ্ট হয় আপনাদের অধিকার উচ্চারণ করতে তাই না?
২য় ব্যক্তি : মুখে বাঁধছে তাই না?
৩য় ব্যক্তি : দাঁতগুলো শক্ত হয়ে আসছে?
৪র্থ ব্যক্তি : অ আ নয় বল অধিকার, অধিকার
সকলে : অধিকার।
জাদুকর : চমৎকার! চমৎকার! চমৎকার! আপনারা উত্তেজিত হবেন না।
(হাত উপরে তোলে ও মন্ত্র পাঠ)
বলো এবার বলো অধিকার আদায়, হা হা হা হো হো হো
(সকলের শ্বাসকষ্ট ও চিৎকার।)
উপস্থাপক ১ : বাহ্! কী মসৃণ আর গুরুত্বপূর্ণ সব সমাজতন্ত্রের জাদু মানে তন্ত্র মন্ত্র, চেতনা বাহ্! বাহ্!
উপস্থাপক ২ : বেশ কড়া।
তো কী অ ধিকার আদায় করলে তোমরা?
জাদুকর : এদের মতো শকুনদের সুযোগ দিচ্ছ, সুযোগ দিলে এরা মানচিত্র চিবিয়ে খাবে, তাদের আর অ আ ধি কা র। এদের কণ্ঠনালি ওই গহ্বরের কয়লায় দিন রাত পোড়ানো উচিত।
১ম ব্যক্তি : আপনার ওই জাদুর দৃষ্টিতে মুক্ত পতঙ্গঝলসে দিয়েছে এজন্য দেখছেন না।
২য় ব্যক্তি : একটু ভালো করে দেখুন।
৩য় ব্যক্তি : দেখুন আপনার বিশ্ব পরিচয়ের জাদুবিদ্যা দিয়ে দেখুন আমাদের কণ্ঠনালি।
৪র্থ ব্যক্তি : দেখুন যারা রুখতে চেয়েছে তাদের পরিণতি দেখুন, দেখুন তাদের পরিহাসের পরিণতি দেখুন, দেখুন।
১ম ব্যক্তি : আমরা কথা বলেছি অধিকার আদায় নিয়ে, মৌলিক অধিকারের সুষম বণ্টন নিয়ে সুন্দর বাতাসে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে।

২য় ব্যক্তি : আমরা কথা বলেছি ঘুস, দুর্নীতি, কালোবাজারি, সিন্ডিকেট নিয়ে।

৩য় ব্যক্তি : আমরা কথা বলেছি মেধা নিয়ে, সিট বাণিজ্য নিয়ে, লবিং-গ্রুপিং নিয়ে, সমান অধিকার নিয়ে।

৪র্থ ব্যক্তি : আমরা আন্দোলন গড়েছি, (সকলে আমরা আন্দোলন গড়েছি।) আমরা দৃঢ় হয়েছি জুলাই বিপ্লবে।

জাদুকর : জুলাই বিপ্লব?

উপস্থাপক দুজনে : জুলাই বিপ্লব?

১ম ব্যক্তি : হ্যাঁ, মেধার জন্য স্লোগান দিয়েছি কোটা না মেধা? মেধা মেধা,
কোটা না মেধা? মেধা, মেধা,
কোটা না মেধা? মেধা মেধা,
কোটা না মেধা? মেধা, মেধা, মেধা, মেধা।

২য় ব্যক্তি : জীবন দিয়েছি বুক পেতে।

৩য় ব্যক্তি : জীবন দিয়েছি জীবনের জন্যে।

৪র্থ ব্যক্তি : জীবন দিয়েছি মেধার জন্য।

১ম ব্যক্তি : আমরা জুলাই বিপ্লবের সকল শহিদের রক্তবিন্দু থেকে এসেছি দেখুন আমাদের শরীর দেখুন পবিত্র রক্তের দাগ এ রক্ত মিথ্যা নয়।

২য় ব্যক্তি : ডাক দিয়েছি স্বৈরশাসকের গদি ছাড়ার, কারণ আমরা কথা বলেছি অধিকার নিয়ে।

৩য় ব্যক্তি : কারণ আমরা কথা বলেছি, কথা বলেছি অধিকার আদায় নিয়ে, কথা বলেছি অধিকার নিয়ে।

সকলে : আমরা কথা বলেছি, অধিকার আদায় নিয়ে, অধিকার নিয়ে।
আপস না সংগ্রাম?
সংগ্রাম সংগ্রাম,
আপস না সংগ্রাম?
সংগ্রাম সংগ্রাম,
আপস না সংগ্রাম?
সংগ্রাম সংগ্রাম।

জাদুকর : অসহ্য, অসহ্য, এদের থামাও! আর আমার থেকে পাবে অমূল্য সব তন্ত্র মন্ত্র। থামাও, থামাও তাদের।

উপস্থাপক ১ : অবশ্যই, এদের আবার ধ্বংস করে দেওয়া হোক, অ অ অধিকার।

উপস্থাপক ২ : Ladies & Gentleman এদের শ্বাসরুদ্ধ করতে হবে নতুবা এদের শ্বাসনালী ও ফুসফুস পুড়িয়ে দিতে হবে যাতে করে অ আ ও কথাও বলতে না পারে।

জাদুকর : হুমমম (হাতে দড়ি এবং বেঁধে ফেলে সকলকে)
এই বিশ্ব জগতের সকল তন্ত্র-মন্ত্র, সকল জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করা হবে যেন তাদের মৃত্যুর পুনরাবৃত্তি ঘটে, যাতে তাদের নাম মুছে যায় সমাজতন্ত্র থেকে ইতিহাস থেকে ইতিহাসের পাতা থেকে আর নতুন করে যেন আসতে না পারে অ- আ- ধি- কার।

১ম ব্যক্তি : এ হাত বিপ্লবের হাত, এ হাত পতিত জমির প্রাণ।

২য় ব্যক্তি : এ হাত প্রতিরোধের, এ হাত বিপ্লবী রক্তের ছোঁয়াতে পরিপূর্ণ।

৩য় ব্যক্তি : যে রক্ত বার বার দাঁড়াবে, দাঁড়াবে অশুভ শক্তির প্রতিপক্ষ হয়ে, অশুভ তন্ত্র মন্ত্রকে গ্রাস করতে, সকল প্রতিবিম্বের সামনে।

৪র্থ ব্যক্তি : তখন প্রতিবিম্ব বলে উঠবে অধিকার,অধিকার।

২য় ব্যক্তি : ওহে জাদুকর, ওহে দলপতি, ওহে সমাজপতি, ওহে ভবিষ্যৎপতি এই অধিকার আদায়, এই সংগ্রাম, এই রক্ত বিন্দু এই জীবন দান বারে বারে ফিরে আসবে সকল অপশক্তিকে নিশ্চিহ্ন করতে। সকল প্রতিবিম্বের সামনে এবং প্রতিবিম্ব বলবে অধিকার, অধিকার।

সকলে : অধিকার, অধিকার।

উপস্থাপক ১ : এদের পুরো শরীর মমি করে অতল গহব্বরে জাদুঘর বানিয়ে রাখা উচিত যাতে ওই কুলাঙ্গার সব ওই অধিকার আদায়ের নেতারা দেখতে পারে।

উপস্থাপক : শুধু দেখবে? দেখলে তো হবে না তাদের থেকে শিক্ষা নিবে, যাতে করে তারাও আর হাত তুলতে না পারে, অধিকারের হাত।

জাদুকর : যথার্থ, সহমত পোষণ করছি।

উপস্থাপক ২ : জাদুকর, তাহলে দেখছেন কী? শুরু করুন তাদের পাঠিয়ে দিন অতল গহব্বরে অধিকার আদায়ের জাদুঘরে, যেখানে থাকবে তাদের কাঁচা রক্ত পিষ্ঠ মমি যেখানে হবে উন্মুক্ত জাদুঘর।

উপস্থাপক ১ : যাদের ধ্বংস করতে হবে এই বিশ্ব জগৎ থেকে বিশ্ব পরিচয় থেকে এই সমাজতন্ত্র থেকে।

উপস্থাপক ২ : আর আমাদের তৈরি করতে হবে নতুন আরামদায়ক আর সুষম গদি।

জাদুকর : শক্ত, পক্ত পরিপূর্ণ এক গদি, যেখানে দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সকল জাদুবিদ্যার উত্তম বাস্তবায়ন ঘটবে।

উপস্থাপক দুজনে : শুরু করুন, শুরু করুন, যেতে হবে গদি সম্মুখপানে, সুষম গদি, সুষম গদি, সুষম গদি।

(এরই মধ্যে সকলকে জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়া চেষ্টা করা হবে, দড়ি নিয়ে টানতে থাকবে দুজন উপস্থাপক)

সকলে : অট্টহাসি।

ওই যে, ওই যে জনসমুদ্র।

(দূর থেকে বের হতে থাকবে স্বাধীনতাকামী মানুষ এবং তাদের গলা থেকে ভেসে আসছে)

আপস না সংগ্রাম? সংগ্রাম সংগ্রাম
আপস না সংগ্রাম? সংগ্রাম সংগ্রাম
আপস না সংগ্রাম? সংগ্রাম সংগ্রাম
আপস না সংগ্রাম? সংগ্রাম সংগ্রাম
আপস না সংগ্রাম? সংগ্রাম সংগ্রাম

(এরই মধ্য মঞ্চ ছেড়ে গায়েব হয়ে যায় জাদুকর, এবং পালিয়ে যায় উপস্থাপক)

বিজয় পতাকা হাতে স্বাধীনতাকামী মানুষ বলতে থাকে দলে দলে খবর দে স্বৈরতন্ত্রের কবর দে
জাদুবিদ্যার কবর দে।
স্বৈরতন্ত্রের কবর দে
জাদুবিদ্যার কবর দে।
স্বৈরতন্ত্রের কবর দে
জাদুবিদ্যার কবর দে।
স্বৈরতন্ত্রের কবর দে
জাদুবিদ্যার কবর দে।

সকল তন্ত্র মন্ত্র অধিকার আদায়ের প্রশ্নে প্রশ্নবিদ্ধ, সকল অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে একদফা দাবি, গদি ছাড়ার দাবি। এই সমাজতন্ত্রের সকল জাদু, সকল অশুভ প্রতিবিম্ব সমস্ত কিছু ভেঙ্গে নতুন করে গড়ার দাবি। কারণ এই সমাজতন্ত্রের সকল মুক্তিকামী প্রতিবিম্ব বার বার বলে উঠবে অধিকার, অধিকার।

মো. সাহেদ ইসলাম, ৩য় বর্ষ, নাট্যকলা বিভাগ, শহীদ হবিবুর রহমান হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়